চলন্তিকা ব্লগ

ঈদ সংখ্যা

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ।।

তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিঁদ।।

তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।।

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা নিত- উপবাসী
সেই গরীব মিস্কিন দে যা কিছু মফিদ।।

ঢাল হৃদয়ের তোর তশতরীতে শিরনী তৌহিদের,
তোর দওত করবুল করবেন হযরত, হয় মনে উমিদ।।

তোরে মারল ছুঁড়ে জুড়ে ইঁট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গ'ড়ে প্রেমেরি মসজিদ।।

-কাজী নজরুল ইসলাম-

চলন্তিকা ব্লগ
ঈদ সংখ্যা
জুলাই ২০১৪

সম্পাদকের কথা

আর কয়েকদিন পরই ঈদ। ঈদ মানে ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা। বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ঈদ মানে সবাই মিলে সুন্দর থাকা। আমরা চেষ্টা করেছি একটি মানসম্পন্ন ঈদ সংখ্যা আমাদের পাঠকের হাতে তুলে দিতে। সময় স্বল্পতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য বেশ কিছু ভুল থাকতে পারে। তারপরও আমরা বিশ্বাস করি এটি নতুন লেখকদের সমন্বয়ে দেশের সেরা ঈদ সংখ্যা। আমাদের সব পাঠকের জন্য এই আমাদের ঈদ উপহার। আপনাদের সবার ঈদ সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক, নিরাপদ হোক। যে যেখানে আছেন, ভালো থাকুন।

আর কয়েকদিন পরই ঈদ। ঈদ মানে ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা। বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ঈদ মানে সবাই মিলে সুন্দর থাকা। আপনাদের ঈদের আনন্দ আরও বৃদ্ধি করতে আমরা চলন্তিকা সাহিত্য ব্লগ, আমরা চেষ্টা করেছি একটি মানসম্পন্ন ঈদ সংখ্যা আমাদের পাঠকের হাতে তুলে দিতে। সময় স্বল্পতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য বেশ কিছু ভুল থাকতে পারে। তারপরও আমরা বিশ্বাস করি এটি নতুন লেখকদের সমন্বয়ে দেশের সেরা ঈদ সংখ্যা। আশা রাখি এখানে আপনারা সুসাহিত্যের স্বাদ পাবেন। আশা রাখি, সবার ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে দিবে এই ঈদ সংখ্যা। আমাদের সব পাঠকের জন্য এই আমাদের ঈদ উপহার। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশের ভিতর থেকে দেশিবিদেশি যত ওয়েবসাইট দেখা হয় তার মধ্যে চলন্তিকা ব্লগ-, cholontika.com, এখন ranking এ ২,১১৮ তম মাত্র !!! নতুনভাবে ফিরে আসার পর চলন্তিকা সাহিত্য ব্লগের এই সাফল্যের পিছনে এর লেখকপ্রদায়ক দের রয়েছে আন্তরিক-অবদান। সম্পাদক হিসাবে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

আপনাদের আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের ব্লগের লেখকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রিন্ট পত্রিকা আগামি এপ্রিল'১৫ থেকে বের হবে। প্রথম চার সংখ্যা থাকবে ত্রৈমাসিক। পরবর্তী চার সংখ্যা হবে দ্বিমাসিক। এর পর থেকে এটি মাসিক পত্রিকা আকারে প্রকাশ পাবে ইনশাল্লাহ। প্রতি সংখ্যাতে কমপক্ষে ২০টি কবিতা আর ১০ টি গল্প স্থান পাবে। আর সব মিলিয়ে ৪০/৫০ জনের লেখার সমন্বয়ে প্রতিটি সংখ্যা বের হবে।

আর ২০১৫ থেকে আমাদের প্রকাশনীর যাত্রা শুরু হবে ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যে আমরা সে লক্ষে কাজ শুরু করেছি। আমাদের প্রকাশনী থেকে বই বের করতে হলে লেখককে কোন খরচ বহন করতে হবে না ইনশাল্লাহ।

আমাদের সাথে থাকুন।

ঈদ মোবারক!!!

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

ন্যায্যাধিকার বঞ্চিতা / **জায়েদ বিন জাকির, ৭৪**
বিজয় দেখেছি, বিজয়ের স্বাদ আজও পাইনি / **আলমগীর হোসেন আবীর, ৮১**

ছড়া

মহাদায়! বৈশাখ / **নুরুজ্জামান মাহ্‌দি, ৫৬**
বৃষ্টি নিয়ে অকাব্য..... / **এই মেঘ এই রোদ্দুর, ৯১**

জীবনের গল্প

এতটুকু অভিমান / **আজিম, ২২**
একটি শিরোনামহীন গল্প / **নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, ৪০**
ফাগুনের অনুভূতি / **আরজু মূন, ৩০**
অপেক্ষা / **এ টি এম মোস্তফা কামাল, ৯২**

কবিতা

ঈদের গান / **এম আর মিজান, ৯**
প্রিয়জন / **কে এইচ মাহবুব, ২৪**
আয় আয় আয় / **তৌহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া, ২৪**
ঘাসফুলের ইচ্ছেমৃত্যু / **সোহেল আহমেদ পরান, ২৭**
অঙ্কুরে বিনাশ / **প্রহেলিকা, ২৭**
নষ্টসময় / **সাঈদুল আরেফীন, ৩২**
খুঁজছি তোমায় / **মোঃ নিউশা, ৩৯**
আমার সবুজ পাখি / **মোঃ শাহীনুর রহমান, ৩৯**
ধরণীর পর বাসর / **আলমগির সরকার লিটন, ৪০**
হে ঝাঁকড়া চুলের কবি / **আবদুল্লাহ আল নোমান দোলন, ৫১**
প্রেম অনুভূতি... / **আহমেদ নিরব, ৫১**
মনে রেখ / **সারমিন মুক্তা, ৫৬**
বিধ্বস্ত নাবিক / **নাজমুল হক পথিক, ৫৭**
ঘ্যাচাং বন্দনা / **আহমেদ রুহুল আমিন, ৫৯**
কল্পলোকের জীবন-কাব্য / **মৌনী রোশ্মান, ৭০**
মিতা ও আমার কাব্য / **মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, ৭০**
মৃত্যু বিলাস / **এম, এ, কাশেম, ৭১**
ভোরের ডাক / **আহমেদ রব্বানী, ৭১**
গনতন্ত্র তুমি কার? / **মনির আহমদ, ৭৪**
ঈশ্বরের ছবি / **আলমগীর কবির, ৭৬**
বর্ষা জাগায় স্মৃতি / **সাখাওয়াৎ আলম চৌধুরী, ৭৮**
জ্যামিতিক ভালোবাসা / **মোকসেদুল ইসলাম, ৭৯**
বর্ষা বন্দনা / **মিলন বনিক, ৮০**
কবিতার অপর নাম-বার্তা / **জাফর পাঠান, ৮৫**
ঝুম বৃষ্টি / **শাহানারা রশিদ ঝর্ণা, ৮৮**
ঝরাফুলের মতো / **শাহ্ আলম বাদশা, ৮৯**
কেন এমন কর / **মো: মালেক জোমাদ্দার, ৯০**
খুঁজে ফেরা / **জসীম উদ্দীন মুহম্মদ, ৯০**

যাত্রায় বিপত্তি / **এস এম আব্দুর রহমান, ৯৪**
ভাঙ্গা গ্লাসে / **সাঈদ চৌধুরী, ৯৫**
প্যারাডক্স / **শ্যাম পুলক, ৯৭**

বড় গল্প
বৃষ্টিগ্রস্ত / **সুপণ শাহরিয়ার, ৪৩**
বিস্মৃতি / **তুষার আহসান, ৬৩**

শিশুতোষ ও শিক্ষণীয়
প্রাণীদের গণতন্ত্র / **বিন আরফান, ১২**
একটি অসাধারন গল্প! / **শাম্মী শিল্পী তুলতুল, ৭৬**
শেয়াল পন্ডিতের পাণ্ডিত্য /**নীলকন্ঠ জয়, ৮৭**

রসরচনা
পল্টুর বিজ্ঞান চর্চা / **শওকত আলী বেনু, ৯২**

গল্প
শৈশবের সাথী / **সিকদার, ১৪**
ব্যাতিক্রম "মা" / **মনির হোসেন মমি, ১৮**
ভিক্ষুক / **আমির হোসেন, ২৮**
প্রতিবেশিনী / **আতিকুর রহমান ফরায়েজী, ৩৭**
নিরুদ্দেশ রুমা / **ক্রাউন, ৪২**
আগে পরে কিছু নেই / **মোস্তাক আহমেদ, ৭২**
এতটুকু অভিমান / **আজিম, ৮২**
মরীচিকার টানে দহন-কাল / **হামিদ, ৮৫**
ক্ষুদ্রাকার তেলাপোকা ও পন্ডিতমশাইয়ের পাটিগনিত/ **নিঃশব্দ নাগরিক, ৯৮**
সই,কেমনে ধরিব হিয়া / **রাজিব সরকার, ৯৯**
আমার কোনো দোষ নাই / **সুমাইয়া বরকতউল্লাহ, ১০০**

স্মৃতিচারণ
যৌথ / **দীপঙ্কর বেরা, ৮০**

কাব্যগল্প
ওই যে ছেলেটি কবিতা লিখে / **এস কে দোয়েল, ৬৩**

বই আলোচনা
আমার প্রিয় লেখকের 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প' / **মৌনী রোম্মান, ৬১**
ফেরদৌসীর শাহনামা ও হিন্দুস্থান / **তানভীর আহমেদ সিডনী, ৭৭**

ফিচার
ভারতের রূপকুন্ডের 'কঙ্কাল হ্রদ' ও লোমহর্ষক এক রহস্য! / **মোস্তাক চৌধুরী, ৬১**
হিমালয়ের তুষারমানব : রহস্যময় ইয়েতি / **ওবায়দুল গনি চন্দন, ৮৪**

অনুবাদ
বৃটিশ কমন আরবান লিজেন্ড / **নোমান রহমান, ৫২**

সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন আহমেদ / **সংগ্রহে আনোয়ার জাহান ঐরি, ১৬**

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

পরিধিতে প্রতিবিম্ব / **মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান, ৫৪**

পিশাচ কাহিনী

অদৃশ্য রোগী / **তৌফিক মাসুদ, ৩৫**

ভূতের গল্প

ভৌতিক উপাখ্যান / **তাপসকিরণ রায়, ২৫**

ধর্ম ও দর্শন

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের ভূমিকা / **মো: মেহেদী হাছান, ১০**

সালাত আদয়ের গুরুত্ব / **আরিফুর রহমান, ৭২**

পর্যটন

সোনাকাটা সমুদ্র সৈকত- অভাবনীয় সৌন্দর্যের হাতছানি !, ৯৫

বিবিধ

পদ্ম পূর্ণিমা / **মরুভূমির জলদস্যু, ১০১**

কবিতা

ঈদের গান

এম আর মিজান

ঈদের খুশি হাসি খুশি নিত্য অমলিন
চাইগো প্রভু দয়া ক্ষমা অসীম সীমাহীন,,,,,,,

আমার কাছে ঈদ মানেতো মন্ডা মিঠা নয়,
তোমার থেকে চাই যে ক্ষমা নসিব যেন হয়।

তবেই আমার হাসিখুশি তবেই ঈদের দিন,,,,, (ঐ)

পাপের বোঝা বইতে গিয়ে ক্লান্ত সারা গা,
তোমার দয়া ক্ষমা পেলেই গাইবো সারে গা।

তবেই আমার হাসিখুশি তাকধিনা ধিন ধিন,,,,,,,(ঐ)

ঈদের দিনের মানে যদি হয় কলরব খুশি,
পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ খুশি হয় বুঝি।

ক্ষমাই আমার হাসিখুশি ক্ষমাই ঈদের দিন,,,,,,(ঐ)

ধর্ম ও দর্শন

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের ভূমিকা

মো: মেহেদী হাছান ✉ *ছাত্র, মাস্টার্স, ফার্মেসী, জা.বি*

মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম । নামাযের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো যাকাত। যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- শ্রী বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা ইত্যাদি। ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাত ফরজ হয়। যাকাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআন মাজীদে বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বৃদ্ধি করে "(রুম-৩৯)। যাকাত ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দারিদ্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনায়নই এর লক্ষ্য। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার লুকিয়ে আছে। এই অধিকার যথাযথভাবে বুঝে দেওয়ার জন্যই মহান আল্লাহ যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। হাহাকার মুক্ত সমাজ আর সুদ মুক্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যাকাত আদায়কে মহান আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন । পবিত্র কোরআনে নামায আদায়ের পাশাপাশি জোর দিয়ে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূরীভূত করে এই যাকাত ব্যবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ শর্তসাপেক্ষে সম্পদশালীদের উপর যাকাত প্রদান ওয়াজিব।

যাকাতে রয়েছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট ব্যয়খাত। এটা দান নয়; বরং গরীবের অধিকার। মহান আল্লাহ সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যে যতগুলো পন্থার কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে যাকাত হল অন্যতম। একটি সুদমুক্ত সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদের বিশুদ্ধতা অর্জন , অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান দূরীকরণ এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধংস করে দেয়"। দারিদ্রতা যে কোন জাতির জন্য এক চরম অভিশাপ। দারিদ্র ও হাহাকারমুক্ত সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব । দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করতে এবং সম্পদের সুষম বন্টনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচনে একমাত্র সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এই যাকাত ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ব্যবস্থা যে কোন দেশের জন্য একটা বড় অর্জন । এটি দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে, সম্পদের কুক্ষিগতা রোধে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

মহান আল্লাহ যেমন নামাজ সহ শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলী আমাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন তেমন এই যাকাত ব্যবস্থাও আমাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন । একটি দেশের সকল মানুষ ধনী নয় আবার গরীবও নয়। এখানে কেউ ধনী আবার কেউ গরীব । আর এই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার আকাশ পাতাল ব্যবধান দূরীকরণে যাকাতের অগ্রণী ভূমিকা অপরিসীম । যাকাতের মাধ্যমে সম্ভব দেশের অনাহারী লোকের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া । যাকাতের মাধ্যমেই সম্ভব সম্পদের সুষম বন্টনসহ ধনীর সম্পদে লুকিয়ে তাকা গরীবের সম্পদ বের করা । দেশের যে সকল লোকজন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে তাদের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থানে বসবাস করা

এবং কোন মতে দু'বেলা দুমুঠো ভাত যোগাড় করা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে ।

এমতাবস্থায় এ সকল পরিবারের সন্তানদের পোষাক পরিচ্ছদ , সুচিকিৎসা , উপযুক্ত পরিবেশে বসবাস এবং উপযুক্ত লেখাপড়াসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা কেবল দিবা স্বপ্নেরই নামান্তর । অথচ তারাও মানুষ । এদেরকে পেছনে ফেলে দেশকে সমৃদ্ধশালী , সুসভ্য , স্বনির্ভর জাতি ইত্যাদি যা কিছু বলা হোক না কেন তা সমাজে কখনও বাস্তবায়িত হবে না। অতএব, একটি গতিশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের এসব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল ধারায় আনতে হবে আর সেটা বহুলাংশেই সম্ভব এই যাকাত ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নে। রাসূল (স:) এর সময় সাহাবীরা অধিকাংশই আর্থিক সংকট ছিল সত্য ; কিন্তু এটা আরও সত্য যে ,যাকাত ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল । সাহাবীরা গরীব ছিল বটে , কিন্তু কেউ আর্থিক সংকটে পড়ে একেবারে ইন্তেকাল করেছেন ,এমনটি হাদিসে ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় না । রাসূল (স:) এর সময় অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে এখনকার মত রাসায়নিক সার , কলের লাঙল ইত্যাদি ছিল না । তবুও হাদিস ও অন্যান্য গ্রন্থে না খেয়ে মারা যাবার মত একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা জানা যায় না । অথচ বিজ্ঞনের যুগে বাস করে এক জমিতে বছরে দুই বা তিনবার ফসল উৎপন্ন করেও আমরা দেশের অনাহারী লোকদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারছি না ।

ফলস্বরূপ বহুলোক প্রতিবছর খাদ্যের অভাবে , পুষ্টির অভাবে , বাসস্থানের অভাবে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে । এর কারণ একটাই, সেটা হল দেশের পুঁজিবাদ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে ধনী থেকে অধিকতর ধনী হওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা।তারা তাদের অর্থকে কুক্ষিগত করে রাখে এবং দেশের উৎপাদিত ফসলের একটা বড় অংশ মাসের পর মাস গুদামে আটকে রাখে এবং মূল্য বৃদ্ধি না হওয়া পযন্ত তারা সেগুলোকে বাজার জাত করে না । ফলে সমাজে সম্পদ বন্টনের গতি মন্থর হয়ে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে । বিষয়টিকে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে, তারা যদি বিশাল অংকের এই টাকার এবং সম্পদের যাকাত আদায় করত তবে একদিকে যেমন সম্পদের সুষম হতো অন্যদিকে অভাবী লোকের কিছু না হোক অন্তত পক্ষে তাদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত উঠতো । কিন্তু তারা তো যাকাত দেয়ই না আবার মোটা অংকের মুনাফা না পাওয়া পর্যন্ত সম্পদ গুদামে ফেলে রাখে । ফলে প্রতি বছর অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় । আজ যদি আমাদের দেশে সরকারীভাবে যাকাত ব্যাবস্থা চালু থাকতো তাহলে একদিকে দেশের সম্পদের সুষম বন্টন হতো অপর দিকে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হতো । ফলে দারিদ্রতা চিরদিনের জন্য এ দেশ থেকে বিদায় নিত ।

প্রকৃতপক্ষে যাকাত আদায় এমন একটা মাধ্যম যেখানে সম্পদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটে । ফলে সম্পদ এক স্থানে থাকে না এবং একক মালিকানাধীন থাকে না এমনকি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে । যাকাত শুধু সম্পদের বিশুদ্ধতা আনে না , বরং যাকাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা , সম্মান , ও খাস রহমত আনায়ন করে । এছাড়া যাকাত আদায়কারীকে খাঁটি মুমিন হতে সাহায্য করে । যাকাত মানুষের মনকে কোমল করে । তার মন হতে অর্থলিপ্সা দূর করে । তাকে হালাল পথে আয়-রোজগারের অনুপ্রেরণা জোগায় । যাকাত আদায়কারী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক । কারণ যাকাত আদায়কারী যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে সাহায্য করে । ফলে বহু গরীব-দুঃখীর অন্নসংস্থানের সুযোগ হয় । অপর দিকে দেশপ্রেম হলো ঈমানের অঙ্গ । যাকাত আদায়কারীকে তার মহান সৃষ্টকর্তার সন্নিকটে পৌঁছে দেয় ।

সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের শামীল হওয়ার সুযোগ লাভ করে । যাকাত আদায়কারীকে তার সম্পদ সর্বদা তার রবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ করে দেয় । যাকাত না আদায়ের কুফল

বর্ণনা করতে গেলে সর্বপ্রথম মুসা (আঃ) এর সময়কার সেই বাদশা কারুনের কথা স্মরণ করতে হয় । কারুনের উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্বেও সে আল্লাহর বিধান অমান্য করে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল ।এই অবাধ্যতার ফলস্বরূপ মহান আল্লাহ তার সমস্ত সম্পদসহ তাকে মাটির নিচে ডাবিয়ে দেন । যেহেতু যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদের বিশুদ্ধতা অর্জন হয় সেহেতু যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তবে তার সমস্ত সম্পদ অপবিত্র হয়ে যাবে। আর এই অপবিত্র সম্পদ নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করলে তা কখনোও কবুল হবে না । তার জীবন হয়ে যাবে অর্থহীন , মূল্যহীন । হাশরের ময়দানে সে আল্লাহর সম্মুখে জবাব দিতে পরেবে না । অবশেষে তার বাসস্থান হবে মহাশাস্তির স্থান জাহান্নামে । মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন- “নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমীনরা, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত হয়, বাজে কাজ হতে দূরে থাকে এবং যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে।” ইসলাম সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থা সমর্থন করে না । তাই একটি ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছে এই যাকাত ব্যবস্থা । সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে সীমাহীন বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই । ডঃ মহসীন খান বলেন – “zakat is the major Economic means for establishing social justice.” দারিদ্রতা যে কোন জাতির জন্য এক মহা অভিশাপ । আর এই অভিশাপ হতে জাতিকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলো একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । আর এই শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা কায়েমে যাকাতের কোন বিকল্প নেই ।

শিশুতোষ গল্প

প্রাণীদের গণতন্ত্র

বিন আরফান

সুন্দরবনের রাজা সিংহমামা তার অঙ্গবনসমূহ পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজার সিদ্ধান্তের কথা বনের পশু-পাখিদের জানিয়ে দেয়া হল।

নির্বাচনে যারা অংশ নিতে ইচ্ছুক তারা যে যার মত ডাকঢোল পিটিয়ে গাধা ও ঘোড়ার টিঠে সরওয়ার করে প্রচারণায় মেতে ওঠে। প্রতিটি প্রার্থীর মুখে উন্নয়নের বুলি। নিরীহ পশু পাখির ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রায় সব প্রার্থীর মুখে মুখে।

হিরণ পয়েন্ট সংলগ্ন বনের সাধারণ নাগরিক তোতাপাখি। অভাব অনটন যার নিত্য দিনের সঙ্গী। পাখা ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি আহার সংগ্রহে বেরুতে পারতেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য তার প্রধান অবলম্বন ছিল বাগেরহাটের খান জাহান আলীর ষাট গম্বুজ মসজিদ পাশ্ববর্তী মাজার শরীফ। ভক্তদের দানে যতটুকু তবারক সংগ্রহ হতো সেখান থেকে তিনি যখন যা রিজিকে থাকতো খেতেন।

একদিন এক প্রার্থী অজগর সাপ মাজারে গিয়ে ঘোষণা দিলেন, আগামী শুক্রবার তিনি মাজারে অবস্থানকারী সকল পশুপাখিকে পেটপুড়ে উন্নত খাবার খাওয়াবেন। ঐ দিন অন্য ভক্তদের আর কিছু দান করতে হবে না।

অজগরের ওয়াদার পরিপেক্ষিতে শুক্রবার দিন মাজারে অন্যকেহ কিছুই দান করলেন না। সবাই আশায় ছিলেন অজগর খাবার দিনয়ে আসবেন, সেই খাবার তারা আয়েশ করে খাবেন।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু খাবার আসছিল না।

এক মুসাফিরর ভল্লুকের আনীত খাবার শেষ হওয়ায় তিনি মাজারে আসলেন তবারক খেতে। এসে দেখেন মাজারে তবারক নেই। তিনি হতাশ হলেন এবং এর কারণ তোতাপাখির নিকট জানতে চাইলেন।

তোতাপাখি জানালেন, এ বনের প্রভাবশালী অজগর আজ তাদের খাওয়ানোর ওয়াদা করেছেন। তারা সেই আশাতেই আছেন।

ভল্লুক জানালেন, তিনি নিজে একজন ধার্মিক এবং প্রার্থী অজগরকে চিনেন। ভল্লুকের আশ্বাস অজগর খুব ভালো প্রাণী। তার দৃঢ় বিশ্বাস অজগর অবশ্যই খাবার নিয়ে আসবেন। সকলকে চিন্তা করতে নিষেধ করলেন।

অজগরের প্রতি ভল্লুকের এত উচ্চ বিশ্বাস দেখে তোতাপাখি আফসোস করে বললেন, অজগরের ওয়াদার প্রতি তারও বিশ্বাস আছে। তবে তিনি এর চেয়ে বেশি বিশ্বাস রাখেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি। কেননা আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র রিজিকদাতা। ভল্লুক একথা শুনে লজ্জিত হলেন।

এদিকে অপরপ্রার্থী দুবলারচরের বাঘমামা প্রত্যেক ভোটারের সমর্থন পাওয়ার প্রত্যাশায় হন্নে হয়ে ছোটাছুটি করছিলেন এবং বনের পশুপাখিদের বিভিন্ন সমস্যা সাময়িকভাবে তাৎক্ষনিক সমাধান করছিলেন। তিনি খোঁজ পেলেন গহীন জঙ্গলে এক অন্ধ গোঁখরা সাপ বাস করেন, যিনি একজন বৈধ ভোটার। সেই গোঁখরা সাপ একা একা খোদার বন্ধনায় মগ্ন থাকতেন। সাপটি অন্ধ বিধায় সেখানে শুরুতে বেশ কয়েকদিন খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে অনাহারে কাটিয়েছেন আর ক্ষুধা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রহমতে এক হরিণী প্রতিনিদ গোঁখরা সাপকে দুবেলা এসে দুধ পান করিয়ে যেতেন।

এভাবে চলছিল গোঁখরার জীবিকা নির্বাহ।

প্রার্থী বাঘমামা গোঁখরা সাপের নিকটে গেলেন। ভোট পাবার আশায় গোঁখরাকে মুখরোচক খাবারের প্রলোভন দেখালেন। খাবারের মোহে সাপটি বাঘের সাথে গেলেন এবং পেটপুড়ে স্বাদের খাবার খেলেন। ফিরে এসে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলেন।

পরদিন তার প্রচন্ড ক্ষুধা পায়। তিনি আশায় চিলেন হরিনী এসে তাকে দুধ পান করাবেন। কিন্তু কয়েকদিন গত হতে চলছে হরিণী আর আসছে না। সাপ বুঝতে পারলেন তিনি মস্ত ভুল করেছেন। আল্লাহর উপর ভরসা করা বাদ দিয়ে বাঘের উপর আস্থা এনে খেতে যাওয়া ঠিক হয়নি। তিনি তওবা করে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত হলেন।

অন্যদিকে সুন্দরী কাঠ বাগানের প্রার্থী শিয়াল পন্ডিত গোটা বনে চমক লাগিয়ে দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি না ছেড়ে শুধু এই বনে প্রচারণ করছিলেন, আল্লাহ চাহেন তো তিনি সকলের সেবা করবেন এবং বনের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। নিজের জন্য যা পছন্দ করেন অপরের জন্যও তাই পছন্দ করবেন। তার দাবী যিনি খোদাভীরু সবাই এমন একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন। তার ধারণা বিজয়ী করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত ক্ষমতার মূলেও একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন।

নির্বাচনের তারিখ মোতাবেক নির্বাচন সম্পন্ন হলো। অজগর সাপ, বাঘমামা ও শিয়াল পন্ডিত তিনজনই কাছাকাছি ভোট পেলেন। তবে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মাত্র এক ভোট বেশী পেয়ে শিয়াল পন্ডিত বিজয়ী হলেন। এতে হট্টগোল সৃষ্টি হয়ে গেল নির্বাচনে কারচূপী হয়েছে।

এ সংবাদ রাজা সিংহমামা নিকট পৌাঁছাল। বনের হট্টগোল থামাতে রাজা নিরাপত্তাবাহিনী পাঠালেন। আর সমালোচনা করলেন, আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। নির্বাচনে কারচূপী প্রসঙ্গে তিনি বিচলিত নন। তার ভাষ্য, ক্ষমতা নিয়ে গন্ডগোল পশুপাখিদেরই মানায়।

ছোটগল্প

শৈশবের সাথী

সিকদার

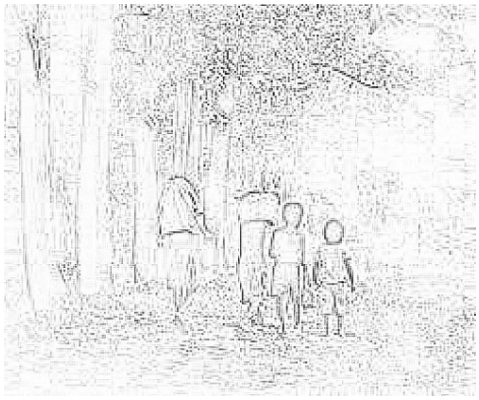

আমি যখন প্রথম মানিক ভাইকে দেখি তখন আমার বয়স কত ছিল মনে নাই । কারন তখন আমি ছোট ছিলাম। যতটুকু মনে পড়ে আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম , যাওয়ার পথে বিশাল বাগান বাড়ি ওলা একটা বাড়ির সীমানা প্রাচীরের ভাংগা অংশ দিয়ে ছিটকে বের হল হালকা পাতলা গড়নের কালো রংগের ছেলেটি । পড়নে লুংগী কাছা দেওয়া । এক হাতে গাছ হতে সদ্য পাড়া চার পাঁচটা পাকা আম । আমরা কয়েকজন বান্ধবী উপরের ক্লাসের আপাদের সাথে স্কুলে যাচ্ছিলাম । এই সময় ছেলেটি দৌড়ে বের হয়ে আমাদের সামনে এসে থমকে দাড়াল । আমরা হঠাৎ ওকে দেখে দাড়িয়ে গেলাম। এক সাথে এতগুলো মেয়েকে দেখে ছেলেটি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি লুংগীর কাছাটা নামিয়ে দিল। এই সময় ঐ সীমানা প্রাচীরের ভাংগা অংশ দিয়ে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে বের হয়ে এল। ছেলেটি কুকুরটি দেখেই আবার দৌড় দিল। ছেলেটি যেন বাতসে উড়ছে। পিছনে কুকুরটিও ওকে কামড় দেওয়ার জন্য ছুটছে ।

এদিকে আমরা মেয়েরা ভয়ে স্তব্দ হয়ে দাড়িয়ে দেখছি শেষটা কি হয় । ছেলেটি প্রাণপনে দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তা মধ্যেখানে সেতু ছিল । সে সেখান থেকে লাফ দিয়ে খালে পড়ল।

আমরা মেয়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম । আবার হাটতে লাগলাম। এইবার আমাদের মধ্যে যারা ওকে চিনে তাদের মধ্যে একজন বলল " বাপরে কি বিচ্ছুরে বাবা। হারাডা দিন গ্রামডাকে যেন্ মাথায় তুইল্লা রাখে । "

আরেকজন মেয়ে বলল " ঠিক কইছস । এই হেদিন আমাগো কলা গাছের এক কাঁদি কলা হাওয়া । এইডা এই মানিক্কার কাম। "

" আরে রাখ । তোগোত খালি এক কাঁদি কলা । আমাগোত এক রাইতে গোটা পুকুরের মাছই ছাফ কইরা ফালাইছে এই মানিক্কা চোরা।"

আমি অবাক হয়ে দেখি সবাই মানিকের বিরুদ্ধে । এর মধ্যে একজন মানিকের পক্ষে কথা বলে উঠল।

"সাহস থাকলে ওর সামনে কথাগুলি তোরা কইছ দেখি । কামাইল্লা চোরা করলে মানিকের দোষ । সুমন চোরা করলে মানিকের দোষ । পোলাডার বাপ নাইত সবাই হেরে নরম পাইচছ। কামাইল্লা মেম্বারের পোলা , সুমইল্লা আড়তদাড়ের পোলা, হেইল্লিগা হেগো বিরুদ্ধে কিছু কস না। "

সাথে সাথে আরেকজন বলল " ঠিক কইচ আপা । মানিক্কা গরীবত তাই সবাই তারে দোষে । এই তোগো যে গাছের কলা আর পুকুরের মাছ চুরি অইছে তোরা কি দ্যাখছস মানিক্কা করছে ?

ওরা কোন কথা বলল না ।

কিরে কথা কছ না ক্যা ?

তারপরও ওরা চুপ করে থাকল।

" গরিব বইলা সবাই মানিকেরে দোষ দেছ । যদি স্কুলের হেড মাষ্টার পোলাডারে না দেখত, তাইলে মাইনষে এতদিনে ওর হাড্ডি গুড্ডি এক কইরা ফালাইত। আরে, এই গ্রামের কথা বাদ দিলাম ,আশেপাশে দশটা গ্রামে মানিকের মত পোলা কয়ডা আছে ক দেহি ? জানি দেখাইতে পারবি না । প্রত্যেক বছর পরিক্ষায় ফাষ্ট কে অয় ? আমাগো মানিক্কা "

যাদের গাছের কলা চুরি হয়েছে সে বলল " সারাদিন দুইল্লার শয়তানি কইরা রাইতে মাত্র এক ঘন্টার মত পড়ে এতেই ফাষ্ট অইয়া যায় । কি মেধারে বাবা !

আরেকজন বলল "এই তাড়াতাড়ি থুক ফেল নইলে নজর লাইগ্যা যাইব। "

আমরা সবাই এক সাথে থু থু ফেলতে লাগলাম। এরপর পর প্রায় সময় মানিক ভাইকে দেখতাম আমার স্কুলে যাওয়া আসার পথে । কখনও গাছের ডালে বসে কিছু খাচ্ছে । কখনও খেলাধুলা করছে, কখনও মাছ ধরছে । তখন জৈষ্ঠ মাস । ডোবা ও পুকুরের পানি প্রায় শুকিয়ে গেছে । আমাদের বাড়ীর পাশে এক পুকুরের সব পানি সেচা হল । আমরা গ্রামের বড় ছোট সবাই হাত দিয়ে মাছ ধরছি । পুকুরের এক পাশে জংলা মত একটা জায়গা আছে । সেদিকে কেউ যাচ্ছে

না । কারন সবাই জানে সেখানে সাপ আছে । তাও যেই সেই সাপ না ! বিষাক্ত পদ্ম গোখরা সাপ ! ওদিকে মাছ থাকলেও কেউ যাচ্ছে না । আমি মাছ ধরতে ধরতে কখন ওদিকে চলে গেছি নিজেও জানি না । হঠাৎ ফোঁস আওয়াজ শুনে চিৎকার করে দৌড় দিলাম । আমার এত কষ্ট করে ধরা মাছ সব ছিটকে পুকুরে কাদায় পড়ে গেল। আমার চিৎকার শুনে মাছ ধরা রত সবাই থমকে গেল । মনে করল আমাকে সাপে কামড়েছে। আমি ভয়ে দৌড়াতে যেয়ে জংলা জায়গাটার সামনে কাদায় পা আটকে তখন পড়ে গেছি। ভয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠতে যেয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছি । সাপের ভয়ে আমাকে ধরার জন্য কেউ এগিয়ে এল না । শুধু মানিক এল। সে এসে আমকে দাড় করাল ।

" এই মাইয়া এত ডরাস ক্যা।

সাপে কামড় দিছে ?

তখন ভয়ে আমার দুই চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। মাথা নেড়ে না বললাম।

ও এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে জংলার কাছে এগিয়ে গেল। ওকে জংলার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সবাই চিৎকার করে নিষেধ করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা । ও আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ভিতরের দিকে হাত দিয়ে ঝটকা মারল। সাথে সাথে দেখি ওর হাতে প্রায় চার-পাঁচ হাত লম্বা গোখরা সাপ মোচড়াচ্ছে । মানিকের ডান হাতের মুঠায় সাপের মাথাটা শক্ত করে ধরা । ভয়ে মাছ ধরা রত দুই একজন বাদে সবাই পুকুর ছেড়ে পাড়ে উঠে গেল। আমিও যে কখন পাড়ে উঠে গেছি নিজেও জানি না । মানিক সাপটাকে নিয়ে পাড়ে উঠে বিলের দিকে গিয়ে আস্তে করে সাপটাকে ছেড়ে দিল । সাপটাও মাটির স্পর্শ পেয়েই একেবেকে চলে গেল। ও আবার পুকুরে নামার পর সবাই বলতে লাগল " তুই সাপটারে মারলি না কেন ?"

" সাপ আমাগো উপকার করে হের লিগা মারি নাই । তয় যদি মাইয়া ডারে কামড় দিত তহন মাইরা ফালাইতাম। "

আমি আর সেদিন মাছ ধরিনি । বারবার শুধু মনে হচ্ছিল মানিক ভাইয়ের কি সাহস ! কত্ত বড় সাপটাকে এক ঝটকায় ধরে ফেলল ।

আমি বাড়িতে এসে মাকে ঘটনাটা বললাম । মা ঘটনা শুনে অবাক গেলেন। এরপর আমি মাকে বললাম " মা আমি নলকূপে যাই, গোসল কইরা আসি ।

আমি গোসল করে ফিরে এসে দেখি মা মাছ কুটছে । সদ্য তাজা মাছ দেখে মাকে বললাম " মা মাছ কই পাইলা ?

" মানিক দিয়া গেছে । কইল ওর মায়ে পাডাইছে ।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, ওর মা আমার মাকে কি ভাবে চিনে যে মাছ পাঠাবে ।

" ওর মা কি তোমারে চিনে ? "

মা মাছ কুটা ক্ষ্যান্ত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল " চিনবা ক্যা? মানিকের মা আমার বাল্যকালের সাথী।"

এর কয়েকদিন পর এক শুক্রুবার মা আমাকে বললেন আইজকা বিকালে তোরে লইয়া আমার সাথীর বাসায় যামু । ঘরে থাকিস।

সেদিন বিকালে আমি আর মা মানিক ভাইদের বাসায় বেড়াতে গেলাম । গ্রামের একবারে শেষ মাথায় মানিক ভাইদের বাড়ি । গাছগাছালি ঘেরা পাখির কলরবে ভরা , নিকানো উঠানে সুন্দর একচালা বাড়ি । আমরা উঠানে পা রাখতেই মানিক ভাইয়ের মা দৌড়ে এল।

"কিরে সই তুই কারে নিয়া আইলি ? "

এই বলে আমার দুই গালে চুমু দিয়ে আমাকে কোলে তুলে নিল । আমি কিশোরী হলেও দৈহিক গঠন বাড়ন্ত হওয়ায় আবার নামিয়ে দিলেন।

" ডাঙ্গর হইয়া গেছস ।"

আমি আর মা ঘরে ঢুকলাম । ভিতরে ঢুকতেই পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে পিছনের উঠান দেখা যায়। সেখানে মানিক ভাই একটা বাঁশের বানানো খাচায় বন্দি একটি ধান শালিকের বাচ্চাকে আদার খাওয়াচ্ছে । আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম । পিছনে উঠানে নামতেই দেখলাম উঠানের মধ্যেখানে বাঁশের মাচার কবুতরের টং (বাসা) । সেখানে অনেক কবুতর । উঠানে কিছু গাছের ডালে কিছু বাকবাকুম করছে ।

আমি মানিক ভাইয়ের সামনে এসে দাড়ালাম । সে আমার দিকে না তাকাল না । পাখির বাচ্চাটাকে আদার খাওয়ানোর পর খাঁচায় রেখে আমাকে প্রশ্ন করল " কখন এসেছিস ? "

" এইত এখন । মানিক ভাই তোমার এখানে এত কবুতর কইত্থিকা আনছ ? "

" কিছু বাজার থিকা কিছু বন্ধুগ থিকা ।"

কবুতরগুলির নাম কি ? এই যে লেজডারে ময়ুরের পেখমের মত ছড়াইয়া রাখছে ।

" এইডার নাম ময়ুরী । "

" কাউয়ার মত গলাডা ফুইল্লা রইছে ঐডার নাম কি ? "

" ঐডা বহুত দামি কবুতর । নাম পিনবল । '

মানিক ভাই এর মাঝে ঘরে বেড়ার সাথে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটা বড়শির ছিপ থেকে একটা তুলে নিল ।

" কই যাইবা ?"

" মাছ ধরতে । তুই যাবি ? "

' যামু । মারে কইয়া আহি ।"

" খালাম্মারে কইলে আর যাইতে অইব না । তাইলে তুই থাক।"

" ঠিক আছে কমু না । চল।

আমরা দুইজন বাড়ির পিছন দিয়ে নাল জমিতে নেমে গেলাম তারপর কিছু দুর একটা ছাড়া ভিটার ভিতর দিয়ে জংগলে প্রবেশ করলাম। জগংলটা ছোট ছিল ওটা পার হতে বেশিক্ষন লাগল না । জংগলের পরেই কবরস্থান তারপর খাল। কবরস্থানটা অনেক পুরানো । এখন এখানে লাশ দাফন করে না । আগে যখন গ্রামে কলেরা বা বসন্ত হত তখন এখানে

ঐসব লাশ দাফন করত। কবর স্থানে প্রচুর বিশাল বিশাল গাছ । এই গাছগুলোর কখনও ডাইনে কখনও বায়ে পাশ কেটে খাল পাঁড়ে এসে আমরা পৌছলাম । খালটা মোটামুটি বড় ধরনের । পানিতে তেমন একটা স্রোত নাই। জোয়ার-ভাটা হয় তবে বোঝা যায় না । মনে হয় পানি সব সময় এক রকম থাকে । এই রকম খালে প্রচুর মাছ থাকে । মানিক ভাই সুবিধা মত একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল। তারপর সাথে আনা পলিথিনের মুখ খুলে জ্যান্ত কেচো বের করে বড়শীতে গেথে পানিতে ছেড়ে দিল । আমি মানিক ভাইয়ের পাশে বসে খালের অপর পাড়ে মানুষের আনাগোনা দেখতে লাগলাম । কিছুক্ষনের মধ্যে মানিক ভাই দশ -পনরটা কই আর শোল মাছ ধরে ফেলল । সেগুলো সাথে আনা বেতে টুকরির ভিতর রাখল । হঠাৎ আমি বললাম " মানিক ভাই আমরে দাও আমি কয়েকটা ধরি ।

আমার কথায় সায় দিয়ে মানিক ভাই বলল " পারবি ? পারলে ল । আমি খালে নাইম্মা পাড়ের ফুটের মধ্যে হাতাইয়া দেখি কোন মাছ পাই কিনা, ""

মানিক ভাই আমাকে ছিপটা দিয়ে লুংগী কাছা মেরে খালে নেমে গেল।

এই সময় আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঈশান কোন লাল হয়ে আসছে ।

" মানিক ভাই তুফান আইব মনে অয় । "

মানিক ভাই মাছ ধরা অবস্থায় পিছন ফিরে ঈশান কোনে তাকাল ।

" হরে ঠিক কইছস । চল আর মাছ ধরনের দরকার নাই । তুই না থাকলে আমি যাইতাম না । "

এই বলে মানিক ভাই পানি থেকে উঠে গেল । তাড়াতাড়ি সব কিছু গুছিয়ে নিতে লাগল । ইতি মধ্যে ঝড়ো বাতাস শুরু হয়ে গেছে।

সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন আহমেদ

সংগ্রহে আনোয়ার জাহান ঐরি

নিউইয়র্ক এ চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় হুমায়ুন আহমেদ বাংলানিউজের প্রতিনিধি শিহাব উদ্দিন কিসলুর কাছে এই সাক্ষাৎকার দেন। জনাব কিসলুর লেখনি থেকে সেটা তুলে ধরা হল।

"মা অপেক্ষা করছেন। ছেলেকে দেখতে। ছেলেও উদগ্রীব। তাই দেশে যাচ্ছি। ডাক্তারকে সেটাই বলেছি। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছিল, "দেশে যাওয়া কেন?"

নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকার ভাড়া বাসা থেকে স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় দেশের উদ্দেশে রওনা করার আগে এভাবেই নন্দিত লেখক হুমায়ুন আহমেদ বাংলানিউজের সঙ্গে তার একান্ত সাক্ষাৎকারটির সূচনা করেন।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই গুণী মানুষটির সঙ্গে যেন সাক্ষাৎকার নয়, গল্প জমে উঠেছিল। আলাপচারিতায় জানালেন, দেশের খাওয়া-দাওয়া খুব মিস করছেন।

এ প্রসঙ্গটি উঠতেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলেলেন, "ঢাকায় খবর হয়ে গেছে। বুঝেছ, খবর দিয়ে দিয়েছি। প্লেন সকালে নামবে। আমি বড় কই মাছ আলু দিয়ে, পেটে ডিম ভর্তি বড় বড় শিংমাছের ঝোল, আর বড় সাইজের কাতলের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট খাবো। বাংলাদেশি খাবারটা খুব মিস করছি।"

মানুষ হিসেবে অতি সজ্জন হুমায়ূন আহমেদের কথাবার্তায় মোটেও মনে হয়নি তিনি আসলেই চরম বেরসিক এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। শুধু বাইরের অবয়বে খানিকটা আঁচ করা যায়।

“দেশে গিয়ে কি কি করবেন, কোথায় কোথায় যাবেন স্যার?“ সোজা প্রশ্ন করলাম।

কোথাও যাবো না,” বললেন হুমায়ূন আহমেদ।

শুধু নূহাশ পল্লীতে যাবো। ওখানেই থাকবো কিছুদিন। ওখানে আমার বাবুর্চি আছে, দারুণ রান্না করে। ওর মত মুড়িঘন্ট আর কেউ করতে পারে না। সেই মুড়িঘন্ট খাবো।”

মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, “মা তো মা-ই, সবার উপরে। এই মা আমার চিকিৎসার জন্য জমানো টাকা ডলার করে সাড়ে ৫ হাজার ডলার আমেরিকা পাঠিয়েছেন। জমানো টাকাগুলো কিন্তু আমারই দেওয়া। সেই টাকাই আমাকে পাঠিয়েছেন। এই আমার মা।”

হুমায়ূন আহমেদ চোখের অশ্রু লুকিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কণ্ঠের আবেগ আর চেহারার রক্তিম আভা জানিয়ে দিয়েছে মা তার কত প্রিয়। শরতের মেঘে সূর্যের লুকোচুরির মতই হুমায়ূন আহমেদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে তার অনুভূতিগুলো ছুঁয়ে গেছে সাংবাদিকের কলমে।

“স্যার আপনার দেশে ফেরার অনুভূতি...“

বললেন, “দেশে ফেরা তো হচ্ছে না। আগে তো দেশে ফিরেছি স্থায়ীভাবে। কিন্তু এবার আগে থেকেই জানছি আবার ফিরে আসতে হবে। তাই দেশে ফেরার যে সত্যিকারের অনুভূতি, যে ভালো লাগা সেটা ততটা নেই। দেশ যে আমার কাছে অনেক আপন, সেখানে কি ক'দিনের জন্য যাওয়া ভালো লাগে!”

কথোপকথনের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য ঘরে ঢুকেছিলেন মামুন ভাই। স্বনামখ্যাত ফটো সাংবাদিক নাসির আলী মামুন। তিনি সুযোগ পেয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হুমায়ূন আহমেদের পারিবারিক বন্ধু গাজী কাশেমকে আমার অ্যানড্রয়েড ফোনের ক্যামেরায় আমাদের কয়েকটি ছবি তুলতে অনুরোধ করলাম। এ সময় হুমায়ূন আহমেদ সেল ফোনটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, “মামুন, গুগলের লেটেস্ট এই ফোনটা দেখেছো?”

মামুন ভাই জবাব দিলেন, “জ্বি, খুবই ভালো।”

হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী শাওন ছেলে নিষাদকে সামলানো আর মালপত্র গোছানোতো ব্যস্ত। এরই মাঝে বাইরে গিয়ে ছবি তোলার জন্য গাজী কাশেমের অনুরোধ। ছবি তুললাম। ছবিটা হুমায়ূন আহমেদকে দেখিয়ে বললাম, “স্যার, মামুন ভাইয়ের চেয়ে ভালো হয়েছে না? উনার ব্যবসা তো এবার শেষ!”

বললেন, “হ্যাঁ, ওর ব্যবসা আসলেই শেষ।”

মামুন ভাই খানিকটা সরল হাসিতে সেই `সত্য` যখন স্বীকার করে নিলেন, হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বললেন, “শোনো, এতে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই। তোমরা কি জানো বাংলাদেশে ফটোগ্রাফারের সংখ্যা কত?“

আমি আর মামুন ভাই দু'জনই ভাবছিলাম সংখ্যাটা কত হতে পারে।

ওদিকে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, “সংখ্যাটা এক কোটির বেশি। কিভাবে? শোনো। ঢাকায় আমি একদিন পাবলিক টয়লেটে গেছি। অমনি পাশ থেকে কয়েকজন বলে উঠলো, “স্যার একটা ছবি তুলি?”

বলেই সেলফোনে ছবি তোলা শুরু করলো।

বললাম, “বাবারা, আমি তো পাবলিক টয়লেটে দাঁড়িয়ে!”

হাসির জোয়ারে ভেসে গেলাম সবাই। শেষে বললেন, “দেশে সবার হাতেই সেলফোন।

সবাই ক্যামেরাম্যান।”

ওদিকে বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে কথোপকথন এখানেই শেষ।

গল্প

ব্যাতিক্রম "মা

মনির হোসেন মমি

ঠিক কোন বাক্যটি দিয়ে গল্পটি শুরু করবেন ঠিক বুঝে উঠে পারছেন না নাছির সাহেব।প্রায় মাস খানেক কেবল শুরু করতেই লেখা, নিজের মন মত না হওয়ায় একের পর এক কাগজের পৃষ্টা ছিড়ে ডাষ্টবিনের খোরাক বানাচ্ছেন।নাছির সাহেব পাঞ্জেয়ানা মুসলিম যাকে বলে গাল ভরাট দাড়ি,মাথায় টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস টুপি,পায়জামা-ঝুব্বা সব সময় ইসলামী মাইন্ডেট থাকেন।ঘরে তার বৃদ্ধ পেরালাইসেস মা।মাকে সেবা করতে সেখানে লোকের অভাব নেই তারপরও নাছির সাহেব তার সহধর্মীনিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তার মায়ের যাতে, সে কোন অমর্যাদা না করেন।দীর্ঘ দুই বছরের উপরে হবে তার মা অসুস্হ হয়ে ঘরে এক বিছানায় শুয়ে আছেন।তার মলমূত্র ত্যাগে এক জন কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছেন। যদিও নাছির সাহেব একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তবুও অতিরিক্ত ব্যায়ের কথা চিন্তা না করে মায়ের শরীর এবং মনের দিকে সে বেশ সজাগ।এক বার মা শুধু ইশারায় প্যারালাইসের কারনে সে তেমন স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন না কিন্তু নাছির সাহেব মা হা করলেই বুঝতে পারেন মা কি বলতে চাইছেন তো একবার বলেছিলেন...বাবারে আমার আর সহ্য হয় না এবার কোন মতে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারলেই বেচে যাই...বাস এইটুকুই মায়ের মুখ থেকে বের হওয়া সাথে সাথে নাছির সাহেব বাড়ীর চৌদ্দ গোষ্টি এক করে ফেলেছেন।তার অন্য আরো দুই জন বড় এবং ছোট ভাই,ভাইয়ের বউ,ছেলে মেয়ে,নিজের ওয়াইফ,ছেলে মেয়ে ডেকে এক করে মায়ের সামনে হাজির করলেন।মা তো অবাক ছেলে আমার একি করছে!নাছির সাহেব সবাইকে নিয়ে মায়ের কাছে ভারাক্রান্ত নয়নে মায়ের পায়ের বরাবর বসে মায়ের পা দুটি ধরে রেখেছেন।

-মা,তোমার সামনে সবাইকে দাড় করিয়েছি এবার বলো কে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে....বলো মা, তুমি বলো তুমি না বললে যে আমি শান্তি পাব না।

ছেলের কান্ড দেখে মা মিটমিট করে হাসছে।নাছির সাহেব মাকে মিটমিট করে হাসতে দেখেও বুঝতে পারছেন না, মা মনে হয় কিছু লোকাচ্ছেন ঐ হাসির আড়ালে অনেক মায়েরা এমনই করেন শত কষ্ট হলেও ছেলেকে কিছুই বলেননা।তাই আবারও সে বলছেন।

-মা,এই মা তুমি আমার কাছে কিছু লোকাবে না তুমি সত্যি করে বলো কে তোমাকে ব্যাথা দিয়েছে,বলো মা বলো।

ছেলের পাগলামী যেন থামছে না তাই দেখে আবারও মিটমিট করে হাসছেন মা ঐ দিকে নূরের ফেরেস্তারাও তা দেখে মায়ের সাথে সাথে হাসছেন।নাছির সাহেবের এবার রাগ হলো মায়ের পায়ের কাছ থেকে উঠে দাড় করানো বাড়ীর লোকদের কাছে যাবে জিজ্ঞাসা করবে কে মাকে দুঃখ দিয়েছে।নাছির সাহেব বসা থেকে উঠতে যেয়ে আর উঠতে পারেননি হঠাং মা নাছির সাহেবের পাঞ্জাবী ধরে ফেলেন ইশারা দেন মায়ের মুখ বরাবর যেতে।নাছির সাহেব মায়ের মুখ বরাবর মুগবয় দেন মা তার কপালে আর্শীবাদের চুমো এটে দিলেন এবং নাছির সাহেবকে বুঝাতে সক্ষম হন এখানে কেউ তাকে অবহেলা করছেন না সবাই তার খোজঁ খবর রাখেন।অতিরিক্ত সুখেও মানুষ যেমন কেদেঁ ফেলেন তেমনি মা সে দিন তার আর এক বন্ধবীর কষ্টের কথা শুনে নিজেকে অন্যের উপর বোঝা ভেবে মনের অজান্তেই কথাগুলো বলে ফেলে ছিলেন কিন্তু মা বুঝতে পারেননি মা পাগল ছেলে তার এত দরদ তার মায়ের প্রতি।মা নাছির সাহেবের বউকেও কাছে ডেকে কপালে চুমু দেন আর ছেলেকে শাষন করে ইশারায় বলেন....আমার দিব্যি লাগে তুমি বউমাকে কখনও কষ্ট দিবে না।ছেলে তাতে মাথাটি নাড়ায়ে সায় দেন।

মায়ের প্রতি ছেলের এমন ভালবাসা স্বার্থপর পৃথিবীতে কমই দেখা যায়।তেমনি আমার দৃষ্টিতে বাস্তব দেখা দেয় এমনি একটি উচ্চ শিক্ষিত এবং ধনাঢ্য পরিবারের মায়ের প্রতি অমর্যাদা আর অবহেলার বাস্তব রুপ।মা বাবার প্রতি ছেলে মেয়েরা যখন অবিচার করেন স্রষ্টা হয়তো ভাবেন পৃথিবীর

সৃষ্টিতে সে ভূল করেছিল।আমার খুব নিকটের লোক আমারি স্কুল কালের বন্ধু আমার পাশা পাশি বাড়ী।এমন একটি বাস্তব কাহিনী লেখবার ইচ্ছে আমার ছিল না কিন্তু একান্ত দায় মুক্তির খাতিরে কিছু লেখার ব্যার্থ প্রয়াস মাত্র।কেননা উঠতি জীবনে আমার অনেক গুলো রাত অনেকগুলো দিন বন্ধুর মায়ের কাছাকাছি থেকেছিলাম একটু হলেও মায়ের পরশ পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে।আমরা যখন তার কাছে যেতাম সে আমাদের জন্যে অনেক কিছু করত, নিজে কাঠের চুলোয় বিভিন্ন শীতের পিঠা কিংবা ঝাল মুড়ি বানিয়ে রাখত যখন আমরা যাব তখন খেতে দিবে বলে।যখন তখন যে কোন ছেলের বায়না বা আবদার পুরণে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।সেই মায়ের প্রতি অবহেলা,বঞ্চনা দেয়া খোদার আরশ সহ কেপে উঠত।

আজকের সূর্যটা যেন আর মেঘে ঢাকা পড়ছে না।বত্রিশ ডিগ্রীর সূর্য্যের তাপমাত্রা যেন গা পুড়ে যাবার অবস্হা।প্রচন্ড এই গরমেই মা বের হন বাসা বাড়ী কাজের জন্য,প্রায় আধা মাইল ত্রিশোর্ধ মা তার ছোট দুই ছেলেকে মানুষের মতন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।এক সময় যখন এই মা তার প্রথম শশুড় বাড়ীতে আসেন তখন কি না ছিল তার স্বামীর,গোয়াল ভরা গরু,মহিষ, গোলা ভরা ধান,অগণনিত ফসলের জমি,বিশাল রাজকীয় প্রাসাদের মতন বাড়ী আর হবেই না বা কেনো কথিত আছে যে তার স্বামীর ঘরের সামনের রাস্তা দিয়ে কেউ হেটে গেলে পায়ের জুতো হাতে নিয়ে যেতে হতো।বৃষ্টিতে কেউ ছাতা ব্যাবহার করতে পারত না এটাই ছিল এলাকার সবার জন্য আইন কারন সে যে জমিদার।সে সময়কার জমিদাররা যা বলতেন তাই হত আইন।জমি বেচা কেনা হতো মুখের কথার উপর বিশ্বাসের উপর লিখিত দলিলের তেমন একটা প্রয়োজন ছিল না।সেই জমিদার স্বামীর ব্যাবহার ছিল ভয়ংকর।সর্ব ক্ষন মদের নেশায় ভূত হয়ে বাইজীর নৃত্যের তালে টাকার বদলে দলিল ছুড়ে দিত।মিনিটেই জুয়ায় বিলিয়ে দিতেন বিঘায় বিঘায় জমিন,ছিলেন বদ রাগীও কত মানুষ কে যে সে চাবুকের আঘাতে রক্ত জড়িয়েছেন তা বলা মুসকিল।মানুষকে গরু ছাগলের মতন ভাবতেন।সেখানে মা ছিল ভিন্ন তার আরো সতিন থাকলেও সে স্বামীর হারামের রাজত্বে থাকেননি,প্রতিবাদে লাভ হয়নি বরং অত্যাচারিত হতেন সে অবশেষে ছয় সাত বছরের ছেলে দুটোকে নিয়ে বিলাসময় রাজ্য থেকে বেরিয়ে যান দূরে এক অচিন গ্রামে যেখানে কেউ তাকে চিনবে না।মোগলী কিচ্ছা হলেও এটাই বাস্তব আমাদের গ্রামের পূর্ব পূরুষদের রাজকিয় ইতিহাসে।এক সময় এই জগন্য ইতিহাসের ইতি ঘটে,ধ্বংস হয় অহংকারের প্রাচুর্য্য অবশেষে রাজার সন্তানদের ভাড়া বাড়ীতে থেকে জীবনকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল মৃত্যুর কাছে।

মা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ছেলে দুটোকে নিয়ে।এ বাসায় ঐ বাসায় ঝিয়ের কাজ করে পেট চালায় এবং ছেলে দুটোকে শিক্ষিত করে মানুষ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।ছেলে দুটোও ছিল মাশাল্লা দেখার মতন রাজপুত।দিন যায় রাত যায় খেয়ে না খেয়ে মা পরিশ্রম করে ছেলে দুটোকে মেট্রিক পাশ করান।দেখতে দেখতে চলে যায় আরো বেশ কয়েকটি বছর।কোন ক দিন মায়ের দেহ যেন আর সয় না ক্লান্ত দেহে মা শুয়ে ছিল সে দিন আর কাজে যেতে পারেননি।ছেলে দুটো কলেজ থেকে ফিরে মায়ের তেমন একটা খোজঁ নেন না চলে যায় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় অথবা কোন ক্লাবে।ঘরে ফিরে দেখে মা জ্বরে কাতর হয়ে কাদাঁমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন।ঔষধ কি, লাগবে কি না, মা তুমি কেমন আছো শুয়ে আছো কেনো?কোন প্রশ্নই নেই যেন ছেলেদের।দুনিয়ায় যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন।মা ঘরে শুয়ে শুয়ে কেবল আল্লাহর নাম যপছেন।আল্লাহ তার কথা শুনে পরদিন সকালেই জ্বর সেরে যায় কিন্তু পেলো না ছেলেদের কাছ থেকে কোন সেবা।মা আবার ভাবেন,থাক ওদের জানিয়ে শুধু শুধু কি লাভ পোলাপান মানুষ ঘাবড়ে যাবে চিন্তা করবে,এখানেই মায়ের ভিন্নতা অন্য সব মায়েদের চেয়ে সে একটু ব্যাতিক্রম।ছেলেরা আই এ পড়ছেন তবুও যেন তার কাছে ওরা পোলাপান।কিছু দিন পর ছোট ছেলেটিকে স্বামীর পরিত্যাক্ত কিছু জমি ছিল তার নামে সেই জমি বিক্রয় করে পাঠিয়ে দেন ফ্রান্সে।বড় ছেলেটি দেশেই থেকে যায় সে লেখা পড়া ছেড়ে গাড়ীর কাজে লেগে যায়।ছোট যে ছেলেটি সে ইন্টার পড়া অবস্হায় ফ্রান্সে চলে যায়।ফ্রান্সে সে এক সময় স্যাটেলড হওয়ার জন্য সেখানে এক অর্ধ বয়সী রমণীকে নিকাহ করেন কন্টাক ম্যারিজ বাংলাদেশে যে তার শিকড় রয়ে গেছে সে দিকে তেমন কোন খেয়াল নেই,পশ্চিমা অনুকরণে মাঝে মাঝে দেশে এসে নিজের জন্মভূমির দায় সারা মাত্র।বড় ছেলেকে বিয়ে করান ঢাকাতে তাদের ঘরে ফুটফুটে দুটো সন্তান।কয়েক বছরের মধ্যেই পাচঁ তলা বিশিষ্ট একটি প্রসাদময় বিল্ডিং তৈরী করেন।কিছু দিনের মধ্যে ছোট ছেলেও ফ্রানস থেকে এসে দেশে আরো একটি বিয়ে করেন।মায়ের ঘোর আপত্তি সত্বেও বাধা মানেনি ছেলে বিয়ে করে ঘরে তুলেন।

পাচঁ তলা প্রাসাদে দুই ইউনিটের দুই ভাইয়ের দুইটি ইউনিট রেখে বাকী ইউনিটগুলো ভাড়া দিয়ে দেয় মা কোথায় থাকবে প্রশ্ন ফুফাত বোনের,চাচাত বোনের এবং পাড়া প্রতিবেশীদের কিন্তু যাদের মা তাদের যেন কোন মাথা ব্যাথা নেই মাকে নিয়ে।দেন দরবার বসার অবস্হা।মা যেন একটু অনিহা দেখালেন তাকে নিয়ে দেন দরবার বসাতে তার ভাবনায় ছেলেরা সমাজের চোখেঁ ছোট হয়ে যাবে ।ছেলেদের মান সম্মানের দিকে চিন্তা করে মা বোনদের দেন দরবার করতে দেননি এখানেই মায়ের চিন্তাধারা বোনদের চেয়ে ব্যাতিক্রম।অবশেষে মা পাচঁ তলার সাথে একটি ছোট টিনের ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।আর খাবার দাবারের ব্যাপারে দুই ছেলেই খাওয়াবে তবে পালাক্রমে সময় মতন খাবার পাঠিয়ে দিবেন মায়ের ঘরে।

দেখতে দেখতে মায়ের জীবন থেকে চলে গেলো আরো বেশ কয়েকটি বছর মা এখন আর আগের মতন উঠে চলা ফেরা করতে পারেন না।ছোট্ট টিনের ঘরটিতে একাই দিন রাত নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন।ছেলে আছে আছে ছেলের বউরা আছে নাতিনও।নাতিনরা আগে তার ঘরে এলেও বেশ কিছু দিন যাবৎ নাতিনরাও আসে না আর ছেলে ছেলের বউদেরতো প্রশ্নই আসে না।এই একটি বয়সে সব মায়েরই ইচ্ছে থাকে শেষ বয়সে অন্তত ছেলে মেয়েদের সেবা পাওয়ার কিন্তু তার ভাগ্যে বিধাতাই যেন রাখেনি।একদিন বাহিরের কোন এক ব্যাক্তি

খবর দেন পাচ তলায় ছেলেদের তাদের মা আর নেই ডেকেও সাড়া না পেয়ে ব্যাক্তিটি হয়তো ভাবছেন বুড়ি মরে গেছেন।খবর পেয়ে বড় ছেলে,ছেলের বউয়েরা ছোট ছেলে তখন ফ্রান্সে ছিল।নীচে মায়ের ছোট টিনের ঘরে ঢুকতেই বড় ছেলে দরজার চৌকাঠের আঘাত পান কপালে,কপাল ফাটেনি তবে ফুলে টুভলা হয়ে গেছে।ছেলের বড় বউ প্রথমে ঢুকে মায়ের হাত,কান,গলার দিকে তাকিয়ে অবাক হন স্বর্ণের জিনিসগুলো নেই!ছোট বউ আসেন সাথে সাথে বড় ছেলেও ভিতরে ঢুকেন।

-কি রে ছোট আম্মার গলা হাত কানের জিনিসগুলো কই?

-আমিতো জানি না দিদি।

-বললেই হলো আমাদের ছাড়া আর কে নিবে বল?

-পরশু ফুফাত বোনেরা এসেছিল,আম্মা ওদের দিয়ে দেইনিতো?ছোট বউয়ের কথা।

-হতেও পারে,

কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘর ভরে যায় আশে পাশের মানুষের। কেউ বলছেন আহারে!কত ভালো মানুষ ছিল, কেউ কেদে দিয়েই বলছেন এইতো কিছুক্ষন আগেও না আমি কথা বলে গেলাম,হায়রে!মানুষের জীবন,কেউ আবার অট্রেলিকা বসবাস রত ছেলেদের ভৎসনা করতেও ছাড়েন নি,,,কেমন ছেলেরা,ওদের কি আর কম আছে যে মাকে ছোট্র একটা টিনের ঘরে রাখবে!এর রকম জীবিত মানুষগুলোর কত যে আকুতি তার জন্য অথচ মৃত্যুর আগে এই কথাগুলোই কেউ বলে না।এ রকম বৃদ্ধাদের অবহেলায় বেলায় কেউ এগিয়ে আসেন না মনে হয় এটাই মানুষের চরিত্র।বড় ছেলে খবর পেয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে অবাক হন এত লোকজন দেখে সেও তো মানুষ তার উপর মায়ের বড় ছেলে, মৃত মায়ের প্রতি একটু দরদতো আসবেই।ছেলে মা মা বলে মায়ের কাছে গিয়ে বসে কাদঁছেন।মায়ের হাতটি ধরে যখন ছেলে অঝোরে কাদছেন তখন ছেলে আন্দাজ করতে পারেন তার মায়ের হাতের শিরায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ছেলে সবাইকে চুপ করতে বলেন এবং ভিড় কমিয়ে ঘরের বাহিরে যেতে বলেন। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ডাক্তারকে খবর দেন।ছোট বউ বড় বউ সবাই হতভম্বঃ....কি বলছেন ভাই জান আম্মা বেচে আছেন?ছোট বউয়ের প্রশ্ন।সবাই যেন আল্লাহ-রসূলের নাম জবতে শুরু করলেন।ডাক্তার সাহেব এসে মায়ের পাশে বসে খুব স্লোল ভাবে মায়ের কানের কাছে কথা বলছেন আর মায়ের চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন।মা এবার ইশারায় অল্প অল্প করে কথা বললেন।

-যাক....ভালই হলো এই সুযোগে পৃথিবীর মানুষগুলোকে..চেনা হলো।বলেই আবারও চোখঁ বন্ধ করলেন।ডাক্তার সাহেব মাকে কিছু খাবার দেবার জন্য ছেলের বউদের বললেন।বললেন মা খুবই দূর্বল তাকে নিয়ম অনুযায়ী ভাল বিটামিন জাতীয় খাদ্য দিতে হবে।তৎক্ষনাত ছোট বউ কিছু ফল টল কেটে মাকে ডাকছেন।মা কয়েকবার ডাক দেবার পর জবাব দিলেন...আমি রোজাঁ রেখেছি।ডাক্তার সাহেব এবার স্কেপে যান।

-এ সময় কিসের রোজা রেখেছেন,আপনিতো অনেক দূর্বল।

-মরেতো যাইনি বাবা,ছেলেদের মঙ্গলার্থে কিছু নফল রোজা রাখছি তাই একটু ঝিমিয়ে ছিলাম।

এখানে মায়ের মমতার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।যেখানে বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী খালা বোনেরা যা ভাবেন না,সেই ভাবনা ছেলেদের মঙ্গলার্থে মৃত্যু পথ যাত্রী মায়ের আল্লহর দরবারে রোজাঁ রেখে ছেলেদের মঙ্গল চেয়ে যাচ্ছেন অথচ সে অবহেলিত।তাই বলা যায় অন্য সবার চেয়ে ব্যাথিক্রম মায়ের স্নেহ মায়া ভালবাসা।

গল্পের শুরুতে মধ্যবিত্ত গ্রাম্য নাছির সাহেবের মায়ের কথা বলা হয়েছিল তার মা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে শুখি মানুষ প্যারালাইসেসে সর্বক্ষণ শুয়ে থেকে অন্যের সাহায্যে নিয়ে বেচে আছেন সেই মায়ের মুখে হসি যেন সর্বক্ষণ লেগেই থাকে তার অন্য সম বয়সী বান্ধবীরা হিংসায় পড়ে থাকেন।সেই নাছির সহেবের ছোট ভাইয়ের বউয়ের কারনে ছোট ভাইও ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি যত্নের ভালবাসার ফাটল ধরতে শুরু করছিল এক বার সমান্য কটু কথাও মাকে বলে ফেলেন।নাছির সাহেব বুঝতে পেরে ছোট ভাইকে শাসায় এবং বুঝায়।ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কোন কথারি প্রতিত্তোর দেননি বরং উল্টো বউকে শাসান।

-তোমার কি ইচ্ছে?

-আমিই কেবল খেটে যাবো?

-তুমি একা কই আমি,ভাইয়া,ভাবী ওরাতো খাটছেন যখন যে সময় পাচ্ছে মায়ের পাশে থাকছেন,তাছাড়া মা কে দেখাশুনা ছাড়াতো তোমার আর কোন কাজ নেই বাড়ীর বাকি সব কাজতো ভাবীই করছেন আবার সময় পেলে মায়ের দিকেও খেয়াল দিচ্ছে,কাজের মেয়েটি হঠাৎ চলে যাওয়াত তোমার একটু বেশী করতে হয়,এটাকে তুমি যদি কষ্ট মনে কর তাহলে তুমিও যেনে রাখো তোমারও একদিন মায়ের মতন এমন বয়স হবে তখন তুমিও তোমার কর্মের ফল পাবে তখন বুঝতে আমি তোমাকে কেনো মায়ের প্রতি যত্ন নিতে বলেছিলাম।ম এখন সেই আমাদের শিশু কালে ফিরে গেছেন আমাদেরকেও এক দিন এই অবস্হায় যেতে হবে এ সময় যত্ন না নিলে আমরা স্রষ্টার কাছে কি জবাব দেবো বলো,যে আমাকে পৃথিবীর আলো দেখালো,যার জন্য আজ তুমি আমার হতে পেরেছো সেই তাকে অবহেলা!না তা হয় না,আমারও ভাইয়ার মতন পরিষ্কার কথা, যত দিন মা ভাই বেচে থাকবেন ততদিন তুমি আমার কোন কথার অবাধ্য হতে পারবে না বিশেষ করে মায়ের প্রতি যত্নের অবহেলা করতে পারবে না তাতে তুমি আমার সংসার করো আর নাই করো।.....যাই মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি তোমার ভ্যান ভ্যানানিতে মাকে কিছু মন্দ বলেছিলাম।

ছোট ভাই নিজের ভূল বুঝতে পেরেছিল,তাই সেও শক্ত হলো বউয়ের প্রতি।আসলে আমাদের সমাজে আমরা অযথাই পরিবারের বিচ্ছেদে সহজেই বউকে দোষী করে ফেলি এটা ঠিক নয় ছেলের মন ঠিক থাকলে,ইচ্ছে থাকলে আর ছেলের মায়ের দুধের কৃতজ্ঞতার কথা মনে থাকলে পরের মেয়ের বউয়ের কি সাধ্য আছে যে ছেলের মনে মা বাবার প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে।ছোট ভাই যখন উঠে যাচ্ছেন মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে ঠিক তখনি ছোট বউ পেছন থেকে স্বামীর হাতটি ধরেন।

-কোথায় যাও?আমাকে নিবে না?আমিও যাবো মায়ের কাছে।

-চলো....

এতক্ষণ কথার মাঝেই দু'জনের চোখেরঁ পানি টলটল করছিল তা এখন আর ধরে রাখতে পরেননি।দুজনের চোখের পানি

গাল বেয়ে মাটিতে পড়ছে এ যেন তাদের অন্তরের সূদ্ধির সূরা প্রবাহিত হলো।এমনি ভালবাসায় সিক্ত হয়ে নাছির সাহেবের মা দীর্ঘ চার বছর প্যারালাইসেসে বিছানায় শুয়ে শেষ নিঃষাস ত্যাগ করেন ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

এবার আসা যাক মূল কথায় অবাঞ্চিত ব্যাতিক্রম মায়ের কাছে।কিছু মায়ের ভাগ্যে বিধাতা জন্ম থেকেই কষ্টের ঠিকানি দিয়ে দেন।তার ভূয়া মৃত্যুতে সবাই যখন ব্যাস্ত তার সম্পদ কব্জার করার তখন মায়ের মন থাকে একটু খানি ভালবাসা পাবার তৃষ্ণায় শুষ্ক মরুভূমি।সেই যাত্রায় মায়ের মৃত্যু না হলেও এ যাত্রায় সে আর বেচে নেই।সেই একাকিত্ব জীবনে আরো প্রায় বছর খানেক বেচেছিল কিন্তু পাননি কারো আদর যত্ন ছেলেদের বিশাল অট্টেলিকার পাশেই লোকে মন্দ বলবে ভেবে একটি ছোট টিনের ঘরেই শেষ নিঃষাস ত্যাগ করেছিলেন বৃদ্ধ সংগ্রামী মা।মৃত্যুর সময় তার পাশে কেউ ছিলনা ছেলে,ছেলের বউ নাতি নাতনী কেউ ছিল না মৃত্যুর মুহুর্তে মায়ের মুখে জল দিবে বলে। তবে হ্যা ছিল একজন, না কোন মানুষ নয় ছিল কুকুর নামের মায়ের পালিত প্রভু ভক্ত একটি বোবা জন্তু।মায়ের মৃত্যুর পর পর অথ্যাৎ ফজরের আজাঁনের পর হতেই কুকুরটি এক বার মায়ের ঘরের ভিতর ঢুকে আবার বাহিরে এসে অট্টেলিকার উপরের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।এ ভাবে প্রভু ভক্ত কুকুরটি প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ ঘেউ ঘেউ করছে তাতেও কারো কোন সাড়া শব্দ নেই,অবহেলিত মায়ের ছোট ছেলের ঘরের নাতিন বিল্ডিংয়ের উপর থেকে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ শব্দ পেয়ে মাকে বলল মা তেমন কোন গুরুত্ব দেননি।এর পর সকালে দুধ দিতে আসা দুধওয়ালী ছেলেদের দুধ দিতে এসে কুকুরটির অস্বাভাবিক আচরণ তার সন্দেহ হলো সে মায়ের ঘরে ঢুকে মাকে কয়েক বার ডাক দিয়েও সাড়া না পেয়ে ছেলের বউদের বলেন।ছেলের বউয়েরা মায়ের কাছে এসে শিরা ধমনী পরীক্ষা করে দেখেন এবার মা সত্যিই পর পাড়ে চলে গেছেন।

মনে রাখা জরুরী "মৃত্যুই একমাত্র চির সত্য এই পৃথিবীর"।

জীবনের গল্প

এতটুকু অভিমান

আজিম

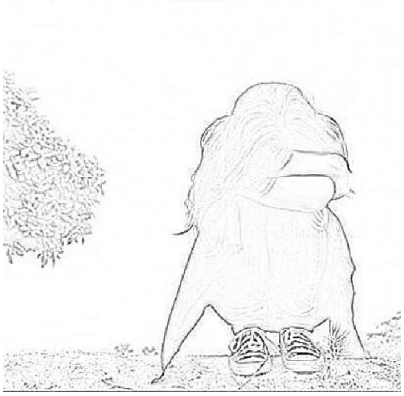

ঠিক গন্ডগ্রাম না হলেও শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা । বাড়ীর দু'পাশের একপাশ দিয়ে একটি বড় রাস্তা এক উপজেলায় এবং আরেকপাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে । বাকী দু'দিক খোলা, যেখানে শস্য বোনা হয় বিভিন্ন রকমের । কেউ কেউ সবজিও বুনেন। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে যখন সরষে গাছের হলুদ রংয়ে ছেয়ে যায় প্রান্তরটি । বড়ই মধুর লাগে তখন । বাড়ীর পাশেই ছিল একটা পুকুর । ছেলেবেলায় বান্ধবীদের নিয়ে নেচে নেচে এই প্রান্তরে এবং পুকুরেই বিচরণ করতাম দিনের অনেকটা সময় । মায়ের মারের কথা যখন মনে পড়ত, তখনই শুধু ক্ষান্ত হতাম ।

না, ছাত্রী মোটেই ভাল ছিলামনা আমি, বান্ধবীরাও নয় । একসাথে আমরা স্কুলে যেতাম এবং কিছুটা লোকদেখানো পড়াশুনাও করতাম মায়ের মার এড়ানোর জন্য । এতেই হয়ে যেত, ফেল করিনি কোনদিনই ।

বাড়িতেই থাকত বড়বোন, এক স্কুলের শিক্ষিকা, বছর বছর জন্ম দিত সন্তানের আর পালতে হোত আমাকেই । বড়ভাই রাজশাহীতে উচ্চশিক্ষায় রত । খুব ছোটবেলায় অভাগা আমি হারাই প্রানপ্রিয় বাবাকে, যার কিছু স্মৃতি আজও কাঁদায় আমাকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন জানি কান্না বেরিয়ে যেত তাঁর মৃত্যুরও অনেক বছর পর পর্যন্ত ।

গ্রামের মতো শহর অথবা শহরের মতো গ্রাম, যেটাই বলি না কেন, স্বপ্ন কিন্তু দেখতাম অনেক উঁচু আমি । আমি স্বপ্ন দেখতাম একজন ভাল মানুষের সাথে নাটকীয়ভাবে আমার সম্পর্ক হবে ।

ছেলেটা আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু হাসান । ছুটিতে ভাইয়া যখন বাড়ী আসতো, অনেক গল্প করতো তার । একটু না-কি পাগলাটে ধরনের । একদিনের গল্প এরকম – ইলিশ মাছ রান্না করেছিল দুপুরে হাসান । রান্নাতো নয়, বেশী করে পানি দিয়ে ঝোল করা পানসে রান্না । কিছুটা রেখে দিয়েছিল রাতে খাবে বলে । কি একটা উপলক্ষে যেন ওরা সেদিন বিকেলে শহরে যায়, ভাইয়াও গিয়েছিল । এসে ভাইয়া হাসানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ঝোলের কিছুটা খেয়ে ফেলে । হাসান সেটা জানতে পেরে ছুরি নিয়ে তেড়েছিল ভাইয়াকে ।

মাস্তান না-কি হতে চেয়েছিল হাসান কলেজে । তাই ইচ্ছে দিয়েই কাউকে কাউকে মেরে বসত ও, আবার কাউকে মিছেই মারার ভান করত, মারার জন্য চিৎকার করত, ফাল পাড়তো। এভাবেই কলেজে মাস্তান হিসেবে একটা ভাবমূর্তি তৈরী হয়ে উঠেছিল তার । আবার ডাইনিংয়ে যেদিন খাসীর মাংসের ব্যবস্থা থাকত, সেদিন হাসানের জন্য চর্বির বাটি রাখতে হোত অর্থাৎ ওটা না রাখার মতো বুকের পাটা সংশ্লিষ্টদের থাকতোনা।

কলেজে ভাইয়া জাসদ ছাত্রলীগ করত আর হাসান বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী । চতুর্থ বর্ষে এসে ভাইয়া নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠে । আর হাসান কলেজে ছাত্রমৈত্রীর সুচনা করে বলে সে আহ্বায়ক। রাজশাহীতে তখন বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর প্রভাব বেশী থাকায় এই কলেজে ছাত্রলীগ-জাসদ ছাত্রলীগ বনাম বিএনপির ছাত্রদলের মধ্যকার বিবাদ কখনও সংঘটিত হলে অথবা বিবাদের উপক্রম হলে হাসানের কাছে রিকোয়েস্ট আসত শহর থেকে মৈত্রীর ছেলেদের এনে প্রতিপক্ষকে একটু শায়েস্তা করার অথবা ভয়-ভীতি দেখানোর । শহরের নেতারাও জানতে চাইত, এরকম করলে তাদের রাজনীতির প্রসার কিছুটা হলেও হবে কি-না ? হোক না হোক, হাঁ-সূচক জবাব দিত হাসান ।

গল্প শুনতে শুনতেই কখন যেন ভালবেসে ফেলি আমি হাসানকে প্রচন্ডভাবেই । ভাইয়ার কাছে গল্পগুলি শুনে ওকে নায়কই মনে হতো আমার । একটা সময় মনে হতো, হাসান আর আমার জগত ছাড়া অন্য আর কোন জগত থাকতে পারে নাকি ! পরম করুনাময় খোলা তা'লার নিকট প্রার্থনা করতাম ওকে যেন পাই । মুচকি হেসেছিলেন বোধহয় তিনি তখন ।

ভাইয়ার পাশ করার পর তার চাকরীর সুবাদে ঢাকায় চলে আসি আমরা । হাসান চলে যায় এক উপজেলায় চাকরী নিয়ে। ঢাকাতেই কাংখিত দেখা হয় আমাদের যখন একদিন সে

আসে তার চাকরীগত কোন একটা কাজে ঢাকায় । না, আমাকে ভালবাসার কোন চিহ্নই নেই তার চলনে-বলনে । ছোটবোনের মতোই কথাবার্তা । হতাশ হয়ে পড়লাম আমি । মনে হলো দেখা না হলেই ভাল হতো ।

একতরফা প্রেম কতদিনই বা থাকে আর ! আমারও কেটে যেতে সময় লাগলনা । ইতিমধ্যে হাতছানি না এড়াতে পেরে একজনের সাথে জড়িয়ে পড়ি । সজিব নামের ছেলেটাকে দেখে সজিবই লাগত, মনে হতো অনেক পোড়খাওয়া ছেলে ও, দুনিয়াদারি সম্পর্কে অনেক জ্ঞান-গরিমা রাখে ছেলেটা । কলেজে যাওয়ার পথে প্রতিদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত ওকে । বুঝে গিয়েছিলাম তা শুধুমাত্র আমারই জন্য । আমিও দেখতাম তাকিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে । সম্পর্ক হওয়ার পর কেন জানি ছেলেটা আমাকে ওর সাথে পালিয়ে যেতে বলত । কিছু বুঝতে পারতামনা পারিবারিকভাবে কেন ও এগোতে চায়না । আমারও নাটকীয়ভাবে বিয়ে করার সাধ, কেমন করে যেন বুঝে গেছিল ও সেটা । সম্পর্ক শুরুর মাত্র ছয়মাসের মধ্যে কাউকে কিছু না বলে একদিন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাই সজিবের হাত ধরে আমি ।

হাসানের সাথে আবার আমার দেখা দীর্ঘ একুশ বছর পর । ভাইয়াও আমেরিকায় দীর্ঘদিন, কাজেই হাসান চ্যাপ্টার আমার কাছে ক্লোজই হয়ে গেছিল । এলোমেলোভাবে হাটছিলো হাসান রাস্তা দিয়ে সেদিন । দেখতে পেয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছি সোজা বাসায় ।

আগের ভঙ্গিটার রেশ তখনও আছে ওর মধ্যে, প্রশ্ন করে সংসার কেমন চলছে তোমার ?

আমি তো সংসার করিনা । আর এসব শুনে আপনি কী করবেন হাসান ভাই ।

কোন প্রশ্ন না করে কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে হাসান ।

তাকানোর ভঙ্গিতে রাগ হলো আমার । কিন্তু উত্তর দিতে হবে, তাই দেরী না করে বলি, সজিবের হাত ধরে ঘর ছাড়ার পর দেখি ওর কিছুই নেই, মানে ভগ্ন সংসার ওদের । বাবা তার মাকে ত্যাগ করে, মা-ও আরেকটা বিয়ে করে, সজিবেরও শিক্ষার দৌড় মাত্র ইন্টার । ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ার কাছ থেকে যৌতুক এনে দেয়ার জন্য চাপ দিত, মারধর করত । অবশেষে একদিন আধাচেতন অবস্থায় নিজেকে আমি নিষিদ্ধ পল্লীতে আবিষ্কার করি আর দীর্ঘ দশটা বছর সেখানেই কাটাতে বাধ্য হই ।

অবাক করা এক আবেশের মধ্য দিয়ে শুনে যায় কথাগুলো হাসান । বলে, আর এখন ?

আমার বড়বোন শুধু জানত আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা । একদিন মাস্তান নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, হাতে ধরিয়ে দেয় ভাইয়ার দেওয়া এক কোটি টাকা । আরপর তো দেখতেই পাচ্ছেন এই পূনবার্সন কেন্দ্র খুলে বসেছি, এখানে আমার সাবেক সহযাত্রীদের পূনর্বাসন করি আমি সাধ্যমতো ।

কথায় কথা এগিয়ে চলে । হাসানের বউ সরকারী বড় কর্মকর্তা, বছর দুই ওদের মুখ দেখাদেখি, কথাবার্তা সব বন্ধ । ওর দেমাকমতো চলতে বাধ্য করত ও হাসানকে । না চলাতে এই অবস্থা ওদের ।

চলমান সংলাপেই বুঝতে পারি হাসানও প্রচন্ডভাবে ভালবাসত আমাকে । আমাকে বলতে ওর সঙ্কোচ হতো, তবে বলতো । কিন্তু সেই সময়ের আগেই আমি অধৈর্য হয়ে ঘটনা ঘটিয়ে ফেলি, যে ঘটনায় একা কেউ নই, আমরা দু'জনই আজ অন্যমানুষ, দু'জনই আজ ছিটকে পড়েছি আমরা জীবনের মূল স্রোতধারা থেকে ।

রাত গভীর হয়, আমাদের কথা ফুরায়না । একসময় প্রস্তাব আসে এক হয়ে যাওয়ার আমাদের । সরাসরিই না করে দেই। হাসান ভাইয়ের উপর আমার প্রচন্ড অভিমান রয়েছিল যে তখনও আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাওয়ার জন্য ।

আমার প্রানের হাসান ভাই গত হয়েছেন চার বছর হয় । আজকের মতো প্রতিবছর তার মৃত্যুদিবসে এবং হাঁপিয়ে ওঠার দিনগুলিতেও ঢাকা থেকে আমি চলে আসি এই শহরে, বসে থাকি সারাদিন তার কবরের সামনে । আশপাশেই নাস্তা করি, ভাতটাত খাই, আবার আসি আর চেয়ে থাকি হাসান ভাইয়ের কবরের দিকে । মনে হয় হাসান ভাইয়ের অনেক কাছে আছি আমি । একরাশ প্রশান্তি নিয়ে রাতের বাসে ফিরি আবার ঢাকায় ।

যতদিন বেঁচে আছি, এটাই যে আমার সবচেয়ে জরুরী কাজ ততদিন ।

কবিতা

প্রিয়জন

কে এইচ মাহবুব

তুমি কি এসেছিলে প্রিয়া দুপুরের বেলা,
দেখে ছিলাম তোমায় আমি তোমার আসার খেলা ।
অনেক দিন পরে তোমায় দেখেছিলাম যখন,
দূর থেকে ঠিক চিনতে পারছিলামনা তখন ।

এই তুমি প্রথম তুমি পড়িতে
এখন বাজে কতো দেখতে হয় ঘড়িতে ।
আর ত এ পথে কখন ও হয়নি দেখা,
এ পথে তো প্রতিদিন আমিও যাই একা ।

ভাবিনি কভু তোমার আমার দেখা হবে ।
স্রষ্টার সৃষ্টি পৃথিবী নামক ভবে ।
সৃষ্টি কর্তার একি আজব খেলা,
তোমার সাথে হল দেখা দুপুরের বেলা ।

তোমায় না দেখে ভুলেছিলাম বেদনা সব!
স্রষ্টার নামে তোমায় ভুলে করে যাই রব ।

কবিতা

আয় আয় আয়

তৌহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া

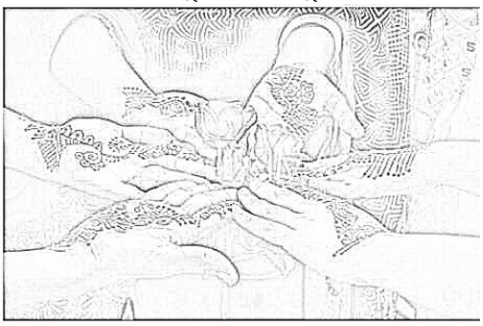

আয় সুরেলা পাখির দল
কোলাহলের ঘুম ভাঙ্গাতে,
আয় রঙ্গিন প্রজাপতির দল
ফুলের বনের লাজ সরাতে।

আয় ফড়িংয়ের ইচ্ছে বল
নিত্য খেলার শব জাগাতে,

আয় চাতকের চাহনি বল
বৃষ্টি ধারার রাগ ভাঙ্গাতে।

আয় ভালোবাসা-বাসির ছল
মনের রঙের ভুল ভরাতে।
আয় সজনী প্রাণের বল
জীবন শাখায় সুখ জাগাতে।

ভৌতিক গল্প

ভৌতিক উপাখ্যান

তাপসকিরণ রায় *বর্তমানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে নিয়মিত লিখছি। কোলকাতা থেকে আমার প্রকাশিত বইগুলির নামঃ (১) চৈত্রের নগ্নতায় বাঁশির আলাপ (কাব্যগ্রন্থ) (২) তবু বগলে তোমার বুনো ঘ্রাণ (কাব্যগ্রন্থ) (৩) গোপাল ও অন্য গোপালেরা (শিশু ও কিশোর গল্প সঙ্কলন) (৪) রাতের ভূত ও ভূতুড়ে গল্প (ভৌতিক গল্প সঙ্কলন) (৫) গুলাবী তার নাম (গল্প সঙ্কলন)*

ভবতোষ ও ঊর্মিলা স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রী দুজনের সংসার। বিয়ের এক বছর যেতে না যেতে ঊর্মিলার ক্যান্সার ধরা পড়ল। ফুড পাইপে ক্যান্সার ছিল। এত কম বয়সে সাধারণত এ ধরনের ক্যান্সার হয় না। তবু হয়েছে এ কথাটাই সত্য।
কিছু দিন থেকে ঊর্মিলার খাবার খেতে অসুবিধা হচ্ছিল। এমন কি জল গিলতেও বেশ বাধ বাধ ঠেকত–বুকে সব সময় চাপ চাপ অনুভব করত।
শেষে রোগ ধরা পড়ল–প্রায় লাস্ট স্টেজে। কিছু দিন খাদ্য পানীয় আলাদা পাইপ লাগিয়ে গলার নলীর ভেতর দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এর মাস তিন পরে অপারেশনের সময় মৃত্যু হল ঊর্মিলার।
ঊর্মিলা খুব ভালবাসত ভবতোষকে। এক মধুময় রাতে ঊর্মিলা ভবতোষ যখন বড় কাছাকাছি ছিল, ভবতোষের কোলে শুয়ে দাম্পত্য জীবনের সুখে আপ্লুত হতে হতে বলে ছিল, তুমি আমায় ভালবাস তো ভব?
–খুব, খুব, খুব ভবতোষ আহ্লাদিত হয়ে বলেছিল। আর ঊর্মিলা ভবতোষের ঠোঁটে বারবার চুম্বন এঁকে দিতে দিতে বলে ছিল, আমি তোমায় ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি–আমি তোমায় জন্ম জন্মান্তরের জন্যে ভালবাসি গো!
এ ঘটনার পর একটা বছরও পার হতে পারল না–ঊর্মিলার অতৃপ্ত জীবন সাঙ্গ হল–যেন বান ডাকা সুখের মাঝখানেই তার মৃত্যু ঘটল।
ঊর্মিলার মৃত্যুর পর বড় অসহায় হয়ে পড়ে ছিল ভবতোষ। কিছু তার ভাল লাগছিল না–অফিসেরও ছুটি চলছিল তার। সময় কাটতে চাইছিল না। নিঃসঙ্গ বিরহ জীবন চলছিল। দিন ভর মন মরা হয়ে স্তব্ধতার ভিতর একলাটি ঘরে বসে থাকত ভবতোষ।
স্ত্রীর মৃত্যুর রাত ছিল তার কাছে ভীষণ ভয়াবহ ! একলাটি স্ত্রীর মড় দেহ পাহারা দেওয়া—সে যে কি অসহায়তা তা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। পর দিন দাদা, বৌদি এসে ছিলেন। আর অফিস থেকে ক'জন স্টাফ এসে ছিল।
এখন খালি তিন তলার ভবর ফ্ল্যাট নিশ্চুপ নিঃসাড় পড়ে আছে। স্ত্রীর মারা যাবার পর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। দাদা বৌদিরা আজই নিজেরদের ঘরে বেরিয়ে গেলেন। ভবতোষ ঘরে আজ সম্পূর্ণ একলা।
তখন অনেক রাত, ঘুম আসছিল না ভবতোষের। নিঃসঙ্গ অসহায় জীবনের স্মৃতি কথা ভেবে ভেবে সবে মাত্র তার চোখটা লেগে এসেছিল, হঠাৎ খুট করে একটা আওয়াজে তন্দ্রা ছুটে গেল তার। অন্ধকার ঘর। ভব রাতে ব্যালকনির দিকের জানলার ছিটকিনি এঁটে দিয়ে ছিল। ঘরের পাখা মিডিয়াম স্পীডে ঘুরছিল।

কিসের শব্দ হল–একেবারে হালকা শব্দ ছিল না। ঘুম ভেঙে যাবার মত শব্দ–পাখার শব্দকে ছাপিয়ে যাওয়া শব্দ। জানালার দিকে চোখ পড়ল ভবর। আরে জানলা তো বন্ধ ছিল, খুলে গেল কি করে ! জানলার বাইরের আকাশে তখন ফালি কাটা চাঁদ উঁকি মারছিল। তেজহীন মরা জ্যোৎস্নার আলোর বিষণ্ণ ছায়া ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে ছিল। জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেই দু চোখের পাতা বুজেছে ওর অমনি আবার আওয়াজ হল। মনে হল জানলার পাট কেউ কিছু দিয়ে ঠুকছে। চমকাল ভবতোষ। জানলার বাইরে কিছুর ছায়া পড়েছে মনে হচ্ছে না? সে ছায়া ঈষৎ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এ ছায়া নিশ্চয় কোন মানুষের হবে–চোর, এ তিনতলায় ব্যালকনিতে কি তা হলে চোর উঠে এসেছে ! অসম্ভব কিছু না।
ভব, কে ? বলে চীৎকার করল–ভাবটা তার এমন ছিল যে চোর হলে মানে মানে কেটে পরো বাবা, সামনা সামনির মোকাবিলার আমার হিম্মত নেই।
ছায়া সরে গেল–জানলা তেমনি খোলা। ভবর সাহস হল না উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করার। পাঁচ মিনিটও পার হল না, আবার সেই ছায়া–এবার জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে ! ভব স্পষ্ট চোখ নিয়ে তাকাল–একটা মেয়ের ছায়া না ! আলুথালু চুল তার মাথার দুপাশ ছড়িয়ে ঝুলছে !

–কে,কে ওখানে? নিজের ভয় ভাঙ্গার জন্যে ভবতোষ জোরেই চীৎকার করে উঠে ছিল।
–আমি, মিষ্টি মেয়েলি চাপা কন্ঠ–বাতাসে ভেসে আসার মত।
–আমি, শব্দে ভব ভীষণ চমকে উঠলো। পরিচিত কন্ঠ–তবে কি উর্মির কন্ঠ ! উর্মির প্রেতাত্মা !
–কে, কে কথা বলছে? ভয় নিয়ে আবারও প্রশ্ন করে উঠলো ভব। কালো ছায়া ক্রমশ তার রূপ পালটাচ্ছিল। ভব স্পষ্ট দেখতে পেল–ছায়া কেমন ঘূর্ণির মত ঘুরছিল—আর অতি ধীরে ধীরে ঠিক যেন মানুষের মুখের আকৃতি নিচ্ছিল!
ভয় ও বিস্ময়ে ভব দেখতে থাকলো–একটা হালকা আলোর আবরণে এক নারীর মুখমূর্তি তৈরি হতে লাগলো। তত স্পষ্ট নয়–গোধূলির ম্লান আলোর মত–যেমন আগুন আলো হয়–হালকা দীপ শিখার মত ক্রমে ক্রমে তাতে উর্মির মুখ ভেসে উঠতে লাগলো!
–উর্মি ! হতভম্ব ভবর গলা চিরে বেরিয়ে এলো।
হাসছে উর্মি—জানলার শিকের বাইরে অবিকল সেই রূপ, সেই উর্মির মুখমণ্ডল–যেমত ছিল জীবিত উর্মির হাসি উজ্জল মুখটা !
–কি–ভয় পাচ্ছ? উর্মির গলা। ধীরে হলেও সে আওয়াজ ঘরের মধ্যে গমগম প্রতিধ্বনিত এক মিষ্টি আওয়াজ হয়ে ভাসছিল।
–তুমি ! ভীত সন্ত্রস্ত ভব বলে উঠল।
একান্ত আপন ভাব নিয়ে উর্মি বলে উঠলো–হ্যাঁ, তোমার একাকিত্ব আর দেখতে পারছি না গো !
ভবর ভয় আস্তে আস্তে কি কমে যেতে লাগলো ? ওর ভেতরে কেমন আবেশ আবেশ ভাব জড়িয়ে যেতে থাকলো। ওর শরীরের অনুভূতি অনেক কম হয়ে যাচ্ছিল। মনে হল কোন তন্দ্রায়িত দেশে সে পাড়ি জমাচ্ছে। নাকি এর পুরোটাই স্বপ্ন–ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভব স্বপ্ন দেখছে না তো ! ও চেষ্টা করল নিজেকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে নিতে কিন্তু না কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না।
এবার ভব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, ব্যালকনির দরজা না খুলেই উর্মির দেহ ক্রমশ ঘরের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার উর্মিকে পরিপূর্ণ দেহের উর্মি মনে হচ্ছে–এক আস্ত উর্মি ? নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ভবতোষ তার প্রিয়তমার দিকে। উর্মির মৃদু হাসি হাসি মুখ।
এক পা, এক পা এগিয়ে আসছে উর্মি। আর মাত্র দু হাত দুরে ও দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটা হাসে সমস্ত শরীর দুলিয়ে ঠিক তেমন করে এবার উর্মি হেসে উঠলো–খিলখিল করে হেসে উঠলো। ভব নির্বাক দেখে যাচ্ছে। মুখ খুলে কিছু বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।
–আমি আছি...জেনো তুমি...যেমনটা ছিলাম আগে...আবার গা নাচিয়ে খিল খিল হেসে উঠলো উর্মি।
ভব এবার নড়ে উঠলো–কলের পুতুলের মত। মনের গহনে তার ইচ্ছের উদয় হতে লাগলো। ভালবাসার ইচ্ছে–প্রেমিক প্রেমিকার ছুঁয়ে থাকার ইচ্ছে।
–আমায় শুতে দাও ভব ! ধীরে ধীরে উর্মি ঠিক তেমনি ভাবে এসে শয্যায় শুয়ে পড়ল–যেমনটি রোজ সে ভবর পাশটাতে শুত।
–আস না ভব...কাছে আসো...
ভবর মনে সব কিছু গুলিয়ে আছে–ও হাত বাড়িয়ে দিল। উর্মিকে স্পর্শ করতে–আর উর্মিকে স্পর্শ করা মাত্র ভব চমকে উঠলো। বরফ ঠাণ্ডা এক ছোঁয়ায় ও যেন নিজেকে দেখতে পেল, কে ! কে তুমি ? বলে ভব গলা ফাটা চীৎকার করে উঠলো।
পর মুহূর্তে নেই, কিচ্ছু নেই–সমস্ত কিছু যেন ভেনিস হয়ে গেছে! উর্মি নেই, আগুন আলো নেই, প্রদীপ শিখা নেই, এমন কি জানলাটাও খোলা নেই !
কেবল স্তব্ধ ঘর পড়ে আছে। মাথার ওপর পাখার ঘূর্ণায়মান শব্দ ভবর কানে ফিরে এলো।
পরদিন হঠাৎ গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসলো ভবতোষ। জানলার কাঁচ ফুঁড়ে ঝলমল রোদ এসে বিছানায় পড়েছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। ওরে বাবা, বেলা দশটা বেজে গেছে ! এবার পেট চোঁ চা করতে লাগলো–খুব খিদে পেয়েছে তার।
মনে পড়ল ভবর, গত কাল রাতে সে কি শুধু স্বপ্নই দেখেছিল? কিন্তু এত স্পষ্ট কি স্বপ্ন হতে পারে ?
না, হতে পারে না । এ যে স্বপ্ন নয়–প্রতি রাতের বাস্তবতা।
–তোমায় খুব ভালবাসি, উর্মি ! ভবতোষ উর্মিকে জড়িয়ে আছে। আর উর্মি খিল খিল করে হেসে চলেছে। না, সেই বরফ ঠাণ্ডা ভাব ভব আর অনুভব করতে পারে না।
–আমি তোমাকে জন্মজন্মান্তর এ ভাবেই পেতে চাই, ভব, তোমার সঙ্গে মিশে যেতে চাই !
পরম সোহাগে ভব ও উর্মি একে অন্যকে নিবিড় জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।
নিশুতি রাত পেরিয়ে যাচ্ছে—ঊষার পূর্ব মুহূর্তের আবছায়া অন্ধকার ঘিরে ধরেছে পৃথিবীকে। ঘন আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।
ভবতোষ দেখল, নেই, বিছানায় উর্মি নেই।
এমনি ভাবেই তাদের প্রতিদিনের জীবন এগিয়ে চলছিল।

কবিতা

ঘাসফুলের ইচ্ছেমৃত্যু

সোহেল আহমেদ পরান

নীলটিপ ঘাসফুলটি গড়েছিলো
বসত জানালার ধার ঘেঁষে। নীলা
হোতে পারতো নাম তার স্বার্থকতায়।
আঙ্গুলের ডগা চুমে প্রিয় বসতি ছেড়ে
পাখি-স্বভাব ঘাসফুলটি জড়ায়
সান্নিধ্য আমার। অবলীলায় আলিঙ্গনে
হাঁটি আমি রেললাইনের সমান্তরালে।

করি খেলাচ্ছলে এ পাটি ও পাটি
আচমকা দানবীয় ট্রেন.....
পাখি-ঘাসফুল; নীল-টিপ ঘাসফুল
অগ্রাহ্য করে আলিঙ্গন আমার
পড়ে ঝাঁপিয়ে.....আহা!!!
আহা ঘাসফুল!! আহা স্পর্শ তোমার!!

কবিতা

অঙ্কুরে বিনাশ

প্রহেলিকা

সমুদ্রে মিশে যাওয়া এক ফোঁটা শিশিরের খোঁজে-
দুলছে ক্লান্ত দেহ, সূর্যরাগে কুঁচকানো কপালে
যতি চিহ্নের শেষে দাঁড়িয়ে থাকা, অনুক্ত শব্দেরা
ঘুরছে চক্রাকারে। দ্রোহী পায়রার দল মেতেছে-
গুঞ্জনে বন্ধ্যা মেঘদের সাথে। শুন্যবাদে বিশ্বাসী
রুমালে অঙ্কিত স্থিত হাসিতে ধ্বংসের আমন্ত্রণ।

উন্মাদ বাতাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, তুলে আনা-
তৃষ্ণার জলটুকু গড়িয়ে পরে আঙ্গুলের ফাঁকে।
প্রমূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, খেরোখাতার
পৃষ্ঠায় লুকায়িত দুর্নিরীক্ষ্য স্বপ্নের সানুদেশে।
কে যেন এসে স্পর্শ করে যায় নিষিদ্ধ অন্ধকারে,
বাতাসের আড়ালে ঢেকে তার নিঃশ্বাসের নিনাদ।

সন্তর্পণে গড়ে তোলা উদ্যানে মাকড়সা বুনছে
নশ্বর জাল। অঙ্কুরে বিনাশ জুয়াড়ির স্বপন।

গল্প

ভিক্ষুক

আমির হোসেন ✉ *১৯৯৭ সালে নবম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত থাকালীন সময় থেকে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। সেই থেকে আজ অবধি অবিরাম লিখেই যাচ্ছি। কখনো থেমে থেমে আবার কখনো একনাগারে। লেখতে লেখতে নাকি লেখক হওয়া যায়। তাই অবিরত লিখতে আছি। জানিনা কতদুর যেতে পারব। আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ২০০০ সনের জুন মাসে 'মাসিক চিকিৎসা সাময়িকীতে'। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকা (আরশীতে মুখ, আজকের চেতনা, অতিক্রম, সাতদিনের কন্ঠ), সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন (পূর্ণিমা, উপহার) মাসিক ম্যাগাজিন (চিকিৎসা সাময়িকী, কাবার পথে, আদর্শ নারী), বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কম্পিউটার ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা (সায়েন্স ওয়ার্ল্ড), সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক মাসিক পত্রিকা (কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট নিউজ, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড), দৈনিক পত্রিকা (ইনকিলাব), কিশোর পত্রিকা (কিশোর কন্ঠ), অনলাইন পত্রিকা (বেঙ্গলিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম, কক্সবাজার নিউজ.কম, নিউজ ইভেন্ট২৪.কম), ব্লগ সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে লেখালেখি করে আসছি। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক (২০০৭) ও স্নাতকোত্তর (২০০৮) পাশ করি। বর্তমানে আমার পেশা ব্যবসা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একজন সফল লেখক হওয়া। আমি চাই আমার প্রতিটা লেখা আমার পাঠক/পাঠিকারা পড়ুক এবং গঠনমূলক সমালোচনা করুক। আমার প্রকাশিত বই সমূহঃ (১) এ জীবন শুধু তোমার জন্য (উপন্যাস) ২০০৩ইং; (২) প্রাণের প্রিয়তমা (উপন্যাস) ২০০৬ ইং; (৩) খাদিজা কি ছিলো গো ভুল (উপন্যাস) ২০১১ইং;।*

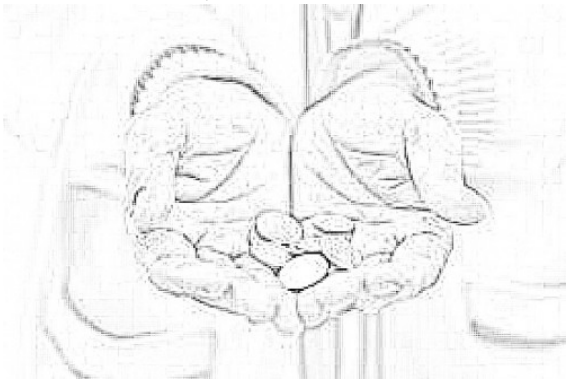

সবুজ গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা। বাংলাদেশের অন্যতম নদীগুলোর মধ্যে মেঘনা একটি বৃহৎ নদী। এই গ্রামেই বসবাস করে সুসানের দাদা। এখানেই তার বাবার জন্ম। সুসান তার বাবার সাথে ঢাকায় বসবাস করে। সে মাঝে মাঝে বাবা-মায়ের সাথে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসে।

গত দুইদিন হয় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে সুসান গ্রামে এসেছে। এখন সুসানের বয়স ১১ বছর। এ বছর পঞ্চম শ্রেণী পড়ছে। ছাত্র হিসেবে সুসান খুবই ভাল। ক্লাশ রোল নং-১। প্রতি ক্লাশেই তার রোল ১ ছিল। কেউ তার সাথে প্রতিযোগিতা করে ঠিকে থাকতে পারেনি। প্রতিবারই সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথম স্থান দখল করে নেয়। সুসান গ্রামে এসে দেখে তার সমবয়সী অনেক ছেলে-মেয়ে এখনও স্কুলেও যায়নি। সুসানকে নিয়ে তার দাদা-দাদীর খুব গর্ববোধ করেন। পাড়ার সকলের সাথে নাতীর সুনাম বয়ে বেড়ায়।

একদিন সকাল বেলা সুসান লক্ষ করল এক ভিক্ষুক তাদের বাড়ীর গেইটে এসে ধাক্কাচ্ছে আর বলছে, আল্লাহ্‌ওয়াস্তে ভিক্ষা দিবেন। পরনে ময়লা ছেঁড়া পোশাক। পায়ে জুতা নেই। মুখভর্তি সাদাপাকা দাড়ি। ইয়া বড় গ্রোফ। মাথায় ঝটপাকানো এলোমেলো চুল। সাদা পাকা চুলের মিশ্রন। মনে হয় যেন চুল, দাড়ি গ্রোফের সাথে ব্লেডের কোন সর্ম্পক নেই। তার কাধে একটি ব্যাগ। সারাদিন ভিক্ষা করে যা পায় তা এই ব্যাগে রাখে।

ভিক্ষুকের ডাক শুনে সুসান গেইট খুলে ভিক্ষুকের সামনে আসল। সাথে সাথে তার দাদাও আসল। দাদা ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে বললেন, কি চায়?

ভিক্ষুকটি মলিন মুখে বললো, আল্লাহ্‌ওয়াস্তে ভিক্ষা চাই।

না না ভিক্ষা দেয়া যাবে না। মাফ করেন।

ক্যান ভিক্ষা দেয়া যাবে না? মাফ করব ক্যান? আমি যতবারই আসি ততবারই বলেন মাফ করেন। আপনি ভিক্ষা না দিলে খামু কি?

কেন কাজ করে খেতে পার না। হাত, পা, মুখ সবইতো ভাল দেখছি।

জানেতো কুলাই না সাব।

তুমি যে কাজ করতে পার সে কাজ কর।

সুসান এতক্ষণ দাদা ও ভিক্ষুকের কথা মনযোগ দিয়ে শুনছে। এবার সুসান ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে বললো, হ্যাঁ দাদা ঠিক বলেছে, ভিক্ষা করেন কেন? কাজ করে খান। নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা। ভিক্ষা করা ভাল না। অন্যের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

ভিক্ষুক বললো, কাজ কোথায় পাব? কে দিবে কাজ?

আমাদের বাড়ীতে থাকবে? দাদা দিবে কাজ।

দাদা ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ তুমি কি কাজ করতে চাও বল। আমি তোমাকে কাজ দেব। তবুও ভিক্ষা করো না।

ভিক্ষুক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, আপনি যা কাজ দিবেন তাই করব।

ঠিক আছে তোমার কাছ হচ্ছে আমাদের বাড়ী দেখাশুনা করা, বাজার সদায় করা।

কত টাকা দিবেন সাব।

তিন বেলা খাবার ফ্রি। মাসে ৫,০০০/- টাকা দিব। কি চলবে?

হ্যাঁ চলবে।

তোমার বাড়ীতে কে কে আছে?

এ কথা বলার সাথে সাথে ভিক্ষুকের চোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়তে লাগল।

কি হলো কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

ভিক্ষুক চোখের জল মুছে বললো, সাব আমার কেউ নেই। গত বছর লঞ্চ দুর্ঘটনায় ডুইবা আমার ছেলে-মেয়ে ও বউ সবাই মইরা গেছে। সে সময় আমিও ঐ লঞ্চে ছিলাম। কিন্তু আমি পারিনি তাদেরকে বাঁচাতে। সেই থেকে আমি কাজ কর্ম বাদ দিয়ে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছি।

ভিক্ষুকের দুঃখের কথা শুনে সুসানের দাদারও চোখে জল এসে গেল। তিনি চোখ মুছে বলনে, আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করেন। তুমি এখন থেকে আমার বাড়ীতে থাকবে। তোমার সব দায়-দায়িত্ব আমার।

ভিক্ষুক বললো, তয় সাব আপনি আমাকে কাম দিয়া বড়ই উপকার করছেন। এখন থেকে আর আমি ভিক্ষা করুম না।

দাদা পকেট থেকে ৫০০ টাকার একটি নোট বের করে বললেন, এই নাও। এই টাকা দিয়ে চুল, দাড়ি, গ্রোফ কেটে পরিষ্কার করবে এবং একটি ভাল শার্ট কিনবে। এখন যাও, কাল আসিও।

ভিক্ষুক টাকাটা নিয়ে চলে গেলেন।

সুসানের মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগের এক ভিক্ষুকের কথা। একদিন সকাল বেলা সুসান পড়ার টেবিলে পড়ছিল। তখন এক ভিক্ষুক তাদের ঢাকার বাসায় এসে কলিং বেল চাপল।

সুসানের মা রাত একটার আগে ঘুমাতে যায় না। প্রায় প্রতি রাতেই টিভি দেখে গভীর রাতে ঘুমাতে যায়। তাই সকাল বেলা তার উঠতে দেড়ী হয়। নয়টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না। আজ হঠাৎ এত সকালে ভিক্ষুকের কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে তার মন বিগরে গেল। ঘুম ঘুম চোখে এসে দরজা খুলল। সাজ সকালে ভিক্ষুককে দেখে তার রাগ চরমে উঠলো। কি চাই?

ভিক্ষুকটি ভয় পেয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে বললো, মাগো সারা রাত কিছু খায় নাই। তই এত সহালে আইছি। কিছু ভাত দেবে।

তুর ছাই ভিক্ষুক আসার সময় পাইলিনা। আমার কাচা ঘুমটা ভেঙ্গে এখন বলছিস ভাত খায় না। যা যা পরে আসিস। এই বলে দরজাটা লাগিয়ে দিল। সুসান তখন পড়ার টেবিলে বসে সব লক্ষ করল। তখন সুসান বললো, মা তুমি এত সকালে ভিক্ষুকটাকে বকাঝকা করলে কেন? ভিক্ষা দিলে কি হতো?

চুপ তুই কোন কথা বলবি না। বলেই আবার ঘুমাতে চলে গেল।

অথচ আজ তার দাদা এই ভিক্ষুকের সাথে কত ভদ্র ভাষায় কথা বললেন। আবার তাকে কাজ করার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

পরেদিন ভিক্ষুক লোকটি চুল, দাড়ি, গ্রোফ কেটে সুন্দর একটি শার্ট গায় দিয়ে আসলো। ভিক্ষুককে দেখে প্রথমে দাদা চিনতে পারে নি। পরে পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে পারলো। ভিক্ষুকটি দাদার পায়ে ধরে সালাম করে বললো, সাব এখন থেকে আমি আপনার বাড়িতে কাজ করুম।

দাদা বললেন, ঠিক আছে। দেখেছো একদিনে তোমার কি পরিবর্তন হয়েছে।

হ্যাঁ সাব সব আপনার দোয়ায়।

সেই থেকে ভিক্ষুকটি সুসানের দাদার বাড়ীতে নিয়মিত কাজ করতে লাগলো। আর কোন দিন ভিক্ষা করেনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ বাড়িতেই কাঠিয়েছে।

আজ সুসান অনেক বড় হয়েছে। তার দাদা-দাদী কেউ আজ বেঁচে নেই। নেই সেই ভিক্ষুকটি। যার সাথে সুসানের ছিল বন্ধুত্ব। যতবারই বাড়িতে যেত সেই ভিক্ষুকটির কাছ থেকে গল্প শুনতো। জীবনের গল্প। জীন-পরীর গল্প।

জীবনের গল্প

ফাগুনের অনুভূতি

আরজু মূন ৷ *নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বললে সবসময় বিব্রত বোধ করি। ঠিক কতটুকু বললে শোভন হবে তা বুঝতে পারিনা । আমার স্বভাব চরিত্র নিয়ে বলা যায়। আমি খুব আশাবাদী একজন মানুষ জীবন, সমাজ পরিবার সম্পর্কে। কখনো হাল ছেড়ে দেইনা। কোনো কাজ শুরু করলে শত বাধা বিঘ্ন আসলেও তা থেকে বিচ্যুত হইনা। ফলাফল পসিটিভ অথবা নেগেটিভ যাই হোক শেষ পর্যন্ত কোন কাজ এ টিকে থাকি। জীবন দর্শন" যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ " লিখালিখির মূল উদ্দেশ্যে অন্যকে ভাল জীবনের সন্ধান পেতে সাহায্য করা। মানুষ যেন ভাবে তার জীবন সম্পর্কে ,তার কতটুকু করনীয় , সমাজ পরিবারে তার দায়বদ্ধতা নিয়ে। মানুষের মনে তৈরী করতে চাই সচেতনার বোধ ,মূল্যবোধ আধ্যাতিকতার বোধ। লিখালিখি দিয়ে সমাজে বিপ্লব ঘটাতে চাই। আমি লিখি এ যেমন এখন আমার কাছে অবাস্তব ,আপনজনের কাছে ও তাই। দুবছর হলো লিখালিখি করছি। মূলত ভব ছেড়ে যখন ঘরে বসতে বাধ্য হলাম তখন সময় কাটানোর উপকরণ হিসাবে লিখালিখি শুরু। তবে আজ লিখালিখি মনের প্রানের আত্মার খোরাকের মত হয়ে গিয়েছে। নিজে ভালবাসি যেমন লিখতে তেমনি অন্যের লিখা পড়ি সমান ভালবাসায়।*

ও আমার বাংলা মা তোর
আকুল করা রূপের সুধায়
হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে
যায় জুড়িয়ে।
ও আমার বাংলা মাগো।

গান গাইতে গাইতে সেজুতির চোখ চলে যায় সামনের সারিতে বসা একজন বিদেশী র দিকে। এই সাদা ভদ্রলোক কে প্রথম সারিতে তার গানের সময় বসে থাকতে দেখছে দিন ধরে। স্ট্রেঞ্জ!!!!.গান শেষ করার পর স্টেজ এ ব্যাক সাইড এ এসে আর ভদ্রলোক কে আর পেলনা।

গান শেষ করে গাড়িতে উঠতে যাবে তার পাশে একটা গাড়ি থেকে কেও কিছু একটা বলে উঠলো তার উদ্দেশ্যে। তাকাতে দেখে সেই সাদা ভদ্রলোক।

হাই ক্যান আই টক্ এ মিনিট ?

কাছে আসতে লোকটি হেসে বলল সালাম।

সেজুতি চমকে উঠলো।

বাঙালি হেসে জিজ্ঞাসা করলো।

ভদ্রলোক হেসে বলল শত ভাগ।

আমি তো অবাক একজন বিদেশী লোক বাংলা গান শুনতে আসছে ব্যাপার কি ?কলকল করে বলে উঠলো সেজুতি। আচমকা একজন বাঙালি এখানে প্রোগ্রাম এ পেয়ে সে উত্ফুল্ল হয়ে উঠলো।

সে আজকে এসেছে বস্টন এ একুশ এর এক দেশাত্ববোধক গানের প্রোগ্রাম এ। প্রতিবার একুশ এর সময় টা এখানকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আল্পনা ,শহীদ পত্রিকা আর ও নানান প্রোগ্রাম এর আয়োজন করে। সেই প্রোগ্রাম এ জযেন করতে আসা তার সুদুর নিউইযর্ক থেকে।

আপনার দেশাত্মবোধক গানে একটা অন্যরকম আবেদন খুঁজে পেলাম সেজুতি। ভদ্রলোক তার নাম ও জানেন দেখা যাচ্ছে। সে এখন ও এমন কোনো শিল্পী হয়ে উঠেনি। প্রীত হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া গেল।তার চেহারা হোয়াইট দের মত কেননা মা ব্রিটিশ।ছোটবেলায় ই মাবাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।সে বাবার সাথেই থাকে।নাম এনরিখ ব্ল্যাংক।

নাম আর চেহারা দেখে সবাই সাদা মনে করলে ও আমি মনে প্রানে ও ব্যক্তিত্বে বাঙালী।বলে সে হেসে।

আমাদের একটা একুশের প্রোগ্রাম করছি কালকে। যদি আপনার কাজ না থাকে আসবেন নাকি। ভদ্রলোক তাকে ইনভাইট করল।

কালকে তো আমার কাজ আছে।
দোনমনা অবশেষে বলল তার পর আমি দেখছি কি করা যায়। যদিও সেজুতির কাছে কাজ এর চেয়ে এসব একুশ এর প্রোগ্রাম বা যে কোনো সঙ্গীত প্রোগ্রাম এ যাওয়া সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দুজনের আরো কতক্ষণ কথা হলো। পরস্পরের টেলিফোন নাম্বার নিল।

সেজুতি এখানে এসেছে পি এইচ ডি করতে তার ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। পড়াশুনা প্রায় শেষ পথে। তার জন্য বাবা মা বাংলাদেশ এ পাত্র দেখে রেখেছে। পড়াশুনা শেষে দেশে যাওয়ার পর তার বিয়ে হওয়ার কথা।

ঘরে আসা মাত্র দেখে অনেক ফোন এসেছে। লং ডিসটেন্স কল। মেসেজ চেক করতে দেখে মায়ের মেসেজ। তাড়াতাড়ি ফোন ঘুরালো। বাসায় কেও নাই। বাবার সেল এ পাওয়া গেল।

জানা গেল ছোট চাচাকে কে হসপিটাল এ মুভ করা হয়েছে। তার এই চাচটি খুব ভালবাসা র মায়া র শ্রদ্বা র । ৫২ এর ভাষা আন্দোলন এ যিনি কারফিউ তে পঙ্গু হয়েছিলেন এবং পরে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি।

চিরকুমার অতি হৃদয়বান চাচাটি মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন একেবারে। সরে গিেছিলেন লোক চক্ষুর অন্তরালে ।সিথি আন্টির সাথে প্রেম ছিল প্রায় বিশবছর। সেই সিঁথি আন্টিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখান করার পর সবসময় মনমরা হয়ে থাকতেন। তাদের সাথে ও খুব একটা কথা বলতেননা। কোন আবেগ অনুযোগ করতেন না কখনও ।তার অনেক বন্ধু পরিচিত অনেকে এখন অনেক উচ্চ সরকারী কর্মকর্তা। অনেকে তাকে অফার করেছে তাদের তাদের সাথে থাকতে এবং পরামর্শ দিতে। শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারনে সবার প্রস্তাব ই প্রত্যাখান করেছিলেন তিনি।

আমাকে দয়া করে দেওয়া সাহায্য আমি নিতে পারবনা ভাই। বিষন্ন হয়ে এই জবাব দিয়েছিলেন।

তোমাকে দয়া করবে এত স্পর্ধা আমাদের কার ও নাই কাওসার। চাচার নাম কাওসার। বরং দেশের ঋণ আছে তোমার কাছে। তুমি ডিসার্ব কর অনেক কিছু এ দেশ থেকে।
বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে।

মাকে শত্রুর হাতে থেকে বাচতে পারলে তুমি খুশী হবে। এর জন্য কেও কি কখনও বিনিময় আশা করে। আমার মা বিপদে পড়লে আমি রক্ষা করতে যাবই নিজের প্রান বিসর্জন দিয়ে হলে ও তুমিও রক্ষা করতে যাবে। আমিও তাই করেছি মাসুদ এর কি বিনিময় দিবে আমাকে মাকে বাচানোর জন্য।

সেই চাচা বন্ধুর সাথে ও বিজনেসে ও জয়েন করেনি।

আমি অন্ধ পঙ্গু আমি কি কাজ করব বন্ধু। আমি যোগ্য হলে তুমি বলার আগে তোমার সাথে জয়েন করতাম। বিষন্নমাথা গলায় তিনি বললেন।

তার সেই চাচা আজ মৃত্যু শয্যায়। ডাক্তার সময় বেধে দিয়েছে।

সেঁযুতি চঞ্চলতা বোধ করে মনে। তার পি এইচ ডি শেষ টার্ম এর পরীক্ষা পরের মাসে।

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

পরের দিন চেষ্টা করে এয়ার লাইন্সে বুকিং দিল। একসপ্তাহের ছুটি নিল ভার্সিটি থেকে।

এয়ারপোর্টে সব ঝামেলা এনরিথ পোহাল। এনরিথ থাকাতে সে বেশ মানসিক সাপোর্ট পেল। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হসপিটালে চলে এল।

অনেকদিন পরে চাচাকে দেখল। কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

পরেরদিন বেলা দশটা। ডাক্তার এসে তাদের সবাইকে ডেকে নিল এমারজেন্সী রুমে। অক্সিজেন মাস্ক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চাচার মুখ থেকে ।

ওনার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আপনারা চাইলে কিছুক্ষন কথা বলতে পারেন। মন শক্ত করুন সবাই বললেন ডাক্তার সান্তনার স্বরে।

দরজা বন্ধ করে ডাক্তার বেরিয়ে গেল।

সেঁযুতির হাত পা কাপতে লাগল। অনেক কষ্টে কন্ঠস্বর পরিষ্কার করে ডাকল চাচা।

মারে তুই আমেরিকা থেকে পড়ালেখা ফেলে চলে আসলি নাকিরে ?কি কান্ড। উঠে বসার চেষ্টা করল।

বাবা এসে আকড়ে ধরলেন।

কিরে কাওসার সেঁযুতিকে কিছু বলবি?বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

না বলার কিছুই নাই। আমার সেঁযুতি বড় বুঝদার। সে নিজেই বুঝবে তার কি করণীয় ।

চাচা মারা গেলেন ঠিক এগারটায়।

সেঁযুতির হৃদপিন্ডের এক অংশ যেন খালি হয়ে গেল। চাচাকে নিয়ে অনেক স্মৃতি মনের কোণে ভীড় করতে লাগল।

পরের সপ্তাহে আমেরিকা র উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠে বসল।

কিন্তু এবারের আমেরিকা আসার উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছে। আগের মত সে জীবন কে দেখছেনা। এখন উদ্দেশ্য পাশ করে বাংলাদেশে চলে যাবে। নিজের দেশের জন্য কিছু করবে।
তার মেধা ব্যায় হওয়া উচিত নিজের দেশের জন্য। দেশ তাকে কি দিয়েছে কতটুকু দিয়েছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন দেশকে তার দেওয়ার আছে দিতে হবে। চাচার অব্যাক্ত বক্তব্য যেন সে টের পেয়েছে ।মনে হল চাচা নিশ্চয় মনে মনে তাই চেয়েছেন ।

যথাসময়ে পড়া শেষ হল। খুব ভালভাবে থিসিস সাবমিট করল। খুব ভাল একটা অফার পেয়ে গেল তার ভার্সিটি থেকে।
জীবনটা আবার তাকে দোটানায় ফেলে দিল।
পরিশিষ্ট:অবশেষে সেঁযুতি সবধরনের প্রলোভন উপেক্ষা করল উচ্চতর জীবনের হাতছানি ভাল জীবন স্ট্যাটাস মান সম্মান। চাচার স্মৃতিকে সম্মন করতে ফিরে এল দেশে। প্রথম বৎসর তার অনেকটা ষ্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গেল। পছন্দমত চাকরি পায়নি। তারপর মনোবল নষ্ট হয়নি তার। তার স্বপ্নকে সরে যেতে দিলনা মন থেকে ।তার স্বপ্ন এক ত্যাধুনিক পাওয়ার সেক্টর তৈয়ারীর। যা আমাদের সরকারী সেক্টরে বিদ্যুৎ এর অপ্রতুলতা দূর করে বিদ্যুৎ সেক্টরকে শক্তিশালী করবে যে ব্যাপারে সে কথা বলে এসেছে বোষ্টনের বড় দুই পাওয়ার হাউসের ইন্জিনিয়ারের সাথে। এই কাজ শুরু হয়ে গেলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ এ বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে থাকবে সে আশা করছে।

কবিতা

নষ্টসময়

সাঈদুল আরেফীন ᥝ *আশির দশকের মধ্যভাগ থেকেই সরকারি মহসিন কলেজে পড়াকালীন সময় সাঈদুল আরেফীন সাহিত্য চর্চায় নিবেদিত হন। সেই থেকে কবিতা ,গল্প,প্রবন্ধ,নিয়ে নিরন্তর কলম চালান তিনি। আশির দশকের শেষভাগে সংবাদপত্রে যোগ দেন। চট্টগ্রাম প্রতিবেদক হিসেবে সাপ্তাহিক চিত্রালী,সাপ্তাহিক স্বদেশ খবর,সন্দীপ সহ বিভিন্ন সময়ে অধুনালুপ্ত সমতা অপরূপ বাংলার প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। মূলত সংবাদপত্রে হাতে খড়ি হয় দৈনিক পূর্বতারাতে ক্ষুদে রিপোর্টার হিসেবে সরকারি মুসলিম হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে। বর্তমানে তিনি রাজনীতি,শিক্ষা,সাহিত্য, সংস্কৃতি,শিশু অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ কলাম এবং লিখে চলেছেন নিয়মিতভাবে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও লিটলম্যাগ গুলোতে। চট্টগ্রাম বেতারে নিয়মিত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণামূলক স্বরচিত প্রবন্ধ ও কথিকা পাঠ ছাড়াও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে থাকেন। সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। তারই ধারাবাহিকতায় দশ বছরের পরিক্রমায় অনুপম নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থেকে মানবসেবা শিক্ষা , সাহিত্য ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার একটি উজ্জ্বল সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আশির দশকেই। এখন যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নামক একটি বেসরকারি উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনারারী ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার হিসেবে কর্মরত থেকে প্রশিক্ষণ,উন্নয়ন নানা গবেষণাধর্মী কাজে জড়িত আছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে শিক্ষার প্রসারেও কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম নগরীর লামাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির বর্তমান সভাপতির দায়িত্বে আছেন। এছাড়া সাহিত্য ও সংস্কতি বিষয়ক পত্রিকা ঐতিহ্যের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি স্ত্রী ও ১ কন্যা সন্তানের জনক। "মনে পড়ে জলকদর" তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের জানান দিয়েছেন লেখালেখির মাঝখানে বিরতি দিলেও তিনি হারিয়ে যাননি। ইদানিং পত্র পত্রিকায় আবারো সক্রিয় হয়েছেন। এতে বেছে নেয়া তাঁর কবিতাগুলোর অধিকাংশই দৈনিক পূর্বকোণ,আজাদী ,মঞ্চ,সুপ্রভাত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন লিটল ম্যাগে প্রকাশিত কবিতার সংকলন। আমাদের কাব্যভুবনে তাঁর আগমনকে স্বাগত জানাই। তাঁর কবিতা আশাকরি পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে। অচিরেই তাঁর শিশুতোষ প্রবন্ধ ও উন্নয়ন গবেষণামূলক দুটি প্রবন্ধের বই বেরোবে।*

ভালোবাসাময় জীবন চেয়েছি বলেই কষ্টের উপমাগুলো
সাহস করেনি রুখে দিতে কখনো
চলমান প্রহর আমার। জীবন সাজানো বাগান হতে পারে,
আবার রঙ ও রূপের পেলবতায় গড়ে দিতে পারে সুখের জলতরঙ্গ
যে কোন মানুষেরই। সময়ের পথ ধরে চলতে শিখে মানুষ
কোথায় কিভাবে গড়তে হয় কালের ধারা, নিজেই অনুধাবন করে
সুখের জলছবি রাঙিয়ে যায় অচেনা কোন বন্দরে, ভীড় করে
সানন্দে মেতে থাকা সময়ের পরতে। হয়তো
হলুদাভ রঙের মেলায় ঘটাতে চেয়েছি
প্রকৃতির মেলবন্ধন। জীবনের অনভূতিগুলো এসে
আজো নাড়া দেয় অষ্টপ্রহর। সেই নষ্ট সময় কষ্টময় জীবন
ঘনিষ্ট ভালোবাসার পৃথিবী আমার খোঁজে ফেরে
এক আহত বাঘিনীর হতাশা জড়ানো ক্লান্ত দুপুর
জলপিপাসায় কাতর কষ্টের উপমা।

চলন্তিকা ব্লগের প্রকাশনী আসছে ২০১৫ এ ইনশাল্লাহ

পিশাচ কাহিনী

অদৃশ্য রোগী

তৌফিক মাসুদ *লেখার জগতে আমি একজন ছাত্র, লিখতে ভালবাসি। আমি আমার ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও লেখনী দিয়ে সবার মাঝে আমার দেশপ্রেম ও সবার প্রতি ভালবাসা বিলিয়ে দিতে চাই। আর চাই সকলের শুভ কামনা।*

শহরের অদূরেই বেশ পুরনো একটি ডিসপেনসারি। বাইরে থেকে এর নাম বা ডাক্তারের পরিচিতি কিছুই বোঝা যায়না। খুব কাছ থেকে শুধু ডিসপেনসারি শব্দটিকেই অস্পষ্ট বোঝা যায়। সবাই অবশ্য এটিকে ডাক্তারখানা বলে।

প্রায় তিন দশক ধরে এই স্থানেই স্বপন ডাক্তার এই এলাকার হাজারো মানুষের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় থেকে তিনি ডাক্তারি পাশ করেছেন কিংবা ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেছেন তা কারোই জানা নেই। শহরে পাশ করা ডাক্তারের অভাব নেই। তবুও সকলের একই কথা, "স্বপন ডাক্তারের হাত ভাল, রোগী ভাল হয় তাড়াতাড়ি"। এলাকায় তার নামে নানা অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য সব মুখরোচক ঘটনা প্রচলিত আছে। স্বপন ডাক্তারকে এই ব্যপারে কেউ জিজ্ঞেস করলে সে তা এড়িয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে সে কিছু নতুন কথা জুড়ে দেয়।

স্বপন ডাক্তারের বহু পুরনো রোগী আছে। সে তার পুরনো রোগীদের আলাদাভাবে দেখভাল করে। নতুন রোগীদের সে ডাক্তারখানায় বসে চিকিৎসা দিলেও পুরনোদের প্রয়োজনে রাত বিরাতে তাদের বাসায় যেয়ে উপস্থিত হয়।

পৌষ মাসের এক ঠাণ্ডা রাতে স্বপন ডাক্তারের সাথে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে গেল। সেদিন মাঝারী ধরনের বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। শীতকালে সাধারণত এমন দিন খুব কমই পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেড়ে স্বপন ডাক্তার সন্ধ্যে না নামতেই ডিসপেনসারি বন্ধ করে দিল। তাদের বুড়ো আর বুড়ির ছোট্ট সংসার। ছেলেপুলের মুখ তারা দেখেনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও এ জন্য বুড়িকে সে মাঝে মধ্যে বকা ঝকা করে। কিন্তু বুড়িকে ভুলে গিয়ে অন্য কারো সাথে সংসার পাতার ইচ্ছেও সে করেনি।

সেদিন ডিসপেনসারি বন্ধ করে ঘরে এসেই বুড়িকে চায়ের অর্ডার দিয়ে লেপের তলায় যেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল সে। শীতে তার হাত পা কাঁপছিল। পা দুটো গরম করতে হাত দিয়ে ডলতে থাকল। চায়ের আশায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও যখন চা নিয়ে কেউ আসলনা, তখন তার মেজাজ বিগরে গেল। দেরী করার জন্য বুড়িকে গাল মন্দ করতে থাকল। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ আর বুড়ি তার কথায় উত্তর দিচ্ছিলনা। এতে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। রাগের মাথায় ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই রান্না ঘরের দিকে হাঁটা দিল। সেখানে যেয়ে দেখল তার স্ত্রী সেখানে নেই। চুলোয় পানি গরম হচ্ছে ঠিকই। পাশেই তার চশমাটা রাখা। স্বপন ডাক্তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে লাগল। আশে পাশে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা। স্বপন ডাক্তার ভাবল তাঁকে না বলেই বাইরে কারো উপকার করতে চলে গেছে। তাই সে রাগে গজরাতে গজরাতে নিজের খাটের পাশে গিয়ে বসল। সাথে সাথেই বাইরে থেকে অদ্ভুত এক কণ্ঠে কেউ তাকে ডেকে উঠল। ডাক শুনে স্বপন ডাক্তারের সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। মাঝ রাতেও তাকে অনেকে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ এই সন্ধ্যে বেলাতেই এক ডাকে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। স্বপন ডাক্তার উত্তরে বলল, "বাইরে কে ডাকে রে?"

বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলল না। তারপর খুব রুগ্ন কণ্ঠে কারো ডাক শুনল। সে কান পেতে শুনল। কেউ তাকে বলছে, "ডাক্তারবাবু বাসায়? এখুনি একটু হাওলাদার বাড়ী চলেন না"।

হাওলাদার বাড়ির নাম শুনে স্বপন ডাক্তারের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। হাওলাদার মশায় অনেক দিন ধরেই অসুস্থ। তার কাছে রাত বিরাতে গেলে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তিনি হাজার টাকা হাতে গুজে না দিয়ে তাকে আসতে দেন না। সাথে ফ্রী গরম চা সিগারেটতো আছেই। হাওলাদার মশাই তার পুরনো রোগী। আবার বুড়ির উপর একটু রাগ হচ্ছে। এই সুযোগে বউকেও একটা উচিত শিক্ষা দেয়া যাবে। তাই সেও ধুলো পড়ে যাওয়া রেইন কোটটা গায়ে চাপিয়ে বুড়িকে না

বলেই হাওলাদার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। পেছনে দরজা খোলাই থাকল।

হাওলাদার বাড়ি তার বাড়ি থেকে খুব বেশী দুরের পথ না। আধা কিলোর কম হবে। রাস্তায় অন্ধকার। তাই বৃষ্টিতে টর্চ জ্বেলেও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। টর্চের চার্যও শেষের দিকে। কে জানত তাকে এমন দিনে বাইরে বেরুতে হবে। বেশ কিছুদূর যাবার পর তার মনে হল যে তাকে ডেকেছে সে লোকটিকে একবারের জন্যও সে দেখতে পায়নি। এতে খুব অবাক লাগল তার । কি এমন তাড়া ছিল যে লোকটি তাকে না বলেই চলে গেছে? স্বপন ডাক্তার একবার ভাবল ফিরে চলে যাবে। কিন্তু বুড়ির উপর জেদের কাছে পরাজিত হল। তারপর প্রায় বিশ মিনিট অনেক কষ্ট করে হেঁটে অবশেষে হাওলাদার বাড়িতে পৌছুলো।

হাওলাদার সাহেবের প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়িতে থাকবার জায়গার অভাব না থাকলে কি হবে, থাকার মানুষ নেই। তার স্ত্রী গত হয়েছেন দেড় বছর আগে। দুই ছেলেই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। মেয়েটিও পরিবার নিয়ে কানাডা থাকে। স্ত্রী মারা যাবার পর মেয়ের কাছে বেশ কয়েক মাস ছিলেন। মেয়েটিও তাকে দেশে রেখে আবার বিদেশ চলে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে, তার বাবাকে সেখানে দেখবার কেউ নেই। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরী করে। তার মা মারা যাবার পর সে নাকি বেশ পাগলামো করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেদেশের আইন কানুন অনেক কড়া। কোন অঘটন ঘটলে তাদের আর সেখানে থাকবার উপায় থাকবেনা। অনেকেই তার মেয়ের এই যুক্তিগুলো মেনে নিলেও এলাকার বেশিরভাগ মানুষই হাওলাদার সাহেবের ছেলে মেয়েদের প্রচুর সমালোচনা করে। হাওলাদার সাহেব আগা গোরাই খিট খিটে মেজাজের হওয়ায় কেউ তাকে পছন্দ করত না। লোকজন বাড়ির আশে পাশেও খুব একটা আসত না। দুই জন কাজের লোক দিন রাত তার দেখ ভাল করত।

বাড়িতে প্রবেশ করে স্বপন ডাক্তার কাজের লোক দুটির কাউকেই দেখতে পেলনা। বেশ পুরনো বাড়ি। হিন্দু সম্পত্তি কিনেছিলেন হাওলাদার সাহেব। বাড়ির এখানে ওখানেই মানুষের মূর্তি এখনো অক্ষত আছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। চারদিকে বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া কিছুই স্বপন ডাক্তার কানে যাচ্ছিলোনা। বেশ অস্বস্তি লাগছিল তার। এমন ছমছমে পরিবেশে সে কখনো এ বাড়িতে আসেনি। সে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বাড়ির আঙ্গিনা পেড়িয়ে বারান্দায় উঠতে যাবে ঠিক তখনই হঠাৎ করে বাইরে মৃদু বিজলী চমকাল। আঁতকে উঠে স্বপন ডাক্তার সামনে চেয়েই ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল ঠিক তার সামনে একটি প্রকাণ্ড মূর্তি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার বুকটা ধক করে উঠল। আসলেই সেটা কি বুঝে উঠবার আগেই আকাশের আলো গায়েব হয়ে গেছে। সে নিজের টর্চ জ্বালালো। সামনে যেতে যেতে মুর্তিটিকে পার হয়ে গেছে ততক্ষনে। কি মনে করে আবারো সেই মুর্তিটির দিকে টর্চের আবছা আলো ফেলল। কিন্তু সাথে সাথেই টর্চ নিভিয়ে ফেলল। আবারো সে যা দেখল তা আর দেখতে চায়না। এতক্ষণ যা তার কাছে শুধু অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখন সেটা বাস্তব মনে হল। কারণ মুর্তিটি তখনো তার দিকে তখনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে সামানে এগুতে যেয়ে বৃষ্টিভেজা বারান্দায় সে পিছলে পড়ে গেল। স্বপন ডাক্তারের তখন মনে হল, আজ বুঝি তার আর রক্ষা নাই। ভীত কন্ঠে সে কাজের লোকের নাম ধরে ডাকতে যাবে ঠিক তখনই একটা ঘরের ভেতর থেকে কাউকে ডাকতে শুনলেন, “ডাক্তার মশাই, বাইরে দাঁড়িয়ে কি করেন? ভেতরে আসেন”।

অনেকটা হাওলাদার সাহেবের গলার আওয়াজ শুনে সে অনেকটা স্বস্তি পেল। এ বাড়িতে এমন অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি। এসেই অন্যরকম অভ্যর্থনা পেত সে। কিন্তু সেদিন কাউকেই দেখছিল না। ভয় পাবার লোক সে নয়। কিন্তু আজ বেশ ভয় পাচ্ছে। যে ঘর থেকে হাওলাদার সাহেব ডেকেছিলেন, সে ঘরে প্রবেশ করে প্রবেশ করে দেখল, ঘরে কেউই নেই। জানালা খোলা, সেখান দিয়ে অনবরত বৃষ্টির ছাট ঘরে প্রবেশ করছে। বোঝাই গেল অনেকক্ষণ ধরেই এই ঘরে কেউ আসেনি। তাহলে তাকে ডাকল কে? কথাটা ভেবে তার শরীরে শিহরন এল। এই ঘরে হাওলাদার সাহেব থাকতেন না কখনোই। তিনি উপরের তলায় থাকেন। কাজের লোকদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে স্বপন ডাক্তার দোতালায় উঠে এল। উপরেও ঘন অন্ধকার। নিচে তাও কাজের লোকদের ঘরের বাতি থকে কিছু আলো পাওয়া যাচ্ছিল। উপরে এর ছিটা ফোটাও নেই। স্বপন ডাক্তার এইবার ভড়কে গেল। সে নিচে যে মুর্তিটিকে দেখেছে সে তার সম্মুখে আর যেতে চায়না। এর মানে তার এই বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার রাস্তা বন্ধ। এতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও কাউকেই সে দেখছেনা। একেতো লোকজনের কোন হদিস নেই, অপরদিকে যার ডাকে এখানে এসেছে তার দেখাও মিলছেনা। শুধু অদ্ভুত এক কন্ঠে কেউ তাকে নির্দেশনা দিচ্ছে। নানা কথা চিন্তা করে সে সামনে না এগিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে টর্চ লাইটের নিভু নিভু আলো মেরে চারদিক দেখতে লাগল। কে জানত এমন অন্ধকার বাড়িতে রাত বিরাতে এসে তাকে এমন বিপদে পড়তে হবে। এখন তার নিজের উপরেও খুব রাগ হচ্ছে। রাগের মাথায় কিছু না ভেবেই চলে এসেছে। মোবাইলটাও সাথে আনতে ভুলে গেছে। একসাথে এতগুলো ভুল তার হয়না। আজ দিনটাই বুঝি অশুভ। অন্য কেউ হলে এতক্ষনে নানা দেবতা প্রভুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিত। কিন্তু স্বপন ডাক্তার যে পনের বছর ধরে রাম নাম মুখেই আনেনা। সেই যে তার ক্যান্সার রোগী মৃতপ্রায় দিদির আরোগ্যের জন্য মান্নত করে সে ব্যর্থ হয়েছিল, তা থেকে সে আর কাউকেই প্রভু মানেনা।

হঠাৎ করেই স্বপন ডাক্তার তার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনল। ততক্ষণে টর্চের চার্য একেবারেই শেষ। বুঝার উপায় নেই কে তাকে ডাকছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে কেউ তাকে হাওলাদার সাহেবের মত করে ডাকছে, “ডাক্তার মশাই এইদিকে আসেন”। চারদিক থেকে এই ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অথচ বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছেনা। কারো পায়ের আওয়াজও না। সেই ডাক বার কয়েক শোনার

পর আর তা শোনা যাচ্ছেনা। তবে সে তার ঘাড়ের উপরে অজানা কোন শক্তির প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছে। সেটি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপন ডাক্তারের গলা দিয়েও কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছেনা। ততক্ষণে সে একটি পচা দুর্গন্ধময় ঘরে এসে প্রবেশ করেছে। এরপরে কি ঘটবে সে অপেক্ষাতেই সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি সেকেন্ড যেন তার কাছে এক একটি মিনিট মনে হচ্ছে। হঠাৎ করেই হালকা আওয়াজে বজ্রপাত হল। জানলা দিয়ে যে আলো ঘরে এল তাতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল পচা গলা হাওলাদার সাহেবের লাশ বিছানার উপরে পড়ে আছে। আর সেই মুর্তির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাশটির চোখদুটি ঠিক স্বপন ডাক্তারের দিকেই চেয়ে আছে। লাশ দর্শনের পর কিভাবে যেন সেই শক্তিটি তার ঘাড় থেকে সরে গেছে। সুযোগ পেয়ে স্বপন ডাক্তারও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে অজানা অন্ধকারে ছুটল।

পরদিন সকালে স্বপন ডাক্তারের আধা মৃত দেহ সেই মুর্তিটির কাছেই পাওয়া গেল। পুলিশ এলে আরও জানা গেল হাওলাদার সাহেবের দুই চাকরের কুকর্মের কথা। তারা দুজনেই চেলাই মদ আনতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা খেয়ে আজ সাত দিন ধরে হাজত বাস করছে। এর মাঝেই কোন একদিন হাওলাদার সাহেব মারা গেছেন। কেউ জানতেও পারেনি ভেতরে কি হয়ে গেছে ?

সবাই ভেবেছিল এখানেই বুঝি ঘটনার শেষ। কিন্তু স্বপন ডাক্তারের ঘটনা আরও রহস্যময় করতে আরেকটু এগুলো। কেউ তার স্ত্রীর কাছে দুর্ঘটনার খবর বলতে গেলে তাকে নাকি আশ্চর্য হতেই দেখা গেছে। কারণ সে বলছিল, তার পতি যদি হাওলাদার বাড়িতে যেয়ে থাকে, তাহলে সারা রাত ধরে তার পাশে লেপের তলায় কে শুয়ে ছিল?

গল্প

প্রতিবেশিনী

আতিকুর রহমান ফরায়েজী

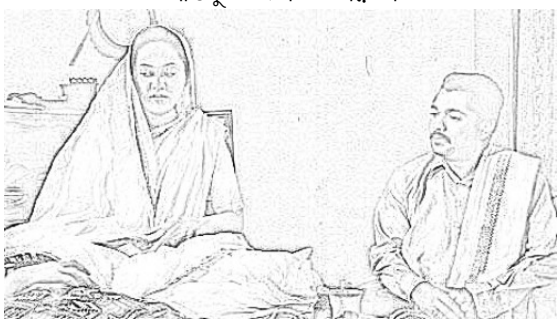

বকুল তলায় বসে আমি ও আবন্তী মালা গেঁথেছি, গলা বদল করেছি, কখন কখন খেলাঘরে'র সংসার পেতেছি। এরকম মধুর স্মৃতি জড়িত বকুল গাছটি এখনও মাথা উচু করে আগের মতই গন্ধ ছড়িয়ে চলেছে। শৈশবস্মৃতি বেদনাকাতর সত্য তবে তার আস্বাদন বিষনাশীর মত যা গড়লকেও অমৃত করে। তাইতো বুঝি কারনে অকারনে মনের মধ্যে শ্রাবনের মেঘের মত সে উঁকি মারে। তখন বাবা রাজি ছিলেন, আবন্তীর বাবাও রাজি ছিলেন, দুই পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্কটা আরও একটু মজবুত হয়েছিল। বাবা এবং আবন্তীর বাবা এরা দুজনে ছিলো চাচাতো ভাই। বাবার দাদুর বাবা এবং আবন্তী বাবার দাদুর বাবা একই জন ছিলেন। দুটি পরিবারের সুখ -দুঃখ যেন একই। এক পরিবারের অসহায়ত্বে অন্যটি ছায়ার মত পাশে এসে দাড়াতে দেখেছি সেই ছোট বেলা থেকে। আবার খুব মনে আছে আমি তখন প্রাথমিক পাশ করে পাশের গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছি। বাড়িতে মোটামুটি সকলেই শিক্ষিত, ফলে সকাল- সন্ধা পড়া, পড়া আর পড়া। আমি যখন "অ পড়ি ষরাবং রহ ধ ংযবফ একটি গরু গোয়ালে বাস করে, অ ংযববঢ় রহ ধ ঢ়বহ একটি ভেড়া খোয়াড়ে বাস করে, অ ফড়ম ষরাবং রহ ধ শবহহবষ একটি কুকুর গুহায় বাস করে" নিয়ে ব্যস্ত আবন্তী তখন ক এর সাথে ল তার সাথে আ কার যুক্ত করে কলা, ভ এর সাথে আ কার তার সাথে ত যুক্ত করে ভাত বানান করতে শিখেছে। এ বিষয়ে আমি একটু বেশিই গৌরব করতাম, আবন্তী তা নিরবে সহ্য করতো। তবে মাঝে মাঝে সে আমার স্থান অধিকার করায় আমাদের সংসারে মাঝে মাঝেই ঝগড়া বিবাদ বাধত। মাঝে মাঝে আমি আবন্তীর রাগ ভাঙানোর দায়িত্বে যখন হার মেনে আবন্তীর উপর রাগ দেখাতাম তখন মা বলতেন, সংসারে এমন অল্প সল্প ঝগড়া হয়, তা কি মনে করে রাখলে চলে! সে ঝামেলা আমি মনে রাখি নি। জানিনা আবন্তীরও মনে আছে কিনা। কিছুদিন ধরে আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে একটি সুপ্ত ফ্যাসাদ শুরু হয়েছে। আমাদের বাড়ির জমির ভিতরে নাকি আবন্তীদের জমি আছে। বাবা জমিজমার হিসাব ভালো বোঝেন। তিনি বললেন, না আমার জমির ভিতরে কারো জমি নেই। কিন্তু আবন্তির বাবা মানতে নারাজ। তিনিও জমিজমার ব্যাপারে খুব ভালো বোঝেন। তিনি বললেন, না না তা বললে হবে না, আমার দেড় কাঠা জমি তোমার বাড়ির জমিতে আছে। বাবাও জেদি তিনি বললেন, তবে যদি তাই মনে হয় তবে মহরি দিয়ে মাপিয়ে নে। – হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নেব, তাই নেব। শ্রাবণের শ্রান্ত বিকেল যেন প্রকৃতির কোলে নিজেকে সপে দিতে দিধাবোধ করছে। কিসের ভয়ে কি লজ্জায় যেন বার বার নিজেকে আড়াল রাখতে চাইছে। মাথার উপরে একরাশ কালো মেঘ জমাট

বেধেছে অথচ বৃষ্টি নেই। সে মুহূর্তে বকুল তলায় আবন্তী একা। চুলগুলো মাঝে মাঝে ঝাপটা বাতাশে দোল খাচ্ছে। বকুল বার বার তাকে সাজিয়ে দিয়ে নিরবে মাটির বুকে ঝরে পরছে। অথচ কিসের একটা অপূর্ণতা যেন সেই মুহূর্তে আমার হৃদয়টাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিল। তরুলাতার একটি গুচ্ছ যদি মাটিচুত্য করা হয় ঘন্টা দুয়েক পরে যেমন বিমর্ষ হয় তার বর্ণনা দেওয়াটা বড় শক্ত। আমার কাছে আবন্তীকে সেদিন এই মাটিচুত্য একগুচ্ছ তরুলতা ব্যতিত কিছু মনে হয় নি। মৃদু পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলাম। ও আমার দিকে তাকাল না। অথচ অন্যদিন বারবার বলতো অরুণ কি কবিতা লিখেছ আজ ? আমি মাথা নাড়তাম, নাতো আজ কোন কবিতা লিখিনি। ও নারাজ, না লিখেছ, না, বাবা লিখিনি। এভাবে বেশ কিছুক্ষন ধস্তাধস্তির পর পকেট থেকে ভাজকরা একটি কবিতা যখন তার সামনে ধরতাম তখন নিজের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। যুবতী মেয়েই হোক কিংবা স্বর্গের অপ্সরাই হোক এই জাতী বলতে আমার জীবনে এমন নিবিড়ভাবে এই মৃণময়ী ছাড়া আর কাউকে কখন দেখিনি। তাই মানস-সুন্দরী জাতীর প্রতি আমার জ্ঞানটা ছিল সীমাবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর বললাম, তরু। একটা অস্পষ্ট শব্দ পেলাম। আমার পাশে বসা এ ষোড়শী বালিকার নাম এটি নয়। তবুও আমার দিকে ফিরলো। যেন তরু তার আপন নাম, যে নামে পৃথিবীর কারো কোন অধিকার নেই এই নামের উপর। একটি জন্মের অংশিদারীত্ব নিয়ে তরু নামটি তার কাছে এসেছে। ফুলদানীতে কাটা ফুলের কষ্ট মানুষ জাতির পক্ষে বোঝা দুরুহ বিষয়। কেননা এ জাতিটা মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও মানবিক গুণ সম্পন্ন নয়। কিন্তু এই মানস-ফুলের কষ্টটা আমার হৃদয়ে শিলের মত বিধল। বাতাশের আবেগে এলোচুলগুলো বার বার দোল খাচ্ছে। চোখের নিচে কালো দাগ ক্রমশ গাঢ় হয়েছে মুখবিবর্ণ ফ্যাকাশে। বুঝতে পারলাম গতরাত নির্ঘম কেটেছে। অনেকটাই বিস্মৃত কন্ঠে বললাম, আবন্তী ! মেঘধারী আকাশ তখনও তার সবটুকু প্রচেষ্টায় মেঘকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু মেঘনয়নার আকাশ হতে শ্রাবণধারা বর্ষিত হলো। নিজের মনের মধ্যেকার কথাগুলো বারবার মনের মধ্যেই অস্পষ্টস্বরে বলে চলেছে, কেঁদনা আবন্তী, আমি তোমার কান্না সহ্য করতে পারছিনা, তুমি কেঁদনা, প্লিজ। কিন্তু ভিতরের আবহতা বাইরের আবহতায় শূণ্য, ভিতরের পূর্ণ ভিতরেই নিরবদ্বীপে চাতকিণীর বিলাপ, চাতক নির্বাক হয়ে নিরবে নিশেঃষ হয়ে গেল। । এভাবে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। আবন্তী বলল, কেমন আছো তুমি ? সবাই বলতো কথার পিঠে কথা লাগাতে আমি অনেকভালো পারি। কিন্তু এ মুহূর্তে কি বলবো বুঝতে পারলাম না। বললাম, একটি কবিতা লিখেছি শুনবে ? – না, তোমার কথা বল। নিরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ তারপর ধিরে ধিরে দুজনা আলাদা হয়ে গেলাম। অনেক আলাদা যা কখনই এক করা সম্ভব নয়। এখনও জমির সে বিবাদ মেটেনি। অথচ ছোটবেলার বকুলতলায় খেলার সে সংসারের বিবাদ খুব সহজেই মিটিয়ে দিয়ে আবন্তীর বাবা ধুমধাম করে বাড়িটা সাজালেন। অনেক আত্মীয় স্বজন আসলো বহুদূর থেকে, কিন্তু কে জানত নিজের সবচেয়ে কাছের এ আত্মীয়'র বাড়িটা সেদিন অনেক দূরে থাকবে! পৃথিবী'র দুটি অংশ। এক অংশে বিষাদভরা আনন্দ আর অন্যপাশে শুধুই বিষাদ। আবন্তীর বিয়ের দিন মার কোলে মুখ লুকিয়ে অনেক কেঁদেছি, মা সেদিন বলেনি, সংসারে এমন অল্প সল্প ঝগড়া হয়, তা কি মনে করে রাখলে চলে! বরং আমিই বলেছিলাম, মা তুমি ভূলে যাও যে আবন্তী নামে আমাদের জীবনে কেউ ছিল। তবুও মা কথা বলেনি। তার দু'চোখে আমাবশ্যার পূর্ণিমায় সিন্ধুতরঙ্গ। গভীর মেঘ ফোটা ফোটা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। মায়ের মেয়ে নেই আমিই একমাত্র ছেলে। আবন্তী জন্মের পর থেকেই মায়ের কাছে বড় হয়েছে। একদিন আবন্তীর বাবা মাকে ডেকে বলেছিলেন, ভাবি মেয়েতো আমার না, তোমার। আবন্তীর মা ওকে পেটে ধরলে কি হবে, তুমিইতো ওকে মানুষ করছো। আবন্তী এখন থেকে তোমার মেয়ে, আমার কোন দাবি রইল না। কিন্তু তোমার ছেলেটা আমাকে দিতে হবে। মা'তো সেই সেদিন থেকেই আমাকে দিয়ে দিয়েছে, কখন কোন অভিযোগ করেনি। কিন্তু আজ সামান্য বিষয়ে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়ার দাবি উঠছে! এতদিনের এ বন্ধন সামান্য একটি ঝড়ে ছিড়ে গেল! এই সে বকুলতলা আগের স্থানেই দাড়িয়ে আছে। দুই পরিবারের জমিজমার বিবাদ মিটে গেছে। আমিও নিয়োমিত বকুলতলায় বসি। বকুল ফুল আগের মতই ঝড়ে পড়ে। প্রকৃতির বুকে যত বড় ঝড়ই আসুক না কেন তা সে সংবরণ করে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, কিন্তু মানুষ সেটি পারে না। মানুষের প্রকৃতি বড় রুক্ষ একবার নষ্ট হলে আর শ্যামল হয় না। আমি আকাশে দিকে তাকিয়ে আছি, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। বকুল ফুলের গন্ধ আছে কিন্তু মন মাতাতে পারছি না। হঠাৎ পাশে একটি চিরচেনা পদশব্দ শুনতে পেলাম। পাশে এসে বসলো। নির্দিধায় আগের মতই হাতে হাত রাখলো। আমার মতই সেও আকাশে দিকে তাকিয়ে প্রকৃতিকে চিনতে লাগলো। আজ যেটি আপনার কাল সেটির উপর কোন দাবি নাও থাকতে পারে! এত কাছাকাছি তবুও যেন কত দূর! নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবন্তী বললো, নতুন কবিতাটি পড়। ধীরে ধীরে পকেট থেকে কাগজটি বের করে পড়তে থাকলাম- তুমহীন আমি সম শূণ্যপুষ্প মালি। আজি হৃদয় মম শুষ্ক মাল্যসম। মম বফিল স্বপন, মম নরিাশ ভূবন, মম অন্তরখানি শ্রান্ত, নরিাশ, বকুেলী। তব বহিনে কুসুম কানন ধারে আঁধার মাঝারে হরেছিি ডুবি, আজি নস্তিজে, নীরব সকলি। আঁধার সম্মুখ, ব্যথ্যাতুর বুক নরিাশার রাশি অন্তরে উঠছিে ত্রাসি, পরান তব বরিহে পুড়ছিে আকুলী ॥

কবিতা

খুঁজছি তোমায়

মোঃ নিউশা

পথে-ঘাটে-মাঠে,
নানান লোকের হাটে,
আমি খোজছি তোমায়।
এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে,
মন আমার কেঁদে উঠে,
একাকিত্তের বেদনায়।

বিধাতার অদৃশ্য লিখনের মাঝে,
খোজে তোমায় পাইছি না-যে,
তবুও আমি খোজছি তোমায়।
বসে আছো কোন বেশে,
কোন স্থানের কোন দেশে,
কোন জীবন ধারায়।

মন আমার দিশে হারা,
তোমার লাগি পাগল পারা,
আদৌ আমি খোজছি তোমায়।
একাকিত্তের যন্ত্রণাতে,
দিবা-নিশির কল্পনাতে,
তুমিও কি খুঁজছি আমায়????

কবিতা

আমার সবুজ পাখি

মোঃ শাহীনুর রহমান

সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছিল
তার সারাটা গাঁ
হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল
আমায় দিয়ে ঘাঁ।

লাল টুকটুকে ঠোঁট খানি তার
ডাকতো আমায় নানা
সারাটা দিন ঘরটায় যেন
সুর দিত তার হানা।

পাখি তো নয় লক্ষ্মী ছিল
ঘরটা আলোয় জ্বেলে
যেদিকে যাই সাথেই যেত
যাদুর পাখনা মেলে

আম পেঁয়ারা জাম খেত খুব
খেত কথার লাজ
অচেনা লোক দেখলেই সে
ছাড়তো কথার বাজ।

নাম কী তোমার কোথায় থাক
কেনবা এলে হেথায়?
বিষিয়ে তুলতো আগুন্তককে
এমনি হাজার কথায়।

কখনো বা ছিচঁকে চোরে
পড়তো কথার প্যাঁচে
লেজ গুটিয়ে দৌড় দিলে
পাখি উঠতো নেচে।

সোনার পাখি টিয়া আমার
ছোট্ট বেলার সাথী
চোখের জলে ভাসিয়ে আমায়
নিভিয়ে গেছে বাতি।

পথ চেয়ে তার কৈশোর আমার
কেটেছে আশায় আশায়
গাছের ডালে খালে বিলে
খুঁজে পাখির বাসায় ।

হারিয়ে যাওয়া সবুজ পাখি
সবুজ পাখার ঘ্রাণ
স্বপ্নে আজো সঙ্গী করে
ভরাই দুখের প্রাণ।

কবিতা

ধরণীর পর বাসর

আলমগির সরকার লিটন

মন কাদিস বলে ঝরে নোনা জল
ও হাসিস বলে ফুটে সুখের বল
জল ঝরে বল ক্ষরে প্রকৃতির কল;
তাই বলে কি হলে নিঠুর ঈশ্বর
এজনমে বাঁধল না দুটি মনের ঘর
বয়ে দিল এ কেমন ভাঙ্গনেরঝড়।।

এই না ধরণীর তরে কত কিছু দিলে
আরো দিলে বর্ণহীন বোধচিন্তার ধর;
সদা জাগ্রত হইলাম না ঈশ্বর, কেরে
নিলে প্রিয় অন্তরের অন্তর; সুধাই গো
যদি থাকে! পরকালে পূণ্যেরো বল
চাই না – চাই না হউড় পরীর ছল,
নূরের আলোই বেহেস্তের ফুলেলে
গড়তে দিও ঈশ্বর দু'জনার বাসর।।

জীবনের গল্প

একটি শিরোনামহীন গল্প

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ।। *ঔষুধের কারিগর, পেশায় ফার্মাসিস্ট. এই ব্লগেই শুরু করলাম লেখার হাতে-খড়ি......*

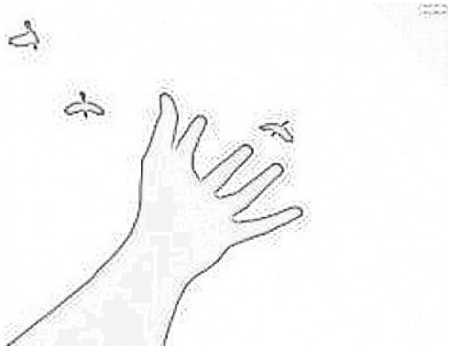

আজ আমার বাগদান, যদিও এটা আমার জীবনে নতুন কোনো ঘটনা নয়।এর আগেও এমন একটা দিনএসেছিলো ঠিক এমনই বেদনা নিয়ে। অজস্র বৃষ্টিঝড়া সন্ধ্যায় সেদিন আমি ঘর ছেড়েছিলাম। বাবামার সব স্বপ্ন আশা পেছনে ফেলে, রহস্যঘেরা এক সম্পর্কের হাতছানিতে ঘর ছেড়েছিলাম আমি।

সাড়ে চারশোমাইল পাড়ি দিয়ে তারদ্বারে কড়া নেড়েছিলাম। আমার চোখের কোণে জলটুকুর ভাষা বোঝেনি সে, নাকি বুজতে চেষ্টা করেনি জানিনা....

মেঘ আর আমার বন্ধুত্বটার শুরু ফাস্টইয়ার থেকেই আর শুরু থেকেই সবার কাছেই সেটা একটা প্রশ্নবোধকচিহ্ন ছিল।আমার কাছেও সম্পর্কটার কোনো নাম ছিলোনা. আমি জানতাম আমি ওকে ভালবাসি এটাও জানতাম কখনো ওকে বলতে পারবোনা কিন্তু কিছুই কী ওবোঝেনি? লেকেরপাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ কেটে গেছে কতদিন, ক্লাসের বেঞ্চিতে সারাক্ষণ চিড়কূট বিনিময়, ভরা সাঝের কন্যা সুন্দর আলোতে রিক্সাতে বাড়িফেরা।জানি শুধু বন্ধুত্ব ছিলনা. কিন্তু মুখফুটে বলা হয়নি কখনো।আমি অপেক্ষা থাকি বলবে বলে...

বছর পর বছর আমি অপেক্ষা করতে পারতাম.. অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারতাম.. কিন্তু.......

বাসা থেকে ফোন এলো আমি যেন পরদিনই বাসায় চলে যাই। মেঘ বাসস্টান্ড এ আমাকে বিদায় দিতে এলো, আমি হেসে বলেছিলাম

-কীরে! আমি কী সারাজীবনের জন্য যাচ্ছি নাকি যে বিদায় দিতে আসলি? আমিতো ভাবলাম তুই এসে বলবি আমি যেন না যাই।

- তোকে শেষবারের মতো একলা দেখে যাই ফিরে আসলেতো তুই দোকলা হয়ে যাবি।

-দেখেনে সাহস করেতো বলতে পারবিনা

বাস এ উঠে আমি একবারও পিছনে ফিরে তাকাইনি,,আমি চাইনা আমার চোখের জল কাউকে দুর্বল করে দিক। তারপরও আমি ফিরে এসেছিলাম,আম্মু ওর ফোন পেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো আমার পছন্দের কেউ আছে কিনা।ও নির্বিকার উত্তর দিয়েছিলো, আমিতো ওর সবচে ভালোবন্ধু কেউ থাকলে আমিতো জানতামই , ওকে কিছু সময় দিন ঠিক হয়ে যাবে হটাত করেতো তাই অমনকরেছে।

বাসাতে আমার বিয়ের কথা আসলেই চুপ করে থাকতাম, একদিন সববাধ ভেঙ্গে বলে ফেললাম আমি মেঘকে বিয়ে করতে চাই...বাসার সবাইতো বাকরুদ্ধ, আব্বা বললো

তোর কী মাথা খারাপ হইছে? ওতো তোর ক্লাসমেট ওনা বয়েসে তোর ছোটো? ছি!ছি!ছি!..

তবু আমি অনড়।জানিনা কোন ভরসায় কোন মায়ায় পাহাড় সমান মনোবল আমাকে পেয়ে বসেছিলো।আম্মার হস্তক্ষেপের শেষ পর্যন্ত সুরাহা হলো, যেহেতু আমরা একই ক্লাস এ পড়ি সেহেতু বিয়ে না হলে ওদের বাসা থেকে প্রস্তাব পাঠিয়ে, আমাদের এনগেজমেন্ট সেরে রাখতেহবে।এরপরের ধাক্কার জন্য বাবা-মা একদম প্রস্তুত ছিলোনা। আমি চাপাকণ্ঠে বললাম আমিতো জানিনাও আমাকে বিয়ে করবে কিনা, বন্ধুত্বের চে বেশি কিছুও ভেবেছে কিনা তাও জানিনা।আর যায় কোথায় আব্বা বললেন সামনের মাসে তার পছন্দের ছেলে আসবে তখন এনগেজমেন্টটা সেরে রাখবে।

আমার সব কাছের বন্ধুরাও কখনো চায়নি আমি মেঘের সাথে চলাফেরা করি আমার সবচে পুরনো বন্ধুর সাথে আমার সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে শুধু ওর কারণে, শেষ যেকথাটা বলেছিলো, দেখ তুই কেনো বুজতে পারছিসনা, মেঘ এর মতো একটা ছেলে কখনো তোকে বিয়ে করবেনা। শুধু সময় কাটাচ্ছে তোর সাথে, তুই কেনো অতো বোকা? আসলেই আমি বোকাইতো।ওর সব আনন্দ আর বেদনাতে পাশে থেকেছি. ওর দুইবছরের সম্পর্কের হঠাৎভাঙ্গন যেনো ওকে একটুও ভাঙ্গতে নাদেয় তাই কতো বিকাল পার করেছি একসাথে।কই আমার এ কষ্টতো ওর মনে দাগ কাটেনি, কখনো সে বলেনি আমার পাশে থাকবে।

অবশেষে একদিন ওকে বললাম আমাদের এই বন্ধুত্বের একটা নাম চাইআমি।সে বল্লো বন্ধুত্ব তো বন্ধুত্বই।আমি শুধু ওকে বলেছিলাম তুই ভালো থাক।তারপরে আজ পর্যন্ত আর কথা বলিনি তার সাথে।রবীন্দ্রনাথই তো বলে গেছে "ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেনো মিছে ভালোবাসা". ভার্সিটিতে গেলেওআমার সাথে অনেক কথা বলতে চেস্ট করছে আমি বলিনি।

আম্মা একটা সুন্দর জামদানি শাড়ি দিয়ে গেলেন পড়ার জন্য, বাসায় রান্নাবান্নার ধুম চলছে। এরমধ্যে আমার ছোটোভাই এসে বল্লো মেঘ এসেছে।গেস্টরুমে মেহমান আসবে বলেই বোধহয় আমার রুমএ চলেএল।রুমএ ঢুকে বল্লো

"আরে তোকেতো পরির মতো লাগতেছে, তোর বাসায় চলে আসছি আজকে নিশ্চয়ই কথা বলবি." আমি তবুও কোনো কথা বলিনাই।ও পকেট থেকে আমার দেয়া একটা ঘড়ির বাক্স বের করে দিয়ে বল্লো আমি গেলাম আব্বু আম্মু আসবে নাটোর থেকে, স্টেশন এ যেতে হবে।

আমি ভাবলাম আমার দেয়া গিফ্ট বুঝি ফেরত দিয়ে গেলো, তবু একবার খুল্লাম, খুলে ওনেক কাদলাম আমি, আমার দেয়া শুকনো পাতাতে লেখা কিছু চিড়কূট, অতদিন আমি ভাবতাম ও মনে হয় পড়েও দেখেনি।কারণ পাতাতে লিখে আমি ওকে শুধু প্রশ্নই করতাম, যার কোনো উত্তর ও কখনো দেয়নি।

একটা চিড়কূট এ লিখেছিলাম

"কখনো কী আমায় ভেবেছিলে বন্ধুর চেয়ে একটুখানি বেশি?চিড়কূট এর নীচের খালি জায়গাতে ও ছোটো করে লিখেছে "জানি তুমি আমায় এখনো চিনতে পরোনি,ভালোবেসে ডাকবে যখন,আসব তখনই"।

আরেকটা বড়ো সবুজ পাতাতে বড়ো করে লেখা
" বিয়ে করবি নাকি আমাকে? গাড়ি বাড়ি কিছুনাই কিন্তু আমার"
খুব কাদলাম এখন বলে আর কী হবে?
একটু পরেই দেখি হাসিমুখে আমার রুম এ।এইবার কথা না বলে পারলামনা

- "তুই যাস নাই?"
- "নারে আব্বু আম্মু নাকি তোদের বাসাতেই আসবে"

আমিতো অবাক -কী? কেনো?
ফাজিলটা গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বল্লো
-তোর বাপ-মা নাকি ভালো ছেলে পাচ্ছেনা, তাই ভাবলাম কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করে একটু সওয়াব কামাই করি.....

গল্প

নিরুদ্দেশ রুমা

ক্রাউন ৷৷ *আমি ভারতীয় তাই ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী । ভারত আমার জন্মভূমি তাই এদেশকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি।*

মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উটছে । দেখতে দেখতে সতেরটি বছর কেটে গেল । মা বাবার একমাত্র মেয়ে ।সবেমাত্র হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে ।রেজাল্ট বের হলে ভাল একটা পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন । মেয়ের কোন কিছুর অভাব যেন না হয় তাই মা এখন থেকে বিয়ের কেনা কাটা শুরু করে দিয়েছেন । বিয়ের শাড়ী ,ছুড়ি , পাটি ,বাসন আর কত কিছু । শ্বাশুড় বাড়ীতে মেয়েকে শ্বাশুড়ির কোচা খেতে যেন না হয় এই নিয়ে মায়ের যতসব চিন্তা । এরি মধ্যে দু এক জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধও এসেছে ।পোষ মাসের আগে মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে মা জানিয়ে দিলেন । দুটো নয় ,তিনটো নয় একমাত্র কন্যা । যার তার হাতে মেয়েকে আবার তুলে দিতে পারেন না । তাছাড়া মেয়ের বিয়ে ধূমধাম করে দিতে চান ।

সামনের শুক্রবারে মেয়ের বিয়ে ।সমুস্ত বাড়ী আলোময় । ঘরে পা রাখার জায়গা নেই । টঙ্গি ঘর খুলে দেওয়া হয়েছে । সবার মুখে হাঁসি । শিশুর কান্না ,মেয়েদের হাঁসির আওয়াজে সারা বাড়ী যেন নতুন করে বাকশক্তি পেয়েছে । বৃদ্ধদের বিড়ির টানে ধোওয়া কুণ্ডলি পাকাইয়া উপর দিকে ফুপিয়ে উটছে । একজন নবাগত আগন্তক বাড়ীর পাশ কেটে যেতে টের পাবে বিয়ে বাড়ী বলে । বিয়ের প্যান্ডেল দেখার মত । পাশের দু তিন গায়ে এমনটা হয়েছে বলে সন্দেহ জাগে ।

সকাল ৭ টা হয়ে গেল রুমাকে দেখা যাচ্ছে না । মাসি গিয়ে দেখলেন ,ঘর ভিতর দিকে লক করা । হয়ত রাত্রে ঘুমাতে দেরী হয়েছে তাই ডাকাডাকি না করে চলে এলেন । খাবার সময় হয়ে গেল এখনও রুমা উটছে না দেখে কাজের মেয়েকে পাঠালেন খোজ নিতে । আবারও সেই একি দৃশ্য । অনেক ডাকাডাকি পর দরজা খুলছে না দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন । দরজা ভেতর দিকে লক অথচ মেয়ের কোন সাড়া শব্দ নেই । মা সহ্য করতে না পেরে 'ও মাই গো'এই একটি মাত্র বাক্য বলে মূর্ছা গেলেন । সবাই ধরাধরি করে মা কে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ।একজনকে পাঠালেন ডাক্তার ডাকতে । হঠাত চোখ পড়ল পেছনের জানালার দিকে । জানালার একটা কপাট খুলা । উকি মেরে দেখলেন জিনিসপত্র সব ঠিক ই আছে । শুধু রুমাকে দেখা যাচ্ছে না ।সবাই ঘরের ভেতর ঢুকতে চায় ।টেলাটেলি করে ঘরে ঢুকে দরজা জানালা খুলে লাইট জ্বালিয়ে রুমাকে দেখা গেল না । সারা বাড়ী স্তব্দ হয়ে গেল । কারও মুখে কোনো কথা নেই । একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে । কেউ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না । খবর টা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল । সবাই কান ঘেষাঘষি করতে লাগল ।

হয়ত কোন বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেছে এই বলে কেউ সান্তনা দিচ্ছেন । আবার কেউ কিছু না বলে শুধু কানাকানি মাতামাতি নিয়ে ব্যাস্ত ।বড় ভাই একেবারে পাগলের মত বারান্দায় ঘোরপাক খাচ্ছেন । কি করবেন কিছু বুঝে উটতে পারছেন না ।যে মেয়ে কোনদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরুয়নি সে আজ ঘন্টার পর ঘন্টা নিখোজ । কেউ বললেন ,ওকে খুজে আর লাভ নেই । ও পালিয়ে গেছে । তাহলে লোকের কথা কি সত্যি । কোনদিন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করি নি । তাহলে আজ কাউকে কিছু না বলে ও এভাবে চলে গেল কেন ? অন্তত একটি বার মনের কথা খুলে বললেত পারত । বারবার এই একটি কথা ভাবতে ভাবতে বড় ভাই বারান্দায় পায়চারি করছেন । লোকের সামনে মুখ দেখাবেন কি করে । কাল বাদ পরশু বোনের বিয়ে । কি বলে এই বিয়ে ভঙ্গ করবেন ?

বাবা মেয়ের বিয়ের ফার্নিচার আনতে সেই ভোরে না খেয়ে বের হয়েছিলেন । বাড়ীতে ঢুকতে সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তিনি খানিকটা বিস্মিত হয়ে পড়লেন । তিনি জিজ্ঞেস করলেন , কি হয়েছে ? কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না । কিছুসময় পর সবকিছু পরিস্কার হয়ে উটল ।

মেয়ে পাশের গ্রামের একটি ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে । এমনটা হওয়ার কথা ছিল না । তার মাথা ঘুরে উটল । এদিকে মা বারবার মূর্চা যাচ্ছেন । বাবা একগ্লাস জলে চেয়ে মাটিতে বসে পড়লেন । তার চোখ দিয়ে বৃষ্টির ফোটা টপ করে মাটিত পড়ল । সতেরো বছর ধরে একটু একটু করে জমানো স্বপ্ন আজ বৃষ্টির জলে ভাসিয়ে গেল ।

বড় গল্প

বৃষ্টিগ্রস্ত

সুপণ শাহরিয়ার ꩜ *আমি, প্রচন্ড আত্মহত্যাপ্রবণ একটা ছেলে।*

উৎসর্গ

কষ্টে হলেও ভেবেই নিয়েছিলাম- আর লিখতে পারবো না। ক্লাস নাইন-টেনের পড়াশুনোয় অবহেলা করে যা ক'টা গল্প লিখেছিলাম, সেগুলোই স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে। একদিন সংসার হবে, বাচ্চা-কাচ্চা হবে, তারা বড়ো হবে, গল্পগুলো দেখে অবাক হয়ে বলবে- 'বাবা, তুমি তো খুবই ভালো লিখতে, লেখালিখিটা বাদ দিলে কেনো?' একসময় দাদু কিংবা নানু হবো, হয়তো তারাও একই প্রশ্ন করবে। এইসব প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে, লিখতে না পারার যন্ত্রনা নিয়ে কেটে যাবে আমার সারা জীবন। কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, পরম করুণাময় আবার আমাকে কৃপা করলেন- প্রায় এক যুগ পরে এসে আবার আমি লিখতে পারছি। শাহবাগ আন্দোলনকে ভিত্তি করে লিখে ফেললাম 'শাস্তি' এবং তারপর এটা- বৃষ্টিগ্রস্ত।

একটা কথা না বললেই নয়- আমার এই লেখালিখির জগতে ফিরে আসতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছে আমারই সহোদর ছোটো ভাই তুহিন। এবং এই লেখাটার জন্যে ওর নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ।

তুহিন অর্ণব, স্নেহের তিড়িং বিড়িং ইস্পিরিং,

তোর ছোট্টো ভাবনাটা ছিলো একটা অণুগল্পের ভাবনা, কিন্তু এতো বড়ো একটা গল্প লিখে ফেলবো- ভাবা যায়!?

সুপণ শাহরিয়ার

মিস্ত্রীপাড়া, খুলনা

* * * * * * * * * *

গল্পের শুরু

জুলাই মাসের এমন মন মাতাল করা বৃষ্টিবেলা ঘরের মাঝে চুপচাপ বসে থাকা কি সহজ কাজ?

বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আক্কাস সাহেবের নেই। ফজরের নামাজ শেষ করেই তিনি লাঠিটা হাতে নিয়ে ঠুক ঠুক করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, আস্তে আস্তে বারান্দার এক প্রান্তে গিয়ে এক হাত দিয়ে গ্রিলের একটা পাত ধরে ফেললেন, এবং দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি সেখানেই।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি। মাঝে মাঝে এলোমেলো বাতাশের ঝাপটায় বৃষ্টির ছাট় এসে পড়ছে আক্কাস সাহেবের চোখেমুখে, গায়ে। পরপরই তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন। তারপরও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন গ্রিল ধরে, দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর ভালো লাগছে, বেশ আনন্দ লাগছে। তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট প্রসন্নতা।

বরাবরই তিনি বৃষ্টির প্রতি দুর্বল- শুধু দুর্বল না, বেশ চূড়ান্ত রকমের দুর্বল। পাখি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'চাতক' বলে একদল পাখি আছে- বৃষ্টিপাগল। বর্ষার মৌসুম এলেই এরা আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচু করে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে, অপেক্ষা করে বসে থাকে। মানব সম্প্রদায়ের মধ্যেও চাতকের মতো এমন বৃষ্টিপাগল মানুষ আছে কিছু- যারা বৃষ্টিকালে আকাশের দিকে চেয়ে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে, অপেক্ষা করে বসেও থাকে।

ঠিক চাতকের মতো না, কিন্তু আক্কাস সাহেব বরাবরই বৃষ্টির প্রতি চুড়ান্ত রকমের দুর্বল।

অংকে একশ'তে ১০০ পাওয়া স্টুডেন্ট ছিলেন তিনি, এবং পড়াশুনোর প্রতি বেশ মনোযোগও ছিলো তাঁর। তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা (বর্তমানে এসএসসি) চলাকালীন সময়ে যেদিন অংক পরীক্ষা- দিনটি আষাঢ়-শ্রাবণের কোনো দিন ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ করেই আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলো সেদিন। তাঁর ছোটো বোন আতিকা বৃষ্টিতে ভিঁজতে ভিঁজতে দৌঁড়ে এসে বললো, 'মা, মিয়া ভাই ঋষি হয়ে গেছে।'

আতিকার কথা মা ঠিক বুঝলেন না। মা বললেন, 'মিয়া ভাই ঋষি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, মা- মিয়া ভাই ঋষি হয়ে গেছে।'

'ঋষি হয়ে গেছে মানে কী?'

'আমার বইতে আছে না- 'ঋ'তে ঋষি। ঋষি বসে ধ্যান করে। মিয়া ভাই সেই ঋষি হয়ে গেছে। পুকুর পাড়ে বৃষ্টির মধ্যে বসে ধ্যান করছে।'

'পরীক্ষা দিতে না গিয়ে হারামজাদা ঋষি হয়েছে? 'ঋ'তে ঋষি? ঋষিবাবা? ঋষিবাবার ধ্যান আমি ছুটোচ্ছি।'

ছাতি মাথায় দিয়ে মা বকতে বকতে বেরিয়ে পড়লেন বৃষ্টির মধ্যে। পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখেন তাঁর বড়ো ছেলে সত্যি সত্যিই ঋষিবাবা হয়ে গেছেন- যিনি ভাঁজ করা দু'পায়ের হাঁটুর উপর মুঠো করা দু'হাত রেখে টানটান হয়ে বসে আছেন, চোখ বুজে আকাশের দিকে গাল হা করে আছেন, বৃষ্টির পানি সরাসরি তাঁর গালে এসে পড়ছে, তিনি তা' সানন্দে পান করছেন।

ঋষিবাবা'র হা করে পানি পান করা দেখে মা'র রাগ আরো চড়ে গেলো। তিনি হনহন করে ঋষিবাবা'র কাছে গিয়ে বাবা'র কান ধরে টেনে দাঁড় করালেন। বললেন, 'নমস্কার, ঋষিবাবা।'

হঠাৎ আক্রমনে ঋষিবাবা বোধহয় একটু হকচকিয়ে গেলেন, মুখ কাচুমাচু করতে লাগলেন। মা আবার বললেন, 'তা ঋষিবাবার ধ্যানকার্যে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যে আমি যারপরনাই দুঃখিত। তা বাবা, আপনাকে আমি কি কিছু প্রশ্ন করিতে পারি?'

বাবা এবারও কিছু বললেন না। মা বললেন, 'তা বাবার তো এখন পরীক্ষার হলে গিয়ে অংক খাতায় বসে ধ্যান করার কথা ছিলো, এই পুকুর পাড়টা কি বাবার পরীক্ষার হল নাকি?'

বাবা নিরুত্তর।

মা'র রাগ একেবারে সপ্তমে উঠে গেলো। ছেলের কান ছেড়ে দিয়ে তিনি গজগজ করতে করতে বললেন, 'আপনার আজ থেকে খাওয়া-দাওয়া সব অফ। এখন থেকে আপনি এখানে বসে ধ্যান করবেন, আর হা করে বৃষ্টির পানি খাবেন। যখন বৃষ্টি থাকবে না, সূর্যের আলো থাকবে- হা করে কপকপ করে সূর্যের আলো গিলে খাবেন। আর আমি, আপনার বাপ আজকে স্কুল থেকে ফিরুক, তাঁকে বলে আপনার ধ্যানের ব্যাঘাত যেনো না ঘটে তার ব্যবস্থা নেবো। কেমন? পরীক্ষা বাদ দিয়ে উনি ধ্যানে বসে আছেন, হা করে বৃষ্টির পানি খাচ্ছেন- ঋষিবাবা। মাস্টারের ছেলে ঋষিবাবা। বদ কোথাকার।'

বালকবেলার সেই ঋষিবাবা খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রিলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

আগ্রহ নিয়ে তাকালেও আসলে তিনি চোখে তেমন দেখেন না- উনিশ শ' বাহান্ন'র ২১ ফেব্রুয়ারি, যখন তাঁর বয়স ১৮ কি ২০, 'বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা দাবি করে ঢাকার রাজপথ মিছিল-মুখরিত হয়ে উঠেছিলো, তিনি দেখেছেন; '৬৯ এর তুমূল গণঅভ্যুত্থানের ফলে আয়ুব খানের পতন ঘটেছে, তিনি দেখেছেন; '৭০ সনে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ, তিনি দেখেছেন; '৭১-এ পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে অসংখ্য মানুষ, মৃত্যুর সে নির্মম বিভৎসতাও তিনি দেখেছেন; '৭৪ এর দূর্ভিক্ষ, '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, সব, সব তিনি দেখেছেন, সব তিনি দেখতে দেখতে এসেছেন। এসবেরই মাঝে তিনি বিয়ে করেছেন, সন্তানের মুখ দেখেছেন, নাতি-নাতনী'র মুখ দেখেছেন। আর কতো? একসময়ের ঝকঝকে চোখ দু'টো তাঁর আজ বড়ো বেশি পুরাতন। দূর-অনতিদূর, সবকিছুই সে চোখে আজ ঝাপসা, অস্ফুট।

বৃষ্টিটা আরো একটু ধরে এসেছে। বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখ দু'টো যেনো কেমন করে উঠলো আক্কাস সাহেবের। বিরক্ত হয়ে তিনি তাঁর ছেলের বৌ'কে ডাক দিলেন- 'বৌমা। ও বৌমা।'

আক্কাস সাহেবের ডাক তাঁর বৌমা'র কান পর্যন্ত পৌঁছুলো বলে মনে হলো না- ভেতর থেকে সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না কিছু। তিনি আবার ডাক দিলেন- 'বৌমা। ও বৌমা, আমার চশমাটা একটু দাও না গো মা।'

প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলো তাঁর বৌমা নূপুর। বললো, 'কী, এতো চেচাচ্ছেন কেনো? এই সাত সকালে কী হয়েছে আপনার? আর এভাবে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো? বৃষ্টির পানি যে গায়ে লাগছে- সে খেয়াল আছে? অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে শেষে আমাকেই তো যন্ত্রনায় ফেলবেন। দেখি দেখি, গ্রিলটা ছাড়েন, এবার ওই হাত দিয়ে আমাকে ধরেন, চুপচাপ এখানে বসে থাকেন।'

একরকম টানতে টানতে আক্কাস সাহেবকে বারান্দায় সর্বক্ষণ রাখা চেয়ারটাতে এনে বসালো নূপুর। শ্বশুরের প্রতি তার এমন আচরণ নতুন কিছু না- প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রাত্যহিক যে কোনো ঘটনাই গা-সওয়া হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আক্কাস

সাহেবের গা-সওয়া হয় না এসব কিছুই। মনে মনে তিনি বড়ো আহত হন। পরক্ষণে আবার মনে মনেই প্রবোধ খোঁজেন- কে বলবে, বয়স হয়ে গেলে হয়তো সামান্যতম কড়া ব্যবহারও অতি কর্কশ লাগে।

'আমার চশমাটা এনেছো বৌমা?'

'না, চশমা আনি নি। বসেন, এনে দিচ্ছি।'

গজগজ করতে করতে ঘরের ভেতর চলে গেলো নূপুর। এবং কিছুক্ষণ পর ফিরেও এলো। একটা পুরনো ফ্রেমের চশমা তার হাতে- শুধু আক্কাস সাহেবেরই বয়স বাড়ে নি, দেখলেই বোঝা যায় তাঁর চশমাটারও অনেক বয়স হয়েছে। কালো ফ্রেমটার বিভিন্ন জায়গা থেকে রঙ উঠে গিয়ে কেমন ছাই ছাই বর্ণের হয়ে গেছে।

চশমাটা কোনো রকমে হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত আবার ভেতরে চলে গেলো নূপুর, চশমার গ্লাসটাও মুছে দেবার সময় হলো না তার।

চশমাটা চোখে দেবার আগে পাঞ্জাবির কোণা দিয়ে সেটাকে কিছু সময় ধরে মুছলেন আক্কাস সাহেব। নিজের চশমাটাকে এভাবে নিজেকেই মুছে নিতে হয় তাঁর নিয়মিত। এবং চশমাটাকে নিজ হাতে মুছতে গিয়ে নিয়মিতই বড়ো বেশি আহত বোধ করেন আক্কাস সাহেব, মৃত স্ত্রী'কে বারবার ফিরিয়ে আনেন তিনি স্মৃতিতে- কী অপরিসীম মমতায় সময় নিয়ে আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে চশমা মুছে দিতেন তাঁর স্ত্রী রোমেছা বেগম!

হয়তো স্কুল কিংবা বাজার থেকে ফিরেছেন, অথবা বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরেছেন তিনি- রোমেছা বেগম ছুটে চলে আসবেন তাঁর কাছে। ঘেমে ভিঁজে গেছে শরীর, শার্ট খুলে গায়ে বাতাস লাগানো জরুরি- রোমেছা বেগম প্রথমেই তাঁর শার্টের বোতাম খুলে দিবেন, তা' না- প্রথমেই তাঁর চোখ যাবে চশমার উপর। চশমাটা খুলে নিতে নিতে বলবেন- আচ্ছা তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আক্কাস সাহেব ঠিক ঠিকই জবাব দিবেন। পরপরই রোমেছা বেগম বলবেন- তোমার চশমায় যে পরিমাণ ধূলো-বালি তাতে তো মনে হয় তুমি আরব দেশে গিয়েছিলে। ফেরার পথে মরুভূমির উপর দিয়ে আসার সময় তুমি ভয়াবহ ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছো। চশমা-টশমার খেয়াল না করে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছো।

একবার রিকশার সংগে অ্যাক্সিডেন্ট করে চশমাটা ভেঙে ফেললেন আক্কাস সাহেব। সেবার তাঁর সংসারে সে কী নিদারুণ অভাব- 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। চাকরি-বাকরি নেই। সারাদিন কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, কোথাও কোনো কাজ মেলে না। মিললেও তা' তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না- কোনো দিন দু'বেলা খান, কোনো দিন বা এক বেলা- তিন বেলার খাদ্যসংস্থান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন অবস্থার মধ্যে চশমাটা ঠিক করা বা নতুন একটা চশমা কেনা দূরুহ ব্যাপার।

প্রায় তিন মাস পর- তখনও আক্কাস সাহেব বেকার- একদিন বিকেলে রোমেছা বেগমকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। দুপুরে গোসল করবার পর একটু সাজগোছ করেছেন তিনি- তোলা শাড়ী বের করে পরেছেন, চোখে কাঁজল দিয়েছেন, কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরেছেন, ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক ঘসেছেন। সব মিলিয়ে বেশ সুদর্শনা লাগছে তাঁকে।

বাড়ি ফেরার পর রোমেছা বেগমের সাজগোছের রহস্য কিছু ধরতে পারলেন না আক্কাস সাহেব। ধরার চেষ্টাও বোধহয় করলেন না তিনি। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। তারপর রোমেছা বেগম বললেন, 'এখন তুমি কি কোনো কাজে বের হবা?'

আক্কাস সাহেব বললেন, 'না। আজ আর বের হবো না।'

'তাহলে চলো আজ আমরা একটু শহর থেকে ঘুরে আসি।'

'কেনো?'

'আমার একটা জরুরি কাজ আছে।'

'কিন্তু-।'

'আমি জানি, তোমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। টাকা-পয়সা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না- আমার কাছে কিছু টাকা আছে। তুমি গত বছর যে মাটির ব্যাংকটা কিনে দিয়েছিলে, সেটা ভেঙেছি আর কিছু মুষ্টিচাল জমিয়েছিলাম, সেগুলো বিক্রি করেছি- সব মিলে বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। দয়া করে ধার চাবা না- চাইলেও আমি দেবো না।'

'কেনো কী কিনবা তুমি ওই টাকা দিয়ে?'

'প্রথমে তোমাকে নিয়ে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবো- চক্ষু ডাক্তার। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে যাবো চশমার দোকানে- সুন্দর দেখে একটা ফ্রেম কিনবো। ডাক্তারের দেয়া প্রেসক্রিশন অনুযায়ী সেই ফ্রেমে গ্লাস সেট করবো। ব্যাস, এপর্যন্তই- আর কিছু না।'

'তুমি বরং ওই টাকাগুলো আমাকে ধার দাও। এই মুহূর্তে আমার চোখ দেখানো লাগবে না।'

'চোখ দেখানো লাগবে না- মানে কী?'

'চোখ দেখানো লাগবে না মানে- চোখ দেখানো লাগবে না।'

'অবশ্যই লাগবে। সংসারে যতো অভাব-অনাটনই থাকুক না কেনো- অবশ্যই তোমার চোখ দেখানো লাগবে। যে চোখে এতো সমস্যা, আজ তিন মাস ধরে সেই চোখ খালি করে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো। ডাক্তার না দেখিয়ে আর ক'দিন এভাবে ঘুরে বেড়াও- এখন তো চোখ খালি করে ঘুরছো, তখন চোখের গর্তও খালি করে ঘুরে বেড়াতে পারবা। এখন বলো- তুমি কী যাবা?'

'চোখ আর ক'দিন পরে দেখালে হয় না?'

'না, হয় না। আচ্ছা যাও, চোখ তোমাকে দেখানো লাগবে না। তুমি অন্ধ হয়ে যাও- আমার কী? কিন্তু এই টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি নে। এই টাকা আমি ফকির-মিসকিনকে দান করে দেবো। তোমার জন্যেই যখন খরচ করতে পারবো না, তখন তোমার সংসারের জন্যেও এই টাকা আমি খরচ করবো না।'

রোমেছা বেগম এমনই- একটু পাগলাটে গোছের। নিজের প্ল্যান-প্রোগ্রামের প্রতি আক্কাস সাহেবের যদি কখনো অসম্মতি ধরা পড়ে- তাঁর মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। পরপরই কেমন উল্টোপাল্টা আচরণ করতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে আক্কাস সাহেবকেই শেষমেষ হার স্বীকার করতে হয়।

'ঠিক আছে। চলো, আর কি করা। কী ব্যাপার- বসে পড়লে কেনো? আহা কাপড় খুলছো কেনো?'

'কাপড় খুলছি কেনো বুঝতে পারছো না? কাপড় খুলছি তোমার সাথে এখন আমি ফষ্টিনষ্টি করবো, এই জন্যে।'

'ও, তাই নাকি? তাহলে তো মন্দ হয় না।'

'মন্দ হয় না- তাই না? আবার মিচমিচ করে হাসে! বেহায়ার মতো হা করে দাঁড়িয়ে আছো কেনো? বুঝতে পারছো না- আমি কাপড় বদল করবো? যাও, বাইরে যাও। বদ কোথাকার।'

'বাবা দরজা লাগিয়ে দিলে কেনো? দরজা খোলো।'

'আমার কাপড় বদলানো হয়ে গেলে দরজা এম্নিতে খুলে যাবে।'

'কাপড় বদলানো লাগবে না।'

'লাগবে। কারণ, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে না। তুমি অন্ধ হয়ে যাও- আমার কী?'

'আচ্ছা বাবা, তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি দুঃখিত। দরজা খোলো।'

অবাক হলে আমাদের চোখ কপালে ওঠে। ডাক্তারের রুম থেকে বের হবার পর চশমার প্রেসক্রিপশন দেখে রোমেছা বেগমের চোখ মাথার ব্রহ্মতালুতে উঠে গেলো- আক্কাস সাহেবের ডান চোখের পাওয়ার আগে যেখানে ছিলো মাত্র মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ, এখন সেখানে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ! পাঁচ গুণ অবনতি!

সবকিছু কমপ্লিট করে বাড়ি ফিরে রোমেছা বেগম বললেন, 'দেখেছো- যা ধারণা করেছিলাম তাই হয়েছে? কোথায় মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আর কোথায় মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ! মাত্র তিন মাসে এতো অবনতি! তোমার কথা শুনে যদি আরো দেরি করতাম, তাহলে কী ক্ষতিটাই না হয়ে যেতো!'

আক্কাস সাহেব বললেন, 'আচ্ছা, আমি বুঝি নে- জগতে এতো বিষয় থাকতে তুমি আমার চশমা নিয়ে এতো মাতামাতি করো কেনো? তুমি জানো, আমার দিনগুলো ভালো যাচ্ছে না- বললাম টাকাগুলো আমাকে ধার দাও, দিলে না। এতো অভাবের মধ্যে এতো টাকা খরচা করে চোখ দেখানো কি ঠিক হলো?'

রোমেছা বেগম বললেন, 'তুমি দেখো, আমাদের এই অভাব চিরদিন থাকবে না। কিন্তু, এই অভাবের দোহাই দিয়ে আজ তোমার চিকিৎসাটা যদি না করাতাম, আর আল্লাহ না করুক- তোমার চোখ দু'টো যদি নষ্ট হয়ে যেতো, তবে সেই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ কি কোনোভাবে হতো?'

আক্কাস সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, 'আচ্ছা, ধরো, কোনোভাবে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম- তোমার কি কোনো ক্ষতি হবে?'

রোমেছা বেগম রেগে গিয়ে বললেন, 'না, কোনো ক্ষতি হতো না। ক্ষতি হবে কেনো? আমার তো বরং লাভ হতো- তোমার হাত ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। দেশের লোকের কাছে আমার সঙ্গিতপ্রতীভাও বিকশিত হতো, গলা ছেড়ে গাইতে পারতাম-

দুইডা খয়রাত দিয়া যান

আমরা অন্ধ ইনসান।'

আমাদের সারা জীবনের আফসোস- আমরা যখন যা চাই, তখন তা' পাই নে। দূর্ভাগা আক্কাস সাহেবও চেয়েছিলেন- তাঁর 'ধরো কোনোভাবে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম' কথার জাবাবে রোমেছা বেগম রেগে যাবেন না- আবেগে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠবে। আস্তে করে সরে আসবেন আক্কাস সাহেবের অতি নিকটে। মাথাটা তাঁর বুকে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলা শুরু করবেন, যে কথা আবেগ ছাড়িয়ে রোমান্টিকতায় গিয়ে ঠেকবে, এবং একসময় লজ্জাশরমের বাঁধাও পার করে যাবে যে কথা-

"এই যে প্রায়ই আমি সাজসজ্জা করি- কপালে সুন্দর করে টিপ পরি, চোখে কাঁজল দিই, ঠোঁটে যত্ন করে লিপস্টিক লাগাই- এসব আমি কেনো করি? তোমাকে দেখাবো বলে করি। দিন শেষে বাড়ি ফিরে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ফট্ করে বলো- তোমাকে সুন্দর লাগছে তো! তুমি অন্ধ হয়ে গেলে এই মধুর কথাটা আমাকে কে শুনোবে? তুমি অন্ধ হয়ে গেলে প্রতি পূর্ণিমার রাতে আমাকে যে আগ্রহ করে, যত্ন করে জোছনা দেখাও, তোমার মতো অমন করে আমাকে জোছনা দেখাবে কে? তুমি অন্ধ হয়ে গেলে প্রায় রাতে আচমকা ঘুম ভাঙিয়ে গোঁফের তলায় ফাজিল ফাজিল হাঁসি নিয়ে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বুকের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ব্লাউজের বোতামে হাত রেখে কে বলবে- বৌ, আমি তোমাকে দেখবো।?"

স্মৃতি মাত্রই কষ্টদায়ক- হোক তা' সুখস্মৃতি, কিংবা দুঃখস্মৃতি।

উপরোক্ত ঘটনার মতো স্ত্রী বিষয়ক যতো স্মৃতি আক্কাস সাহেবের মস্তিষ্কে জমে আছে, তার বেশির ভাগই সুখস্মৃতি। তবুও এসব স্মৃতি মনে পড়লে তিনি কখনো সুখ কিংবা আনন্দ অনুভব করেন না; বরং ভেতরে ভেতরে কোথায় যেনো এক ধরণের ব্যথা বেজে চলে নিভৃতে। ক্রমশ সে ব্যথা দ্রবীভূত হতে থাকে ভেতরের সর্বময়। সবখানটায়।

মেঘে মেঘে সারা আকাশ ঢেকে দিয়ে যখন চারপাশ অন্ধকার করে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নেমে আসে- ফেলে আসা আনন্দ-বেদনার দিনগুলো আক্কাস সাহেবের স্মৃতিতে এসে বড্ডো ভিড় করে। দিনগুলোর জন্যে বড্ডো মন পোড়ে, কষ্ট হয়। বৃষ্টি বাড়ে, তাঁর কষ্টও বর্ধিত হয়। বৃষ্টি কমার সাথে সাথে কষ্টও কমতে থাকে একটু একটু করে। কে বলবে- বৃষ্টির সাথে আক্কাস সাহেবের পুরাতন আনন্দ-বেদনার দিনগুলোর কেনো এতো সখ্য?

এলোমেলো বাতাস থেমে গেছে। বৃষ্টিটাও কমে এসেছে অনেকটা- আপাতত ঝিরঝির করে ঝরে চলেছে তা'। কাছাকাছি কোথাও কোনো গাছের ডালে বসে একটি পাখি বিরামহীনভাবে ডেকে চলেছে- কু-উ-ক্। কু-উ-ক্।

অনেকগুলো বছর পর ডাকটা আবার নতুন করে শুনলেন আক্কাস সাহেব। ডাকটা শোনার পর তিনি কতোক্ষণ ধরে চেষ্টা করলেন পাখিটির নাম মনে করবার। মনে পড়লো না নামটা। কিন্তু, তিনি হাল ছাড়লেন না- চোখ বুজে চেষ্টা করতে থাকলেন। ইদানীং তাঁর যে কী হয়েছে- পুরনো কিছুই মনে পড়তে চায় না। এই যেমন গত সপ্তায় তুহিন নাম করে একটি ছেলে এলো তাঁর কাছে। পা ছুঁয়ে সালাম করে ছেলেটি বললো, স্যার, আপনি কী আমাকে চিনতে পেরেছেন?

আক্কাস সাহেব কিছুই বললেন না- ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। তাঁর তাকাবার ভাব দেখেই বোঝা গেলো- তিনি ছেলেটিকে চিনতে পারেন নি। অথচ, এই ছেলেটিই ছিলো তাঁর শিক্ষকজীবনে দেখা একমাত্র রেকর্ড- দরিদ্র ঘরের হলেও যে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত কখনো সেকেন্ড হয় নি। রোল নং ১ এর দখল ছিলো যার টানা দশ বছর। এবং যার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফরম ফিলাপের পুরো টাকাটা নিজের বেতন থেকে বহন করেছিলেন আক্কাস সাহেব নিজেই।

'দাদু!'

আক্কাস সাহেব চোখ খুললেন। দেখলেন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর নাতি রেহান। কাপটা এগিয়ে দিয়ে সে বললো, 'নাও দাদু, চা খাও।'

আক্কাস সাহেব অবাক হলেন। বললেন, 'চা?'

'হ্যাঁ। আম্মু বানিয়েছিলো আব্বুর জন্যে। আব্বু খাবে না। তাই আম্মু চা'টা তোমাকে দিতে বললো।'

কাপটা হাতে নিতে নিতে আক্কাস সাহেব বললেন, 'একটা পাখি ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস দাদু?'

রেহান দাদু'র কথা কানে করলো না, চলে গেলো কাপটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েই। কাপে চুমুক না দিয়ে আক্কাস সাহেব তাকিয়ে রইলেন নাতির চলে যাবার পথের দিকে। তাঁর দৃষ্টিটা ঝাপসা হতে লাগলো, চেহারাটা আস্তে আস্তে বিষাদে ভরে উঠতে থাকলো।

আক্কাস সাহেবের ঠিক মনে নেই- কতো দিন পরে তিনি এক কাপ চা পেলেন। আমাদের সবার প্রতিদিন চা-বিস্কিটের একটা রুটিন থাকে, আক্কাস সাহেবের তা' নেই। কে তাঁকে রুটিনমাফিক চা করে দেবে? আছে ছেলের বৌ। বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি তার কিসের এতো দায়? পরের মেয়ে হয়ে যেটুকু করে- সে-ই অনেক (?)। তবে এমন এক কাপ করে চা তিনি কদাচিৎ পেয়ে থাকেন- দেখা যায়, আসিফের জন্যে চা বানানো হয়েছে, অফিসযাত্রার তাড়াহুড়োয় চা মুখে না দিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো, তখন অপ্রত্যাশিতভাবেই চায়ের কাপটা আক্কাস সাহেবের হাতে এসে পড়ে।

নিয়মিত চা পানের অভ্যেসটা আক্কাস সাহেবেরও ছিলো একসময়। রোমেছা বেগম বেঁচে থাকতে কতো যত্ন করেই না তাঁকে চা করে দিতেন! চা'য়ে চুমুক দেবার আগ পর্যন্ত সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং প্রথম চুমুক দেবার পরপরই জিজ্ঞেস করতেন, 'চা কেমন হয়েছে?'

আক্কাস সাহেব কাপে দ্বিতীয়বারের মতো চুমুক দিয়ে বলতেন, 'চা চমৎকার হয়েছে। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো তো- তুমি নিজে চা খাও না, অথচ এতো সুন্দর করে চা বানাও কীভাবে?'

রোমেছা বেগম আক্কাস সাহেবের কথা অস্বীকার করে বলতেন, ‘সুন্দর করে চা বানাই না ছাই বানাই।’

রোমেছা বেগম সত্যি সত্যিই খুব সুন্দর করে চা বানাতেন। সেই চা খেতে খেতে একসময় আক্কাস সাহেবের নেশার মতো হয়ে গেলো। সকালে নাস্তার শেষে, এবং বিকেলে আসরের নামায শেষ করে এসে স্ত্রী’র হাতের এক কাপ চা না পেলে পুরো দিনটাই মাটি হয়ে গেলো বলে মনে হতো। আরো এক সময় স্ত্রী’র হাতের চা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিলো- স্কুলের পরীক্ষা শেষে রাত জেগে পরীক্ষার খাতা দেখা লাগতো। খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে এক কাপ করে চা না হলে চলতো না। রোমেছা বেগম’কে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে তাঁর সামনে এনে রাখতে হতো। সেই চা তিনি নিজে হাতে ঢেলে খেতেন না। রোমেছা বেগম’কে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে জেগে থাকতে হতো- কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাপ ভর্তি করে তিনি চা ঢেলে দিতেন। ‘বাবা!’

নূপুর কখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি খেয়াল করেন নি। এইমাত্র খেয়াল করলেন। আক্কাস সাহেব চা খান নি, হাতে নিয়ে বসে আছেন দেখে নূপুর একটু রাগান্বিত হলো। বললো, ‘চা’টা খাচ্ছেন না কেনো?’

আক্কাস সাহেব তার কথার জবাব দিলেন না- সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, ‘একটা পাখি ডাকছে, শুনতে পাচ্ছো মা?’

রাগী রাগী কন্ঠেই নূপুর বললো, ‘হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।’

‘তুমি কি বলতে পারবা- পাখিটা কী পাখি?’

‘না। আমি বলতে পারবো না। সারাদিন সংসারের কাজ করে কুল পাই নে- কোনটা কী পাখি তা’ জানার সময় কোথায় আমার? দাঁড়ান আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি- কোনটা কী পাখি ওকে জিজ্ঞেস করবেন।’

নূপুর চলে গেলো ভেতরে। পরপরই আক্কাস সাহেবের ছেলে- আসিফ দাঁত ব্রাশ করতে করতে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। তাকে দেখে আক্কাস সাহেবের চেহারাটা ঝলমল করে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আসিফ, একটা পাখি অনর্গল ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস?’

আসিফ হয়তো খেয়াল করলো না। তাই কোনো জবাবও পেলেন না আক্কাস সাহেব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘একটা পাখি অনর্গল ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস বাবা?’

আসিফ এবার বললো, ‘হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।’

‘পাখিটাকে খুব পরিচিত পাখি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পাখিটার নাম মনে করতে পারছি নে। তুই কি বলতে পারবি- কী পাখি ওটা?’

‘কোকিল মনে হয়।’

‘না না, কোকিল না। কোকিলের মতো করেই ডাকে। কিন্তু ওটা কোকিল না। অন্য কী যেনো একটা নাম পাখিটার।’

‘তাহলে বোধহয় শালিক।’

‘না না, শালিকও না। শালিকের ডাক এরকম না।’

‘তাহলে ঘুঘু হবে হয়তো।’

‘না না, ঘুঘুও না। ঘুঘু কখনো বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে এমন ডাকাডাকি করে না।’

আর কোনো পাখির নাম প্রস্তাব করলো না আসিফ। কিছুক্ষণ পর আক্কাস সাহেব বললেন, ‘আচ্ছা, কম্প্যুটার দিয়ে ইন্টার্নেটের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দিয়ে কিভাবে কিভাবে যেনো তুই সব তথ্য বের করে ফেলিস। ইন্টার্নেটের মাধ্যমে পাখিটার নাম কি কোনোভাবে বের করা যাবে? ধর পাখির ডাকটা অর্থাৎ ‘কু-উ-ক্, কু-উ-ক্’ আক্ষরিকভাবে লিখে গুগলে সার্চ দিলি, তাহলে এই ডাকটা কোন পাখির ডাক, সেটা বের হয়ে আসবে না?’

আসিফ নিরুত্তর- কিছুই বললো না।

আক্কাস সাহেব নাছোড় বান্দার মতো বললেন, ‘ইন্টার্নেটের মাধ্যমে পাখিটার নাম কি কোনোভাবে বের করা যাবে বাবা? যেভাবে বললাম সেভাবে না হোক, অন্য কোনোভাবে?’

ঠিক কী কারণে বোঝা গেলো না- বাবার প্রতি হঠাৎই বিরক্ত হয়ে উঠলো আসিফ। খেঁকিয়ে উঠে বললো, ‘তুমি যা বিরক্ত করো না বাবা! যে পাখি ডাকছে ডাকুক গে। তোমার কী? ওটার নাম জেনে তোমার কাজই বা কী? ডাকছে, বসে বসে ডাকটাই শোনো। নাম জানা লাগবে না। যত্তোসব!’

ঠিক এই মুহূর্তে, আক্কাস সাহেবের ভেতরটাতে কি ঘটে গেলো- আমরা দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম তাঁর ঝলমল করে ওঠা চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকলো আস্তে আস্তে। তাঁর সব ক্ষণের কাঁপন লাগা শরীর নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, টলমল পায়ে এগিয়ে গেলেন গ্রিলের কাছে। দু’হাত দিয়ে শক্ত করে গ্রিলের একটা পাত ধরে ঝাপসা দৃষ্টিটা তিনি ছড়িয়ে দিলেন বাইরে।

পাখিটির বিরামহীন ডাক থেমে গেছে ততোক্ষণে। পূনরায় ধরে এসেছে বৃষ্টিটা। ধূসর হয়ে এসেছে সমস্ত চরাচর। একটুখানি দূরবর্তী দৃশ্যও ধোয়াটে, অস্পষ্ট। সুস্পষ্ট কেবল বৃষ্টির অবিরাম শব্দ। ঝমঝম। ঝমঝম। ঝমঝম।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

একটি ডায়েরি, এক খন্ড জীবন

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(পাঠক, ঘটনার এপর্যায়ে আমাদের গল্পের স্বার্থে আমরা বর্তমান সময়ে স্থির হয়ে থাকবো না- আমরা চলে যাবো ভবিষ্যতে, সুদূর ভবিষ্যতের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে)

১৬ জুলাই ২০৪৫। রোববার।

আজকের এই কৃত্রিমতার দিনে ব্যাপারটা বোধকরি অলৌকিক- অশীতিপর আসিফ সাহেব এখনো অনেক শক্ত-সমর্থ। সর্বক্ষণ শরীর কাঁপলেও তিনি নিজে নিজে হাঁটতে পারেন লাঠি ভর দিয়ে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিতে পারেন সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে। কানে মোটামুটি ভালো শোনেন। শুধু চোখ দু'টো একটু বেশি রকমের ঘোলাটে- চশমার গ্লাস ভালো করে মুছে নিয়ে চোখে দিলেও সবকিছুই ঝাপসা, নিকট-দূর সবই অস্পষ্ট।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

২০১৩ সালের জুন মাসের এমনই এক বৃষ্টিদিনে মারা যান আসিফ সাহেবের বাবা মুহাম্মদ আক্কাস আলী। এবং একই বছর জুলাই মাসের আরেক বৃষ্টিদিনে বাবা'র পুরনো ট্রাঙ্ক ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আসিফ সাহেব অন্য অন্য জিনিসপত্র ছাড়াও পেয়ে যান একটা ডায়েরি। আমরা যারা ডায়েরি লিখি- আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ইম্পর্টেন্ট ঘটনাবলি তারিখের ক্রমানুসারে লিখে রাখি আমরা নিয়মিত। কিন্তু আক্কাস সাহেবের ডায়েরিটা খুলে দেখা গেলো প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে কিছু লেখা। এবং সেই একাধিক পৃষ্ঠাজোড়া লেখা কেবল একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। একেক করে ডায়েরিটার পৃষ্ঠা উল্টোতে থাকলে লিখিত দ্বিতীয় কোনো তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না, কোনো লেখাও না। পৃষ্ঠা উল্টোতে উল্টোতে কেবল প্রথম পৃষ্ঠাতেই ফিরে আসতে হয় বারবার।

আসিফ সাহেব সেদিনই প্রথম পড়লেন ডায়েরিটা। একবার না, কয়েকবার পড়লেন। সেই শুরু। তারপর ডায়েরিরটা থেকে চোখ সরাতে পারেন নি তিনি আজও- যখনই মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় সমস্ত আকাশ, অথবা বৃষ্টি নেমে আসে আকাশ ভেঙে, কিংবা টিপির টিপির করে বৃষ্টিপাত চলে দিনভর- আসিফ সাহেবকে দেখা যায় বারান্দার চেয়ারে বসে আছেন, দু'হাতের উপর মেলে ধরা একটা পুরনো ডায়েরি, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ডায়েরির পাতায়। ঝাপসা কিংবা অস্পষ্ট দৃষ্টিতে কিছু পড়তে না পারলেও সমস্যা হয় না- সুদীর্ঘ ৩২ বছরের এমন অসংখ্য বৃষ্টির দিনে অজস্রবার পঠিত ডায়েরিটা অন্ধচোখেও পড়া যায় নির্ভুল।

বৃষ্টিটা ঝরেই চলেছে আগের মতো। বারান্দার চেয়ারে বসে আছেন আসিফ সাহেব। বাবা'র পুরনো ডায়েরিটা দু'হাতের উপর মেলে ধরে আছেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সে ডায়েরির পাতায়।

সন: ১৯৬৮ ইং

মাস: জুলাই। তাং: ১৯। দিন: শুক্রবার

আমি মুহাম্মদ আক্কাস আলী। পিতা- মুহাম্মদ ওমর আলী। গ্রাম- তেঘরিয়া। ডাকঘরঃ গাজীর দরগাহ। থানা- কোতোয়ালি। জেলা- যশোহর।

আজ ছিলো আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। প্রত্যেক সপ্তাহের আমার এই দিনটা আসিফের জন্যে বরাদ্দ থাকে। আসিফ, আমার একমাত্র ছেলে, বয়স ৩ বছর। সারা সপ্তাহ আমি ওকে একদমই সময় দিতে পারি নে। ওর সাথে খেলা করা হয় না। ওকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয় না। কোনো রেস্তোরায় বসে ওর প্রিয় কোনো খাবার কিনে খাওয়ানো হয় না। প্রতি সপ্তাহে এই দিনটা এলে ওর মনে খুশি আর ধরে না। কারণ, আজ সারা দিন সে বাবার সাথে ঘুরবে, আনন্দ করবে। পুরোপুরি একটা দিন বাবাকে নিজের মতো করে পাওয়া- একজন শিশুর নিকট এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

কিন্তু, সমস্যা করলো বৃষ্টি। প্রস্তুতি শেষ করে আমরা যখন বের হবো- অঝিল ঝমঝম করে সে কী বৃষ্টি! ইংরেজিতে যাকে বলে 'Cats and Dogs'- মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি থামলো দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। সূর্যের মুখ আর দেখা গেলো না, তবে সারা দিনের গুমোট গরমটা সরে গিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া দিতে লাগলো।

বিকেল বেলার দিকে আসিফকে নিয়ে আমি একটু বের হলাম। ছেলেটা মনমরা হয়ে ছিলো, ওর মুখে এবার হাসি ফুটলো। দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করলো না। কাছাকাছি একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। পার্কটা বেশ নির্জন, বৃষ্টির কারণেই বোধহয় লোকজনের সমাগম নেই। পার্কের এক কোণে একটা ভ্রাম্যমান আইচক্রীমের গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িটা থেকে দুইটা আইচক্রীম কিনে এনে ওর হাতে দিয়ে বললাম, আজ যদি আর কোথাও না যাই, তাহলে কি তুমি রাগ করবা, বাবা? ও মাথা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে বললো, না।

আজকের খবরের কাগজটা তখনো শেষ করা হয় নি। বেঞ্চে হেলান দিয়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরলাম। আসিফ আমার পাশে বসে চুপচাপ আইচক্রীম খাচ্ছিলো। হঠাৎ করে ও আমাকে ঝাঁকি দিয়ে বললো, বাবা, ও বাবা!

আমি খবরের কাগজটা নামিয়ে বললাম, কী? আর কিছু খাবা তুমি? আর কিছু এনে দেবো?

ও বললো, না।

আমি বললাম, তাহলে কী?

ও প্রশ্ন করে বললো, কু-উ-ক্ কু-উ-ক্ করে ওইটা কী ডাকছে, বাবা?

আমি হঠাৎ করে খেয়াল করলাম, একটা পাখি কু-উ-ক্, কু-উ-ক্ করে ডেকে চলেছে অনর্গল। এই ডাকটা সচরাচর শোনা যায় না। কেবল বর্ষাকাল এলেই ডাকটা শোনা যায়। একটানা বৃষ্টি হবার পর যখন নিরব হয়ে আসে চারিপাশ, অথবা, যখন ঝিরঝির করে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ে, তখন এই পাখিটা বিরতীহীনভাবে ডাকতে থাকে। ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে একসময় চুপ হয়ে যায়। খানিক ক্ষণ পরে হঠাৎ করে আবার ডাকা শুরু করে, আবার চুপ- এভাবে ডাকাডাকি চলতে থাকে ক্রমাগত। পাখিটার নাম হচ্ছে- ডাহুক।

আসিফও, এম্নিতে তেমন কথা বলে না, কিন্তু, যখন প্রশ্ন করা শুরু করে, তখন একটার পর একটা প্রশ্ন করতেই থাকে। মাঝেমধ্যে এমনও হয়- প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সত্ত্বেও একই প্রশ্ন তিন-চারবারও করে। অনেক ধৈর্য্য নিয়ে সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই মুহূর্তে শুরু হয়েছে ওর সেই প্রশ্নবান। ধৈর্য্য সহকারে আমাকে সে প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে হবে।

আমি: ওইটা একটা পাখি, বাবা। ডাহুক পাখি।

আসিফ: কিন্তু, পাখিটাকে তো কোথাও দেখছি নে, বাবা। পাখিটা কোথায় বসে ডাকছে?

আমি: হয়তো কোনো গাছের পাতার ফাঁকে বসে ডাকছে- এইজন্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

আসিফ: কী বললে, বাবা- পাখিটার নাম ডাহুক?

আমি: হ্যাঁ, বাবা- ডাহুক। ডাহুক পাখি।

আসিফ: বাবা, কাল রাতে আমি ১০টা পাখির নাম শিখেছি, ডাহুক নামটা তো তার ভেতর নেই, বাবা। এটা মনে হয় চড়–ই পাখি, বাবা।

আমি: না বাবা, এটা চড়–ই পাখি না- এটা ডাহুক পাখি।

আসিফ: চড়–ই পাখি না? তাহলে এটা শালিক পাখি।

আমি: না, বাবা, এটা শালিক পাখিও না- এটা ডাহুক পাখি।

আসিফ: শালিক না? তাহলে এটা মনে হয় টিয়া পাখি।

আমি: না, বাবা, এটা টিয়া পাখিও না- এটা ডাহুক পাখি।

আসিফ: টিয়া পাখি না? তাহলে বোধহয় এটা ময়না পাখি

আমি: না, বাবা, এটা ময়না পাখিও না- এটা ডাহুক পাখি।

আসিফ: কিন্তু, বাবা, কাল রাতে আমি ১০টা পাখির নাম শিখেছি, ডাহুক নামটা তো তার ভেতর নেই, বাবা। এটা মনে হয় দোয়েল পাখি, বাবা।

আমার বিরক্ত হওয়া সংগত ছিলো। কিন্তু, কথোপকথনের ঠিক এই পর্যায়ে আমার মনটা মায়ায় ভরে গেলো। খুব আদর করতে ইচ্ছে করলো আসিফকে। আমি খবরের কাগজটা নামিয়ে একপাশে রেখে দিলাম। আস্তে করে আসিফকে কোলে তুলে নিলাম। ওর মাথাটা নিয়ে আলতো করে আমার বুকে চেপে ধরে বললাম- এটা দোয়েল পাখিও না, বাবা- এটা ডাহুক পাখি। তুমি যে ১০টা পাখির নাম শিখেছো, সেই ১০টা পাখি ছাড়াও আমাদের দেশে আরো অনেক পাখি আছে। সেই অনেক পাখির মধ্যে এই ডাহুক নামের পাখিটাও আছে। এটা চড়ুই না, এটা শালিক না, এটা টিয়া না, এটা ময়না না, এটা দোয়েলও না। এটা ডাহুক। এই পাখিটার নাম- ডাহুক। বুঝেছো, বাবা? এটা ডাহুক পাখি।

আসিফ আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়েই বাধ্য ছেলের মতো বললো, হ্যাঁ, বাবা, বুঝেছি। এটা ডাহুক পাখি। ১১ নম্বর পাখি।

ঠিক এই মুহূর্তে, আমার ইচ্ছে করলো- আমার বাচ্চাটাকে আরো একটু আদর করি। ওর ছোট্টো মাথাটা আরো কঠিন করে চেপে ধরি, এমনভাবে চেপে ধরি- যেনো বুকের পাঁজর ভেঙে মাথাটা একেবারে আমার হৃৎপিন্ডে গিয়ে ঠেকে।

ডায়েরিটা ক্লোজ করে আসিফ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, টলমল পায়ে এগিয়ে গেলেন গ্রিলের কাছে। দু'হাত দিয়ে শক্ত করে গ্রিলের একটা পাত ধরে ঝাপসা দৃষ্টিটা তিনি ছড়িয়ে দিলেন বাইরে।

ততোক্ষণে ধরে এসেছে বৃষ্টিটা। ধূসর হয়ে এসেছে সমস্ত চরাচর। একটুখানি দূরবর্তী দৃশ্যও অস্পষ্ট। সুস্পষ্ট কেবল বৃষ্টির অবিরাম শব্দ। ঝমঝম। ঝমঝম। ঝমঝম।

* * *

কবিতা

হে ঝাঁকড়া চুলের কবি

আবদুল্লাহ আল নোমান দোলন

তুমি গরীবের পান্তা ভাতে নুন।
তুমি শোষিতের বিদ্রোহী আগুন।
তোমার কণ্ঠে সাম্যের গান।
তুমি সকলের ভগবান।

হে ঝাঁকড়া চুলের কবি।
তুমি গ্রাম বাংলার মেঠো পথের ছবি।
তুমি রাখালের গাছের ছায়ার বাঁশি।
তুমি শিশুর ঘুম পাড়ানো শান্ত নিশি।

তুমি প্রেমের বাতায়ন।
তুমি মরু হৃদে প্রেম রূপায়ন।
তুমি প্রেমিকযুগলের কলকলে ধ্বনি।
তুমি প্রণয়ের মধ্যমণি।

হে সমাজ সংস্কারক কবি।
হে পথভোলার আলোর পথের নবী।
যত অনাচার যত ভ্রান্তি।
তোমার কবিতা গরম খুন্তি।
যেখানেই হয়েছে কোনো অন্যায়।
তুমি এসেছ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের বন্যায়।

কতকাল হয়েছে তুমি ছেড়েছ দেহঘর।
তবু তুমি অন্তরে অমর।
হে ঝাঁকড়া চুলের কবি;হে মহান।
তোমার মৃত্যু নেই;তুমি অনির্বাণ।

কবিতা

প্রেম অনুভূতি...

আহমেদ নিরব

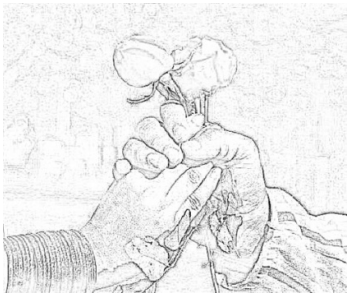

তুমি এক প্রচণ্ড মায়াবী নীল
সাগরের অথৈ জল, নদীর স্রোত
তুমি সাদা মেঘের এক অসম্ভব ভাললাগা।
আমি বিশ্বাসী, আমার এ নিস্পাপ প্রাণ
অনিদ্রায় কাতর, অপেক্ষমান, পিপাসিত।
তুমি বৃষ্টিতে ভেজা এক নতুন
সুগন্ধি রজনীগন্ধা।
আমি সাহসী, আমার এ চাওয়া
ধরণীর এক অকৃত্রিম প্রকাশ।

তুমি রোদেলা দুপুরের ক্লান্ত দেহ
কম্পিত অধরে তুমি মাতাল
আমি যুদ্ধফেরত অনড় এক বীর।
নিরিবিলি সন্ধ্যায় আকাশের বুকে, তুমি
এক সন্ধ্যাতারা যা আমার অনেক ভাললাগে
তুমি সাহিত্যের এক অপঠিত অধ্যায়।
আমি ধ্যানরত, বিশ্বাস কর
ভালবাসি শুধু তোমায়।

অনুবাদ

বৃটিশ কমন আরবান লিজেন্ড

নোমান রহমান

সেটা ছিল অক্টোবরের এক কনকনে ঠান্ডা রাত। লন্ডনে প্রায়ই এ সময় বৃষ্টি হয় আর বৃষ্টির কারণে ঠান্ডার প্রকোপটা বেড়ে যায় অনেকগুণ।

জর্জ আর মেরি তাদের পুরনো আউডি গাড়িটা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। চেস্টশায়ারের এ অঞ্চলটি তেমন জনবহুল না হওয়ায় এরকম দুর্যোগময় রাতে রাস্তা একেবারে সুনসান। গাড়ির ছাদে বৃষ্টির ধারাপাতের সংগীতময় ছন্দ আর গাড়ির ভিতরে হতে থাকা স্থানীয় বেতারে প্রচারিত ধ্রুপদী সংগীতের সুর একাকার হয়ে এক অন্যরকম গীতল পরিবেশ তৈরি করেছে। জর্জ গাড়ি চালাচ্ছিল নিশ্চিন্তে আর মেরি চোখ বন্ধ করে উপভোগ করছিল সে মদির পরিবেশটি।

তারা হ্যারিসনের বাড়ি গিয়েছিল। তাদের বন্ধু হ্যারিসনের বড় মেয়ে লিসার বাগদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাদের বাড়ি চেস্টশায়ারেই মেরিদের বাড়ি থেকে মাইল সাতেক দূরে। এখনও পাঁচ মাইল মতো বাকি বাড়িতে পৌঁছতে এমন সময় রেডিওর গানে ছেদ পড়লো।

স্থানীয় বেতারগুলো জনস্বার্থে জরুরী ঘোষণা প্রচার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যান চলাচল নিরাপদ রাখার জন্য রাস্তার অবস্থা, সাবধানতা, যে কোন বিপদবার্তা ইত্যাদি প্রচার করা হয় এসব রেডিওতে।

মেরির চোখ খুলে গেল। কান খাড়া করে এ মুহূর্তে প্রচারিত ঘোষণাটা শুনছে দু'জন। বেতারে বলছে, 'চেস্টশায়ার পুলিশ জনসাধারণের জন্য একটি জরুরী বিপদবার্তা জারি করেছে।' বাক্যটি ঘোষক দুইবার বললো। 'আজ বিকেলে কলফোর্ড মেন্টাল হসপিটাল থেকে একজন মানসিক রোগী পালিয়ে যাওয়ার পর এ বিপদবার্তাটি জারি করা হয়েছে। পলাতক রোগীর জন ডাউনি একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ ভয়ানক প্রকৃতির খুনী। গত দু'বছর আগে ধরা পড়ার আগে সে ছয়জন মানুষকে খুন করেছে। ডাউনি দেখতে বিশালকায়, প্রচন্ড শক্তিশালী এবং খুবই ভয়ংকর। চেস্টারশায়ার এলাকার জনগণকে সাবধান করা যাচ্ছে যে, তারা যেন বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ রাখে এবং যে কোন ধরণের অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সাথে সাথে পুলিশকে জানায়।'

মেরি আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'একটা উন্মাদ খুনী আশেপাশেই আছে! এটাতো ভয়ঙ্কর, জর্জ।'

"এ নিয়ে ভেবো না। আমরা তো বাড়ির কাছাকাছিই চলে এসেছি।" স্বামী অভয় দেয়। "আমি ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে।" মেরি একটু অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

জর্জ বলে, "গাড়ির কার্বুরেটরের সেই পুরনো সমস্যা মনে হয় আবার দেখা দিচ্ছে। যে কোন সময় গাড়িটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এরকম হলে আমাদের কোথাও থেকে হ্যারিসনকে খবর দিতে হবে। হয়তো তার বাড়িতেই আবার ফিরে গিয়ে গাড়ি ঠিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

কথাগলো বলতে বলতেই গাড়ি ক্রমশঃ ধীরগতিতে নেমে আসছিল। জর্জ এক্সেলেরেটরে চাপ বাড়াল কিন্তু ইঞ্জিনটা কাশির মতো কয়েকটি শব্দ করে শেষ পর্ন্তেক সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। জর্জ ঠেলে গাড়িটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে একটা বড় গাছের নীচে এনে রাখলো।

'যাহ্! এখন এ বৃষ্টির মাঝে আমাদের হাঁটতে হবে।' রাগতঃ স্বরে বললো জর্জ।

'কিন্তু হাঁটলে তো এক ঘন্টার বেশি লাগবে। তার উপর এই বৃষ্টির মাঝে আমার এত দামী জুতো, জামা সব তো পুরো নষ্ট হয়ে যাবে।' শঙ্কিত মেরি বললো।

জর্জ একটু চিন্তা করে বললো, 'তাহলে বরং এক কাজ করি। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো। আমি হ্যারিসনকে ফোন করি কাছাকাছি কোথাও থেকে। ওরা নিশ্চয়ই কোনভাবে আমাদের পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।'

'কী বলছো জর্জ?' আতঙ্কিত মেরি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। 'রেডিওতে কী বলেছে তুমি শুনোনি? একটা পাগল ভয়ানক খুনী এখানেই কোথাও আছে। এ অবস্থায় তুমি আমাকে একা রেখে যেতে পারোনা!'

'একটা কিছু তো করতে হবে সোনা।' জর্জ বুঝায় মেরিকে, 'তুমি গাড়ির সব কটা দরজা বন্ধ করে পিছনের সীটের নীচে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে। আমি ফিরে দরজায় ঠিক তিনবার টোকা দিলে দরজা খুলবে।'

'তিনবার টোকা না শুনলে সাবধান দরজা খুলবে না।' মেরিকে আবার সাবধান করে বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে অন্ধকারে মিশে গেলো জর্জ্।

মেরি দ্রুত গাড়ির সবকটা দরজা ঠিকমতো বন্ধ করে জর্জের কথামতো পেছনের সীটের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। সে খুব শক্ত মনের মেয়ে হলেও পরিস্থিতির কারণে বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তার স্বামী ফিরতে সময় নেবে সেরকমই ভেবেছিল মেরি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির ছাদে কিছু অদ্ভূত শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো সে। চরম ভীতি নিয়ে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে তার স্বামীর ফেরার অপেক্ষা করতে থাকলো।

আরো মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মেরি তার কাঙ্খিত তিনটি টোকা দরজায় শুনতে পেলো। কিন্তু গাড়ির ছাদেও একইভাবে টোকা কে দিচ্ছে? তার স্বামীরতো দরজায় কেবল তিনটি টোকা দেয়ার কথা। সে কি দরজা খুলবে? ছাদের শব্দটা বন্ধ হয়নি।এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছুর শব্দ।

দ্বিধান্বিত মেরির ভয় আর উৎকন্ঠা সমস্ত শরীর জুড়ে কাঁপুনির সৃষ্টি করলেও সে নিজেকে কঠিনভাবে গাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখে। ছাদের সে শব্দটা কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে আবার শুরু হয়েছে। তবে এবার একটি নির্দিষ্ট তালে। প্রতিবার শব্দের পর একই বিরতি দিয়ে পরের শব্দটা – যেন কিছু ছাদটাকে ঘষে দিয়ে চলে যায়, আবার আসে, আবার ঘষে দিয়ে চলে যায়।

কয়েক ঘন্টা পার হলো। কনকনে শীতের রাতে কম্বলের নীচে মেরি ঘেমে ভিজে জবজবে। ইতোমধ্যে সূর্য্ উঠেছে। গাড়ির ছাদের সে শব্দটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। একবারের জন্যও থামেনি। মেরি ভেবে পাচ্ছেনা জর্জ্ কোথায় গেলো? কেন সে সারা রাতের মধ্যেও ফিরলো না?

হঠাৎ মেরি রাস্তায় তিন চারটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায়। গাড়িগুলো খুব দ্রুতগতিতে এসে তার গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়েছে টের পেলো। যাক্! শেষ পর্ন্তধ্ কেউ আসলো বোধহয়-এরকম একটা স্বস্তিকর ভাবনা নিয়ে মেরি ত্বরিৎ উঠে বসে জানালা দিয়ে তাকায়।

গাড়িগুলো পুলিশের। চারটে গাড়ি থেকে ঝপ ঝপ করে পুলিশরা নেমে সবাই মেরির গাড়ির দিকে দৌঁড়ে আসে। ততক্ষণে মেরি দরজা খুলেছে। একজন পুলিশ তার হাত ধরে। বলে, 'গাড়ি থেকে নেমে ঐ পুলিশ ভ্যানের দিকে চলুন, মিস্। আপনি এখন নিরাপদ। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চলুন। দৃষ্টিটা আমাদের গাড়ির উপর রেখে হাঁটুন। দয়া করে পিছনে তাকাবেন না।'

পুলিশটির কথায় কী যেন ছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র আগে রাতভর ভয়ে উৎকন্ঠায় কাটানো মেরি ভয়মুক্ত হয়েছিল। পুলিশটির কথায় আবার যেন সে ভয়, উৎকন্ঠা কয়েকগুণ বেশি হয়ে ফিরে এলো। আর মাত্র দশ গজের মধ্যে পুলিশের গাড়ি যাতে তাকে উঠতে বলছে ওরা। সে কোনভাবেই নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না।

মেরি থামলো, ঘুরলো, পিছনে তাদের পুরনো আউডি গাড়িটার দিকে তাকালো।

জর্জ্ ঝুলছে। গাড়িটা যে গাছের নীচে ছিল সে গাছটার একটা ডাল থেকে নেমে আসা রশি পেছিয়ে আছে জর্জের গলায়। বাতাসের দোলায় পেন্ডুলামের মতো তার শরীরটা দুলছে। আর জর্জের পা গাড়ির ছাদটাকে ঘষে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, আবার ঘষে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

মেরি তারপর আর কিছু দেখে না; তার চোখ ঝাপসা হতে হতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত।

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

পরিধিতে প্রতিবিম্ব

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান *লেখালেখি আমার শুধু শখই না, মনে হয় যেন রক্তের টান। বিশেষ করে বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি। বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি আমার কাছে রঙ্গিন ঘুড়ির মত। কল্পনার সীমানা পেরিয়ে যে ছুটে চলে মহাজগতিক পরিমণ্ডলে। এ যেন সময়টাকে স্থির করে দিয়ে এর আদি-অন্ত দেখার মত। তারপরও এ ঘুড়ি যেমন ইচ্ছে তেমন উড়তে পারে না, সুতোয়ে টান পড়ে বলে। এ টান যুক্তির টান। যৌক্তিক কল্পনা বললে ভুল হয় না। তারপরও নিজ ইচ্ছেয়ে সুতোটাকে ছিঁড়ে দিতে ভাল লাগে মাঝে মাঝে। আমি যেমন নিজে স্বপ্ন দেখি তেমনি সবাইকে স্বপ্ন দেখাতে চাই। অঞ্জন দত্তের ভাষায় বলতে হয়, 'মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যখন-তখন কান্না পায়, তবু স্বপ্ন দেখার এই প্রবল ইচ্ছাটা কিছুতেই মরবার নয়।' কনফুসিয়াসের এই লাইন টা আমাকে খুব টানে ... journey of a thousand miles begins with a single step। আমার প্রথম লেখা প্রকাশ হয় ১৯৯৬ সালে আধুনালুপ্ত বিজ্ঞান সাপ্তাহিক আহরহ তে।*

'আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি, এবারের মিশনের উপরই তোমার কমিশন নির্ভর করবে।' মহামান্য কিরিজা মেপে মেপে কথা বলছিলেন। 'প্রতিটি মানুষকেই তার জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে মানবিক আবেগকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কর্তব্যকেই বেছে নিতে হয়।' অত্যন্ত ধীরগতিতে মহামান্য কিরিজা মানুষের কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে য়োমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। সবশেষে তিনি বললেন 'আশা করি তুমি তোমার মিশন ভালোভাবেই শেষ করতে পারবে।' তিনি অত্যন্ত শীতল দৃষ্টিতে য়োমার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন।

গ্রানাইটের আসন ছেড়ে দিয়ে য়োমা উঠে দাঁড়াল। 'আমার অর্ধযুগের কর্মজীবনের ইতিহাসে ব্যর্থতার নজির নেই মহামান্য কিরিজা।' বলেই অত্যন্ত প্রাচীন ভঙ্গীতে দ্রুততার সাথে হাত তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, 'আইনত ওদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।' তারপর ক্ষীপ্রতার সাথে উল্টোদিকে ঘুড়ে সামনের লম্বা কড়িডোরের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

য়োমা তার ক্ষুদ্র কর্মজীবনে বহু মিশন সফলভাবে শেষ করেছে। আন্তঃনক্ষত্রীয় মহাকাশযানের দলপতি হতে শুরু করে রসায়ন শাস্ত্রের বড় বড় দুটি আকিস্কার, পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিস্কার কুরু ইঞ্জিন আর গনিত শাস্ত্রেও য়োমা সমীকরণ তৈরী করে সে মানুষের ইতিহাস নতুন করে লিখতে বাধ্য করেছে। তবুও এবারের মিশনটির ব্যাপারে মহামান্য কিরিজা য়োমার উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছেন না।

য়োমা এরই মধ্যে দরজার কাছে এসে পড়েছে। তার চোখ জ্বল জ্বল করছে। এ দিনটির জন্য সে প্রতিটি মূহুর্ত হিসেব করে খরচ করেছে। কখনও কোন ভুল করেনি। মহামান্য কিরিজা তার বয়বৃদ্ধ দৃষ্টিতে য়োমার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যদি য়োমার চোখ দেখতে পেতেন তাহলে সাফল্যের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হতে পারতেন। কারন য়োমা নামের অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটির চোখে মুখে এখন কোন ভালবাসার আভাই নেই, সেখানে শুধুই ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা!

২

শহরতলীর এ জায়গাটি বেশ নীরব। সবেমাত্র সন্ধ্যে নেমেছে। য়োমা লম্বা হাইওয়ের উপর দাঁড়িয়ে দূরে একটি বাড়ি দেখছে। আর মাত্র কয়েকঘন্টার মধ্যে সে তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজটির সুন্দর পরিসমাপ্তির সঠিক পরিকল্পনা করে ফেলেছে।

'তাহলে রওনা হওয়া যাক।' য়োমা নিজেকে বলল। ধীরপায়ে দূরে আবছা হয়ে যাওয়া একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেখানে বাস করে এমন একজন, যে একসময় য়োমাকে প্রচন্ড ভালবাসত, যাকে মেরে ফেলতে পারার উপর য়োমার কমিশন প্রাপ্তি নির্ভর করছে।

দরজার সামতে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। য়োমা বিচক্ষণতার সাথে চারদিকে খেয়াল রেখে ভিতরে পা দিল। ভিতরে একজন মানুষ প্রাচীন চতুস্পদ প্রাণী নিয়ে খেলা করছে। 'ইরিতাশ।' য়োমা ডাক দিল।

ইরিতাশ হাঁটুগেড়ে বসে খেলছিল। ডাক শুনেই তাকাল এবং জীবনের সবচেয়ে বড় অবাক হল। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চতুষ্পদ প্রাণীটি য়োমার পায়ের কাছে মুখ ঘষতে লাগল। য়োমাও হাঁটুগেড়ে বসে প্রাণীটির পিঠের লোমশ শরীরের উপর হাত বুলিয়ে বলল 'কি ব্যাপার, অবাক হচ্ছ?'

'আমি ভুল দেখছি নাতো?' ইরিতাশ সত্যিই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'অবশ্যই না।'

তারপর বেশ খানিকটা সময় কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। পরিবেশ হালকা হলে য়োমা বলল, 'জানো আমি তোমাকে কত খুঁজেছি, ইন্টার গ্যালাকটিক ওয়েব নিউজে কতবার তোমাকে আহবান করেছি, কিন্তু পাইনি। কী হয়েছিল তোমার?' য়োমা মিথ্যে আবেগ মিলিয়ে তার মিশনের প্রাথমিক পর্ব শুরু করল।

'তুমি ঠিক বলছ? সত্যি তুমি আজও আমাকে মনে রেখেছ?'

'হ্যাঁ ইরিতাশ সত্যি!' স্থির গলায় য়োমা মিথ্যা কথা বলতে শুরু করল।

এরই মধ্যে ইরিতাশ উঠে য়োমার কাছে চলে এল। দুচোখ ভরে সে তার য়োমাকে দেখতে লাগল, খুঁজতে লাগল হারানো ভালবাসা।

'তুমি খবর দিয়েছিলে আমার সাথে সরাসরি কথা বলবে বলনি কেন? আর কেনই বা তুমি সেদিন আসনি? আমি তোমার জন্য কত সময় ধরে অপেক্ষা করেছিলাম, জানো?' য়োমা তার চোখেমুখে পরিস্কার ভালবাসার সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল, যুদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'ভয়ে, সন্দেহে। যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও।' ইরিতাশ সত্যি কথাটিই বলল।

য়োমা তার আশ্চর্য নরম কোমল হাত ইরিতাশের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইরিতাশ গভীর আগ্রহ নিয়ে য়োমার হাতদুটি চেপে ধরল। তার হাত কাঁপছে, মনে হচ্ছে কিছুক্ষনের মধ্যেই অবশ হয়ে যাবে। বহুদিন আগেও এই মেয়েটিকে দেখলে তার একই রকম অনুভূতি হতো। তার বুকের গভীরে একটি সুতীব্র অনুভূতির শুধুমাত্র একজনের জন্যেই রয়েছে। যে অনুভূতির জন্য মানুষ বেঁচে থাকে, হয়তো অপেক্ষাও করে। কেউ জানতে পাওে, কেউ হয়তো পারে না। তুবও কি ভালবাসা থেমে থাকে?

'তোমার বাড়িতে এই যে চতুস্পদ প্রাণী, কোথায় পেয়েছ?' একটি উত্তেজক পানীয় পান করার পর য়োমা ইরিতাশের সাথে কথা বলছিল। এ বাড়িতে সে পা দিয়েছে প্রায় দু'ঘন্টা হলে।

'কোথা থেকে আবার? আমি নিজে তৈরী করেছি।'

'তৈরী করেছ কীভাবে?'

'কেন? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে।'

'কিন্তু আমি তো জানি তুমি একজন পদার্থবিদ। পদার্থবিদ্যার সুনীতি সূত্রের ব্যবহারিক প্রমাণ তোমার নিজেরেই করা। য়োমা ইরিতাশের কাজের ধরণ বুঝতে পারল না।

'এত কথা না বলে তুমিতো শুরুতেই আমাকে মেরে ফেলতে পারতে?' চমকে উঠল য়োমা। ভাল করে তাকিয়ে দেখল ইরিতাশের হাতে একটি লেজার গান।

'তুমি, তুমি... কি করে বুঝলে?' য়োমা থতমত খেয়ে গেল।

'এইমাত্র আমি বুঝতে পারলাম তুমি মিথ্যে বলছ।' তারপর হিংস্র দৃষ্টিতে য়োমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিথ্যেবাদী, আমি ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে শেষ করে দিতে পারি কিন্তু করব না কারণ আমি তোমাকে আজও ভালবাসি। খবরদার লেজার গান বের করার চেষ্টা করলে আমি তোমাকে জলন্ত অঙ্গারে বদলে দেব।' তারপর ধীরপায়ে উঠে হাত ইশারা করে য়োমাকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দিল। যতক্ষন পর্যন্ত য়োমার ছায়া দেখা যাচ্ছিল ঠিক ততক্ষন পর্যন্ত সে য়োমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাঁটুগেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে রইল। হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তাঁকে অবশ্যই প্রমাণগুলো নষ্ট করে পালিয়ে যেতে হবে। পালাবার জায়গাও ইতিমধ্যে ভেবে রেখেছে, যেখানে অন্য ইরতাশরা থাকে।

দৌড়ে সে তার ল্যাবে চলে গেল। দরজায় হাত দেবার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত সে জানত না ভিতরে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে অতি যতেœ লেজার গান তাক করে রেখেছে শুধুমাত্র ইরিতাশের জন্য!

'আমি জানতাম তুমি পালাবে। আর শেষ মূহুর্তে সব প্রমাণ নষ্ট করবে। তাই প্রথম থেকেই এখানে অপেক্ষা করছি।' নিষ্ঠুর চোখে শীতল গলায় য়োমা কথা বলতে শুরু করল।
'তুমি এখানে কী করে এলে?'
'আমি প্রথম থেকেই এখানে, এতক্ষন পর্যন্ত তুমি আমার ত্রিমাত্রিক অবয়বের সাথে কথা বলেছ।'
'কিন্তু একা আমাকে মেরে তোমাদের কী লাভ?' ইরিতাশ বাঁচতে চাইল। 'ধীরে ধীরে তোমাদের সবাইকেই মেরে ফেলব। তোমাদের কারওই বাঁচার অধিকার নেই।'
'কেন?'
'কারণ তোমাদের জন্ম মানুষের সত্যিকারের ভালবাসার মাধ্যমে হয়নি। তোমাদের জন্ম হয়েছে ল্যাবরেটরীতে।'
'তবুওতো আমরা মানুষ। ফিরে পেলে আমরাও খাবার খাই, পরিণত বয়সে আমাদের বুকেও ভালবাসার বীজ ফুটে।'
'কিন্তু তোমরা ক্লোন।'
'ক্লোন মানুষ।' ইরিতাশ প্রতিবাদ করল।
'না, শুধুই ক্লোন।'

'তুমি আমাকে মারতে পার কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে কখনই থামাতে পারবে না। পৃথিবীর আনাচে কানাচে সর্বত্রই বিরাজ করছে হাজার হাজার ক্লোন মানুষ। তারা একদিন ঠিকই তাদের অধিকার বুঝে নিবে।'
'তা হবার নয়, কখনই হবে না।'
'আমি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী উইলমুট এর ক্লোন। আরও সতেরজন উইলমুট এ মূহুর্তে পৃথিবীতে হাজার হাজার ক্লোন তৈরী করছে।'

কথা শেষ হবার আগেই য়োমার হাত থেকে একটি তীব্র আলো ছুটো গেল ইরিতাশের দিকে। ইরিতাশের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছিটকে পড়ল ল্যারেটরীর এক কোনায়। য়োমার চোখে মুখে এক পরিতৃপ্তির আভা।

শেষকথা

য়োমা তার রেশমী চুল ভালভাবে সাজিয়ে নিল। গোলাপী রঙের পোশাকে তাকে আরও মায়াময় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বর্গের কোন এক দেবী এ মূহুর্তে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। শেষবারের মতো সে তাকে আয়নায় দেখে নিল যদি সে ভালোভাবে নিজেকে খেয়াল করত তবে সে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর সাথে বেশকিছু মিল খুঁজে পেত। কিন্তু ঘুনাক্ষরেও য়োমা তা ভাবতে পারেনি।

তারপর দ্রুত হাঁটা দিল সামনের বিশাল হলঘরের দিকে যেখানে মহামান্য কিরিজা তাকে কমিশন দেওয়ার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

সে জানত না আজ রাতেই কোন এক ইরিতাশের কমিশন প্রাপ্তির নির্ভর করবে শুধু য়োমার জন্য।

ছড়া

মহাদায়! বৈশাখ

নুরুজ্জামান মাহ্‌দি

যাই বাজারে
কিনতে ইলিশ;
হাতের তালু
চলছে মালিশ ।
চলছি জোরে
মনেতে উল্লাস;
পৌঁছি বাজারে
হয়েছি হতাশ ।
মাছ পেয়েছি
বেজায় টাটকা;
ইলিশের বাচ্চা
যুবরাজ জাটকা ।

মাছের দাম
খুবই কম!
শুনে আমার
যায় যে দম ।

জাটকা প্রতি
মাত্র পাঁচশো;
মান রাখতে
কিনতে এসো!

অবশেষে
কি আর করি;
মান রেখেই
বাড়িতে ফিরি!

ইলিশ ছেঁড়ে যাই
শুঁটকি বাজারে;
প্রতি ছটাক
বিকোয় হাজারে!

মিনতি সবারে
করি করজোড়ে;
দাওনা এবার
আমায় ছেঁড়ে!

গরম ভাতে পানি ঢেলে
পান্তা করি এবার;
পান্তার মাঝে তেলাপোকা
ওয়াক থু! সবার ।

পান্তা-ইলিশ-শুঁটকি
বলছে ওরা ঝুট কি?

রকিং গানে
ঝড় তুলেছে
বৈশাখ পেল
মোট কী?

কবিতা

মনে রেখ

সারমিন মুক্তা

যদি তোমার অজান্তে হারিয়ে যাই
ভুলে যেও না,
জীবনের খাতায় কোন এক পাতায়
রেখে দিও অনেক মায়ায়।
হয়তো কোন একদিন উঠবো ভেসে
স্বপ্ন হয়ে তোমার চোখে,
কোন এক চাঁদনী রাতে
ছায়া হয়ে বসবো তোমার সাথে,
যেমনী বসে ছিলাম
কোন এক ফেলে আসা রাতে।

কবিতা

বিধ্বস্ত নাবিক

নাজমুল হক পথিক

ভয়ংকর সমুদ্র ঝড়ে
বিধ্বস্ত নাবিক আমি ।
এক শান্ত বন্দরে করেছি নোঙর ।
শষ্যের ক্ষেতে নতুন স্বপ্নে
বীজ বপন করি ।
তারা ভরা আকাশের ছায়া তলে ,
অঘ্রানের মধ্য রাতে,
শিশিরের টুপটাপ শব্দে,
প্রিয়ার ধারালো ঠোটের চুম্বনে ।
দীর্ঘ প্রতিক্ষা করি ,
আমার আকাঙ্খার নদী
কখন সাগর সংগমে যাবে ।
এক অস্থির অপেক্ষায় প্রহর গুলো
আরও দীর্ঘ হয় ।
আমার মৃত আত্মার তৃষ্ণা গুলো
নতুন করে জেগে উঠে ।
পৃথিবীর সব আকাঙ্খার মৃত্যু হলেও
নতুন এক আকাঙ্খায় জেগে থাকি ।
আকাবাকাঁ অক্ষরে লিখি
নতুন এ জীবনের ইতিকথা ।

কবিতা

‘ঘ্যাচাং বন্দনা’(বাংলাদেশের মোবাইলফোন অপারেটর কোম্পানীগুলোর প্রতি)

আহমেদ রুহুল আমিন ✉ *লেখা-লিখি টুকটাক । ভাল লাগে কবিগুরু , বিদ্রোহী,সুকান্ত -জীবনানন্দ, সত্তর-আশির দশকের আবুলহাসান, দাউদ হায়দার,খোন্দকার আশরাফসহ অনেক কবির লেখা।*

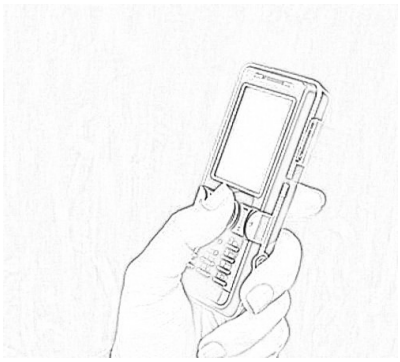

সংসারে টুকিটাকি কতো দরকারী /
নিত্য যে খেতে লাগে আনাজ তরকারী ।
সবকিছু ফিঁকে হয় বাজারের কোণে/
সবার আগে ‘ ক্ল্যাক্সিটা ’ গ্রামীণফোনে ।
মেজাজটা চরমে ব্যালেন্স ফাঁকা/
‘ঘ্যাচাং’ ক েযখন কেটে নেয় টাকা ।
বাজেনা তখন এক হাতের তালি /
মনে মনে দেয় শুধু ‘অশ্লীল’ গালি ।
গরীরে রক্ত কি এতো সস্তা ?
শুষে নিয়ে বানায় শুধু ‘টাকার বস্তা’ !
বাস্ত েসবকিছুই এক-ই দফার/
কমার্শিয়ালে ছাড়ে হাজারো অফার ।
বাংলার সিধে-সাদা জনগণ বোকা /
‘ভোক্তা অধিকারে’ খায় শুধু ধোকা ।
তবে তাঁরা বোকা নয় অতিশয় চালাক/
ঘৃণাভরে চিরতরে করবে তালাক ।
চাছাছোলা চেহারাতে ‘ এক বস্ত্র ’ /
একটাই আছে শুধু ‘ ঘৃণা অস্ত্র ’।
প্রতিযোগিতায় আছে কতো কোম্পানী /
শেষ হয়ে যাবে নিঃশেষে দমখানি ।
জনগণ থেকে না তাই হতে ত্যজ্য /
‘মানবিক মন ’ নিয়ে করুন বানিজ্য ।

বই আলোচনা

আমার প্রিয় লেখকের 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প'

মৌনী রোম্মান

এবার বই মেলা থেকে কেনা বইয়ের মধ্যে প্রথমেই যে বইটা পড়া শেষ করেছি সেটা হচ্ছে "অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প" । আমার অন্যতম প্রিয় লেখক শাহাদুজ্জামানের ছোটগল্পের বই । বর্তমান সময়ে শক্তিমান গল্পকারদের একজন তিনি । নিজস্ব এক স্বতন্ত্র গল্প বলার ঢঙের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি নিজের একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছেন । বইটিতে মোট দশটি ছোটগল্প আছে । প্রথম গল্পটির নামেই বইটির শিরোনাম। প্রথম গল্পটিই লেখক এবং তার এই বইটির বৈশিষ্ট ধারণ করে। দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশের একটি গল্পের ভেতর দিয়ে পাঠককে বৈচিত্রময় এক ভ্রমণে নিয়ে যায় 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প' ছোটগল্পটি । এরপর '৩০৬ নম্বর বাস', 'পৃথক পৃথিবী', 'রফিকের নোটবুক', এইগল্পগুলো যেন একি সঙ্গে অনেক পৃথিবীর কথন। মসৃণ লেখনী আর আর গল্প বলার এক ভিন্ন ধারায় লেখক পাঠককে ভাবনার এক জগত থেকে ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যান । কখনো কখনো গল্পের বিচিত্র অথচ অতি-বাস্তব চরিত্রগুলোর সাথে এই পরিচয় আত্মতৃপ্তিও জাগায় । 'মান্না দে', 'গোয়েন্দা ঘরানার গল্প', 'অপুস্পক', গল্পগুলো আমাদের সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস নিয়ে । স্বাভাবিক ভাবেই এসব ঘটনায় সব সময় নারীরাই বেশি ভুক্তভোগী । তবে গল্পের শিরোনাম দিয়েই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রেও লেখকের গল্প বলার আঙ্গিক রীতি-বিরুদ্ধ । যা শেষ লাইন পর্যন্ত পাঠকের মনযোগ আকড়ে ধরে রাখে ।

তবে এই বইয়ে যে দুটি গল্পের কথা আলাদা করে বলতে হয় তা হচ্ছে 'মুরাকামির বিড়াল' আর 'সাইপ্রাস' । 'মুরাকামির বিড়াল' মানব মনের চির-রহস্যময়তার কাহন । নিরাপদ-নিশ্চিন্ত জীবনের জন্য মানুষের যে প্রতিনিয়ত আকাংক্ষা – সে কি সত্যিই তা চায় ? প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের এই পথ চলার উদ্দেশ্য কি ? এই প্রশ্নগুলোরই উদ্ভব ঘটায় এই গল্পটি। সেখানে 'সাইপ্রাস' গল্পটির প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন । একদম আমাদের চারপাশে তাকালেই পাওয়া যায় এমন দুটো চরিত্রের পাশাপাশি এক বাস যাত্রার গল্প । সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ও পর্যায়ের দুটো মানুষের মাধ্যমে উঠে আসে চিরায়ত বাংলার শতাব্দী প্রাচীন কিছু বচন আর বর্তমান সময় ।

একদম শেষ গল্পটি হচ্ছে 'সাড়ে সাতাশ' । এটিকে মূলত লেখকের রচিত সব চরিত্রের এক মিলন মেলা বলা যায় । রাইটার্স ব্লকের সময়টায় লেখক তার সব চরিত্রদের নিয়ে বসেন এক আলোচনায় । সেখানে এক কথায় বলতে গেলে লেখক যেন তার চরিত্রগুলোর ময়নাতদন্ত করেন । যারা লেখকের অন্যান্য ছোটগল্পের বইগুলো পড়েননি 'সাড়ে সাতাশ' গল্পটি দিয়ে সেসব সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন ।

অত-শত এক ঘেয়েমী বইয়ের ভিড়ে যেসব পাঠক ভিন্ন স্বাদের এবং প্রথাগত ধারা ভঙ্গকারী বই পড়তে আগ্রহী তারা নির্দ্বিধায় বইটি পড়তে পারেন । বইটি এবারের বইমেলায় মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত ।

ফিচার

ভারতের রূপকুন্ডের ‘কঙ্কাল হ্রদ’ ও লোমহর্ষক এক রহস্য!

মোস্তাক চৌধুরী ✉ *লেখালেখি করতে ভালবাসি। মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকাতে কিছু লেখার চেষ্টা করি। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখার ভরসা পাই না। আমার বন্ধুও কম। কিন্তু যারা আছে তাদের জন্য সবকিছু করার মানসিকতা আমার আছে।*

রূপকুণ্ডু ।

এটি একটি হিমবাহ হ্রদ। এটির অবস্থান ভারতের উত্তরখণ্ডে। হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬৪৯৯ ফুট উপরে অবস্থিত।

এই জনবিরল অঞ্চল কেন আলোচনার শীর্ষে চলে এল তা এক করুণ কাহিনী। এখানে ৫০০এর মত মানুষের কংকাল পাওয়া গিয়েছে। এই কারনে রূপকুণ্ডু হ্রদের নাম হয়ে গেছে কংকাল হ্রদ।

১৯৪২ সালে নন্দা দেবী রিসার্ভ পার্কের রেঞ্জার এইচ কে মাধওয়াল এই কঙ্কালগুলো প্রথম আবিষ্কার করেন। যদিও অনেকে বলেন উনবিংশ শতাব্দী থেকে মানুষ জানত এই কংকালগুলোর কথা।

কারা এই হতভাগ্যরা? কিভাবে তারা মারা গেল? কবে মারা গেল?

বছরের পর বছর মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল এগুলো জাপানী সৈন্যদের কংকাল যারা ঐ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল কিন্তু ঠাণ্ডাতে মারা যায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। স্থানীয় ব্রিটিশ প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে দেখল কংকালগুলো অন্তত এক শতাব্দী প্রাচীন।

অনেকে ভাবলেন এটা জম্মু কাশ্মীরের রাজা জেনারেল জরাইয়ার সিং য়ের সেনাদের যারা বালিতস্থান আক্রমণের সময় হারিয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৬ সালে ভারতীয় সরকার সেখানে সার্ভে টিম পাঠায়। তারা সেখান থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে রেডিও কার্বন ডেটিং করে জানা গেল এগুলো অন্তত ১২ থেকে ১৫ শতাব্দীতে হবে। তখন অনেকে ধারণা করলেন এরা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সেনাবাহিনী হবে যারা তিব্বত দখল করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে ১৯৫৬ সালের পদ্ধতি ছিল অনেক ত্রুটিপূর্ণ।

অনেকে ধারণা করলেন এরা কোন মহামারীর শিকার হয়েছে।

এই অঞ্চলের নিচের জনপদ গুলোতে লোককাহিনী প্রচলিত আছে যে, প্রাচীনকালে কৌনুজের রাজা জাসয়াল এখানে আসেন নন্দ দেবীর উপাসনা করতে। কিন্তু সাথে নিয়ে আসেন বাইজী। এতে এই স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। তাদের উপর শিলাবৃষ্টি হয়। এবং তারা হ্রদের ভিতর নিক্ষিপ্ত হয়।

অধিকাংশ মানুষ লোককাহিনীকে গালগল্প বলে ধরে নিলেও এর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকে।

(একটা উদাহরণ দেই, ইন্দোনেশিয়ার ছোট্ট দ্বীপ ফ্লোরস (Flores)। এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য সব জাতির মতই কাজ করে, খায় দায়, ফুর্তি করে আর অবসর সময়ে গল্পগুজব করে। এখানকার বুড়োবুড়িরা আমাদের দাদী-নানীদের মতই 'ঠাকুরমার ঝুলি' সাজিয়ে বসে নাতি-নাতনীদের কাছে – হাজার বছরের মুখে মুখে চলে আসা উপকথাগুলোকে বলে যায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। কিন্তু এদের ঠাকুরমার ঝুলিগুলো যেন কেমনতর অদ্ভুত! লালকমল-নীলকমল আর দেও-দৈত্য নেই ওতে, আছে কতকগুলো ক্ষুদে বামনদের গল্প। মাত্র এক মিটারের মত লম্বা বেটে লিলিপুটের মত একধরনের মানুষ অনেক অনেকদিন আগে তাদেরই আশে পাশে নাকি বাস করতো, যা সামনে পেতো তাই মুখে দিতো, তাদের ফসল নষ্ট করতো, নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলতো আর যা শুনতো তাই নাকি নকল করার চেষ্টা করতো। এমনি একজন ক্ষুদে বামনের নাম ছিল এবু গোগো (এবু মানে নানী আর গোগো মানে এমন কেউ যে যা সামনে পায় তাই খায়), তাকে খেতে দিলে সে খাওয়ার বাসনটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো, সুযোগ পেলে নাকি মানুষের মাংসও খেতে দ্বিধা করতো না।

দ্বীপবাসীদের বলা গল্পগুলো শুনলে মনে হয় যেনো এই সেদিনই তারা সবাই একসাথে বসবাস করতো। নিছক রূপকথা ভেবেই বেঁটে-বাটুলদের গল্পগুলো সবাই উড়িয়ে দিয়েছিলো এতদিন। অবাক এক কান্ড ঘটলো ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে।

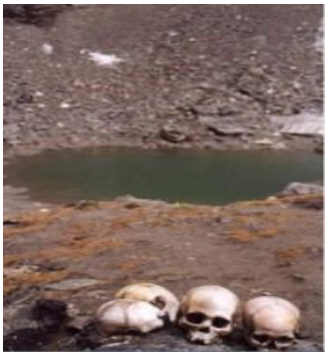

বিজ্ঞানীরা ফ্লোরস দ্বীপেরই মাটি খুড়ে পেলেন এক মিটার লম্বা এক মানুষের ফসিল-কঙ্কাল; প্রথমে সবাই ভেবেছিলো হয়তো কোন বাচ্চার ফসিল হবে বুঝি এটা। কিন্তু তারপর ঠিক ওটারই কাছাকাছি জায়গায়ই পাওয়া গেলো আরও ছয়টি একই রকমের অর্ধ-ফসিলের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে বুঝলেন এগুলো আসলে পূর্ণাংগ মানুষেরই কঙ্কাল, কার্বন ডেটিং থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা গেলো, মানুষের এই নব্য আবিষ্কৃত প্রজাতিটি মাত্র ১২,০০০-১৪,০০০ বছর আগেই এই দ্বীপটিতে বসবাস করতো। ১২,০০০ বছর আগে এই দ্বীপে এক ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ঘটে, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন হয়তো দ্বীপের অন্যান্য অনেক প্রাণীর সাথে এরাও সে সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। সূত্রঃ বিবর্তনের পথ ধরে – বন্যা আহমেদ)

যাই হোক ২০০৩ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের উদ্যোগে একদল গবেষক এই রহস্য ভাঙ্গার উদ্যোগ নেন। এর নেতৃত্ব দেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের প্রফেসর ডঃ উইলিয়াম সাক্স। এই দলটিকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ছিলেন। তারা নানা হাড়গোড়ের নমুনা সংগ্রহ করেন। এই দলটি একটি বিশাল সাফল্য লাভ করে যখন তারা একটি অক্ষত দেহ উদ্ধার করে। হিমালয়ের বরফশীতল তাপমাত্রা এই দেহটিকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। এতে তারা ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে সুবিধা পেলেন।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কংকালের খুলিতে অগভীর আঘাতের চিহ্ন পেলেন। পুনের ডেকান কলেজের প্রফেসর ডা সুভাষের মতে এই অগভীর আঘাতের কারণ কোন তুষারধ্বস নয় বরং ক্রিকেটবলের মত ছোট কঠিন বস্তুর আঘাতের ফলাফল। একই সাথে কয়েকশত মানুষ মাথায় একই রকম আঘাত পেল এবং

মারা গেল এটা নিশ্চয়ই উপর থেকে আঘাত করেছে। তাদের ধারণা এটা শিলাবৃষ্টি হবে।

প্রফেসর ডঃ উইলিয়াম সাক্স স্থানীয় একটি পালাগানের কথা স্মরণ করেন সেখানে বলা হয়েছে রুষ্ট দেবী পাপিষ্ঠদের উপর এমন শিলা নিক্ষেপ করেন যা পাথরের থেকেও ভারী।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা কাপড়, জুতা, কাঁচের চুড়ি, বাঁশের লাঠি উদ্ধার করেন। এ থেকে বোঝা যায় তারা তীর্থযাত্রী ছিল। সেখানে এখনও বরফের নিচে ৬০০ দেহ চাপা পরে থাকতে পারে।

এই নমুনাগুলো ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের adiocarbon Accelerator Unit এ পাঠানো হয়। সেখানকার গবেষকরা জানান এই নমুনাগুলো ৮৫০ সালের দিকের। যা ১৯৫৬ সালের রিপোর্টের আরও ৩০০ বছর আগে। হায়দারাবাদের Centre for Cellular and Molecular Biology র বিজ্ঞানীরা লাশের হাড়ের নমুনা থেকে বের করলেন ৩ টি নমুনাতে এমন জীন পাওয়া গিয়েছে যা মহারাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের আর কোথাকার মানুষের ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে আরও কিছু মানুষের চেহারা হিমালয়ের আশেপাশে মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর। অতএব এটা বলা স্বাভাবিক যে তীর্থযাত্রীরা স্থানীয়দের কুলি হিসেবে নিয়োগ করেছিল। রূপকুণ্ড থেকে স্থানীয় মানববসতির দূরত্ব ৩৫ কিমি। তাই বাইরের লোকেরা স্থানিয়দের সহায়তা ছাড়া সেখানে যেতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক।

এটা ধারণা করা যায় আজ থেকে ১৩০০ বছর আগে এক হাজারের মত লোক হিমালয়ের উপরে অজানা পরিবেশে চলছিল। তাদের সাথে কুলি হিসেবে ছিল স্থানীয়রা। সেখানে পুরুষ, মহিলা এবং শিশু ছিল। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হল। পালানোর কোন উপায় ছিল না। শিলার আঘাতে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হল সবাই। কিছুক্ষণের ভিতর রূপকুণ্ড হয়ে গেল এক মৃত্যুপুরী। তাদের দেহ হ্রদের উপর পতিত হল। কিছু বরফ চাপা পড়ল। দিন পেরিয়ে মাস হল, মাস পেরিয়ে বছর হল, তারপর শতাব্দীও কেটে গেল। কিন্তু রূপকুণ্ডুর ভয়াবহ কথা মানুষ ভুলে গেল। এই লোকগুলোর পরিবার এবং প্রিয়জন ছিল। তারা কি জেনেছে তাদের স্বজনদের করুণ পরিণতি?

কাব্যগল্প

ওই যে ছেলেটি কবিতা লিখে

এস কে দোয়েল ✉ *সম্পাদক ও প্রকাশক আলোর ভূবন সাহিত্য ম্যাগাজিন এবং জাতীয় পত্রিকার ফিচার ও কলাম লেখক। তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।*

ওই যে ছেলেটি কবিতা লিখে....
কি যেন নাম, প্রায়:ক্ষন বসে থাকে মহানন্দার তীরে
হ্যাঁ-হ্যাঁ ছেলেটি তো অমুকের ছেলে,বলল পাশে আরেক নিন্দুক
বলুন তো দেখি কবিতা লিখে কি হবে,
কবিতা ভাত দিবে?
অর্থের যোগান দিবে?
দেবদাস হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে আছে?
নিশ্চয়ই না,খামাকা নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।

দেখুন না মাথায় ঝাকরা কুকরানো চুল,
যেন কাজী নজরুল নয়তোবা যৌবনে রবিঠাকুর
মুখ ভর্তি দাঁড়ি কাঁধে ঝুলানো পাটের চটের ব্যাগ,
কি ভাবই না তার, দেখেছেন?
হ্যাঁ,এত থামখেয়ালির কোন মানে নেই,
কি করতে পারবে কবিতা লিখে?
পারবে বিয়ে করে বৌকে তিনবেলা ঠিকমত খাওয়াতে?

পারবে বৌয়ের চাহিদা মিটাতে?
এমন সন্ন্যাসীর ঘরে কে দিবে ভাল মেয়ে বিয়ে?

দিবে, অবশ্যই দিবে,আমার মেয়েটাকেই ওই ছেলেটার কাছে বিয়ে দিব,

বলতে বলতে আসলেন এক ভদ্রলোক।
কি বললেন মসাই?
হ্যাঁ দিব, কেন দিব জানেন ,দিব এই কারণে?
কোন কারণে মসাই ?
আমার মেয়েটিও এই সংস্কৃতির, মানে গীতিকার।
গীতিকার! তার মানে সেও কবি?
কবিতা ছাড়া গীতি বা সংগীত হয় নাকি? বললেন নিন্দুক।
আচ্ছা গান শুনেন কেন, বলতে পারেন?
আরে গান তো মনের খোরাক!
একাকিত্বের সূর সঙ্গী।
গান প্রাণের আনন্দ সঞ্চার করে।
কেন বলুন তো, সংগীত ভাললাগে গীতিকারকে ভাললাগেনা কেন?
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'
মধুর সূরে জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন, আবার কবিকে নিন্দা করেন?
ওই ছেলেটি তো আর রবিঠাকুর না ? নিন্দুকের প্রশ্ন।
কেন কবি কি আলাদা হয় না কি?
রবি ঠাকুর কাজী নজরুল জীবনান্দের জগত কি আলাদা ছিল?
নিরুত্তুপ!মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে নিন্দুকের।

জানেন কবি কেন কবিতা লিখে? ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করলেন-
ওই যে ছেলেটা কবিতা লিখে,যার নিন্দায় এতক্ষণ মশগুল ছিলেন
সে বেড়ে উঠেছে নানা প্রতিকূলতার ঝড়ের মধ্য দিয়ে,
নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে,
জীবনের অভাব কি সে নিজের চোখের দেখেছে আর সয়েছে,
আপনার মত সাধারণ মানুষ এরা নয়!
তাহলে কি মহাপুরুষ জাতীয় কোন মানুষ! নিন্দুক প্রশ্নটা ছুড়ে ফেলে।
হ্যা মহা পুরুষ! এরা সৃষ্টির মাঝে বেঁচে থাকে পৃথিবীতে,
যুগযুগ ধরে
এই দেখুন না ইতিহাসের পাতায় আদি কবি হেরোডোটাস এর নামটি,
এরকম বহু মনিষী আছে যারা কবিতা লিখত!
তারা আজ বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায়,
সোনার কলমের কালিতে খোদাই করা কত ভাস্কর্য,
এরা তো মরেও জীবিত, তাদের অমৃত সৃষ্টি আমরা লালন করি,
শিক্ষা অর্জন করি, আমাদের প্রজন্মদের শিক্ষা দেই,
যদি কবিতা ভাল না লাগে তাহলে দেশের শিক্ষামন্ত্রীকে বলে দিন-
জাতীয় কোন পাঠ্যপুস্তকে যেন একটি কবিতাও না থাকে, পারবেন?
নিশ্চুপ। কোন কথা নেই নিন্দুকের মুখে,শুধু চোখে এক হতাশার দৃষ্টি।

ওই যে ছেলেটি কবিতা লিখছে,
বেরঙ নদীর তীরে বসে;
ওই যে দেখা যায় শিশু গাছ;
এখানে প্রায় প্রায় ছুটে আসে পাগল ছেলেটি
এখানে বেরঙ আর গবরা দু-নদীর মিলনে
এক স্বপ্নীল মোহনা সৃষ্টি হয়েছে।
ওই যে দেখুন না নদীর ধারেই পূর্ব প্রান্তে

ভারতের সবুজ বিছানার মত বিস্তৃত চা-বাগান
এটা দেখতে চলে আসে মাঝে মাঝে ছেলেটি
সূর্য ঢোবার ঠিক ঘন্টাখানিক আগে আগে;
এই শিশু গাছটির সাথে পিঠ ঠেকিয়ে,
বাম হাতে রাখা প্যাড নোটে কি সব কবিতা খসরা করে,
আর কি যে একটা যন্ত্র টিপাটিপি করে;
ওই ড্রাফট করা কবিতাগুলো গচাগচ টাইপ করে।
ও মনে পড়েছে শুনেছি যন্ত্রটি ল্যাপটপ কম্পিউটার,
ছবি দেখা দেখা যায় ছবি তোলা যায়,
কি অদ্ভূত যন্ত্র রে বাবা!
কথাগুলো বলে যাচ্ছিল তৃতীয় সারির নিন্দুক ফটিক চান মৌল্লা
তবে ততটা নিন্দুক মনের মানুষ নয় সে;
আচ্ছা ছেলেটি কি একেবারেই কাজকর্ম করে না;
নাকি সারাদিন ঘুরে ফিরে আর কবিতা লিখে?
না-না ছেলেটি এমনি ভীষণ স্বভাবের সুন্দর;
তবে চাকুরীর ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার;
কিন্তু মাস শেষে ইনকামও করে বেশ,
রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করে; কলম চালালেই টাকা আর টাকা..
কিন্তু কবিতা লিখে কি বাড়িঘর বিল্ডিং দিতে পারবে?
বেঁচে থাকা কবিদের ক'জন মূল্যায়ন করে বলুন?

কেন মরার পর খ্যাতিটা পেলে অসুবিধাটা কোথায়?
অবশ্যই অসুবিধা আছে মশাই;
জীবিতকালে খ্যাতি না পেলে মৃত্যুর পর পেলে;
এই সৃষ্টিশীলতার সার্থকতা কোথায়!
কেন ভুলে যাচ্ছেন ভাই?
কি মশাই?
'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'
মানে?
কেন এর ফলটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মরা ভোগ করতে পারবে;
এটা কি আপনি চান না?
আরে ভাই কবি তো নিজের জন্য লিখে না;
লিখে দেশ-জাতির সকল বিশ্বের জন্য;
তো দাওয়াত নেন ভাই।
কিসের মশাই?
আমার মেয়ে চন্দ্রমল্লিকার বিয়ে?
কার সাথে বিয়ে দিচ্ছেন মশাই?
কেন ওই ছেলেটির সাথে! ওই যে ছেলেটি কবিতা লিখে—
কি বলছেন, আপনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রশান্ত বাবু!
তাতে কি, আপনার কি কোন সমস্যা আছে?
না, মানে-বলছিলাম—
বুঝতে পেরেছি আপনার ঘরেও;
আমার মেয়ে চন্দ্রমল্লিকার মত একটি মেয়ে আছে!
হ্যাঁ—কিন্তু আপনি হিন্দু হয়ে....
প্রয়োজন হলে মেয়ের জন্য আমিও মুসলমান হয়ে যাব।
আমি চলছি ভাই—
আরে কোথায় যাচ্ছেন বাবু প্রশান্ত;
নদী মহানন্দায় ওই ছেলেটির কাছে———
ভদ্রলোক চলছে নদী মহানন্দার দিকে.....
আরে দাঁড়ান মসাই—জোরে জোরে ডাকতে থাকে নিন্দুক....

বড় গল্প

বিস্মৃতি

তুষার আহসান ✉ *আমি পশ্চিমবঙ্গ,ভারবর্ষের মানুষ। ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি করি। দৈনিক আনন্দবাহজার সহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশ পায়। ইন্টারনেটের নেশা এখন এমন ভাবে ধরেছে, ব্লগ ছাড়া আর কোথাও লিখতে ইচ্ছে করে না।*

–বড় বৌমা, বড় বৌমা, তোমার বাপের বাড়িটা কোথায় যেন?

শ্বশুরকে রান্নাশালের দিকে আসতে দেখে মাথার আঁচল ঠিক করল জোহরা। তারপর মৃদু হেসে বলল—কুসুমপুর। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন আব্বা! এই তো গতমাসে বেড়িয়ে এলেন কুসুমপুর থেকে।জোহরার কথায় মাথা চুলকান ওসমান। স্বিভ কেটে বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে

পড়েছে, এই তো সেদিন নৌকা চড়ে তোমার বাপের বাড়ি বেড়িয়ে এলাম।

– নৌকা কোথায় গো, আমাদের গাঁয়ের দশ মাইল সীমানায় নদীই নাই, আপনি ট্রেনে গেছিলেন।

– ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ট্রেনটা নৌকার মত দুলছিল, নদীর মত বাতাস জানালা কেটে ঢুকছিল। ট্রেনের ব্যবসা করে তোমার আব্বার লাভ হয় খুব বলো?

–আমার আব্বা ট্রেনে ঝালমুড়ি বেচেন না, আব্বা। উনি প্রাইমারীতে মাস্টারী করতেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানেই গেছিলেন আপনি।

– ফেয়ারওয়েল! ভুরু কুঁচকে যায় ওসমানের। তারপর বিড়বিড় করেন,আমার তো মনে হচ্ছে কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলাম। চুলে কলপ করতে গিয়ে তোমার আব্বার গেঞ্জী লাল হয়ে গেল।

জোহরা স্বিভ কামড়ে হাসি সামলায়, কোনরকমে বলে, হবে হয়তো, আমার আব্বার বিয়ের কথা আপনার মনে পড়ছে।

বৃদ্ধ সেই কথা শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। রান্নাশাল থেকে তিনি পা বাড়ালেন বারান্দার দিকে।তখনও তিনি বিড়বিড় করছেন, তবে কি মেজবেয়ায়ের মাথায় টাঁক ছিল? কিন্তু কাকে যেন আমি কলপ করতে দেখেছি!

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ওসমান হাঁক ছাড়লেন, মেজ বৌমা, একবার নিচে এসো তো মা।

মেজ বৌমা কুলসুম পালঙ্কে শুয়ে টিভি দেখছিল। আজ তার রান্নার পালা নয়। স্বামী মটোরবাইক হাঁকিয়ে গেছে ব্যবসার কাজে। ছেলে ভাই ও বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলছে। দেওর আয়াজ ছিল দূরন্ত টাইপের। তাকে শান্ত করার জন্য কলেজে পড়তে পড়তে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বউ নাদিরা কিশোরী,দেখনধারী সুন্দরী। সে খুব একটা বশ মানাতে পারেনি স্বামীকে।অবাধ্যসেই ছেলে অবশ্য কুলসুমকে খুব সমীহ করত। তার কলেজের সুখ-দু:খেরকথা বলত। এই ঘরে বসে টিভিতে খেলা দেখত। মেজ ভাবীর হাতের চা তারখুব প্রিয় ছিল। খেলা দেখতে-দেখতে বলত, তোমার হাতের খেল দেখাও ভাবী।

বেশ কিছুদিন আগে এক দূর্ঘটনায় মারা গেছে। তাই এই বিকেলে কুলসুমের কাছে আব্দার করার কেউ নেই। বিমর্ষ কুলসুম এই সময়টাই টিভি দেখে।তার স্বামী ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ছেলেও ফিরবে বাপের হাত ধরে।তারা দুজনেই চা খায়না। এ বাড়িতে চা-খোর একজনই ছিল। তার মৃত্যুতে কুলসুমের একটি বৈকালিক কাজ কমে গেছে। চায়ের প্রশংসা করার কেউনাই। কুলসুম এখন কাল গভীর রাতে প্রচারিত সিরিয়ালটির পুন:প্রচার দেখতে দেখতে ওসমানের ডাক শুনল। বিরক্ত হলেও রাগল না সে । হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল নিচে। বলল, স্বী আব্বা,বলেন?

– কি আর বলবো, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, মেজ বৌমা, তোমার আব্বারই তো সেদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথা ফেটে গেছে?

মুরুব্বির সামনে হাসা বেয়াদবী হয়ে যাবে তাই মুখে আঁচল চাপা দিল কুলসুম।তার আব্বা প্রায় বছর খানেক ধরে পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তিনি ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছেন কিনা তাও জানা যায় না। তবে স্বামীর আব্দার রাখতে কুলসুমকে রাত জেগে এবারের ইউরো কাপের খেলা দেখতে হয়েছে। খেলাটির বিষয়ে অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে তার। তাই সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, রোনাল্ডোর সাথে হেড মারতে গিয়ে ঢুঁ লেগে গেছিল।

ওসমান তা শুনতে পেলেন না। তবে মেজ বৌমার ঘাড় নাড়া দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কুলসুম হ্যাঁ বলছে। তাঁর চোখেমুখে খুশির আলো খেলে গেল।বললেন, দ্যাখো মা জননীরা, আমার ঠিক মনে পড়ে গেছে। তবু তোমাদের শাশুড়ি বলে কিনা, আমার নাকি কথা মনে থাকে না। লোকজনের সামনে কত লজ্জা লাগে শুনতে!

বারান্দার একপাশে গ্রামের গরীবঘরের মেয়েদের আমপারা পড়া শেখাচ্ছিল নাদিরা।ওসমানের কথা শুনে তার চোখ ছলছল করে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোহরা ও কুলসুম। তাদের শাশুড়ি-মা ইন্তেকাল করেছেন তিন বছর আগে। ওসমান তা ভুলে যান। বৌমারা ভুলতে পারে না, স্বামী অন্ত:প্রাণ মানুষটি একটি দিনের জন্য কাউকে তুচ্ছ করে কথা বলেন নি। তাঁর মৃত্যুর দিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল।

গ্রামের ছোট-বড় সকলের চোখেই তা ভিড় করছিল যেন। ঝড়ে গাছপালা ভাঙছিল। মেঘের গর্জনও যেন আর্তনাদ করছিল, আপনি এই মহিলাকে জান্নাতবাসী করুন মওলা।

ওসমানের মনে থাকে না পত্নীবিয়োগের কথা। ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে থাকেনচুপচাপ। বৌমারা কেউ অনুযোগ করলে বলেন,

তোমাদের শাশুড়ি নামাজ পড়ে আসুক।পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন ছুটে আসতে হয় নাদিরাকে। সে হাসতে হাসতে বলে,সরে যান ভাবী, আপনি সরে যান। সেদিন সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে আব্বার হাতে ব্যথা হয়েছে, কেউ খাইয়ে না দিলে উনি খাবেন কি করে?

ছোট বাচ্চাকে মা যেমন গ্রাস তুলে খাওয়ায়, নাদিরা তেমনই গ্রাস তুলে ধরে ওসমানের মুখের সামনে। সুবোধ শিশুর মত বৃদ্ধ খান নিরবে।

আজ ওসমানের আবার মনে গেল স্ত্রীর কথা। বললেন, তোমাদের শাশুড়ি সেই কখন গোসলখানায় ঢুকেছে, এখনও বেরোনোর নাম নাই। ও বোধহয় ভুলে গেছে, আমাকে এখন গোসল করে জোহরের জামাত ধরতে হবে।

বড় বউ, মেজ বউ উদাস চোখে রান্নাঘরে চালে বসে থাকা শালিক পাখি দুটি দেখে। কখনও দেখে আঙিনার মাঝে বড় হতে থাকা পেঁপে গাছটিকে । কেউ কোন যত্ন করে না চারাটির। তবু সে কিশোর হয়ে উঠেছে নিজস্ব প্রাণশক্তিতে। তার নধর সবুজ পাতায় হয়ত বার্তা ছড়ানো থাকে,যারা এই পৃথিবীর যোগ্য তারাই টিকে থাকে। পৃথিবীতে প্রতিটি মুহূর্তে অর্জন করে নিতে হয় প্রাণের যোগ্যতা।

পড়ানো থামিয়ে ছুটে আসে নাদিরা। ওসমানের হাতে তসবীহ দিয়ে বলে,এখনই তো আপনি আসরের নামাজ পড়ে বাড়ি ঢুকলেন আব্বা।

ছোট শিশুর মত বিনা বাক্য ব্যয়ে তসবীহ হাতে নেন ওসমান। তারপর বিড়বিড় করেন, ওহ হ্যাঁ, এখনই তো আমি আসরের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরলাম, আমার কিছুই মনে থাকে না কেন? তবে কি আমি নামাজও ভুল পড়ি?

তসবীহ হাতে নিয়ে থামার বাড়ির দিকে হাঁটলেন ওসমান। সেখানে তার পৌত্ররা বন্ধুদেরসাথে ক্রিকেট খেলছে। ওসমানকে দেখে তারা হাঁ-হাঁ করে উঠল,আসেন, আসেন দাদাজান, আম্পায়ারের অভাবে আমাদের খেলায় শুধু গন্ডোগোল লেগে যাচ্ছে।

অন্যদিন আম্পায়ারিং করতে আপত্তি করেন না ওসমান। তাঁর অনেক ভুল সিদ্ধান্তে পৌত্ররা হেসে কুটিকুটি হয়। খেলার আনন্দের চেয়ে সেটিই যেন বেশী মজার। তাই প্রতিটি বিকেলে তারা অপেক্ষা করে আসরের নামাজ শেষে ওসমান কখন এই স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন।

পৌত্র ও তাদের বন্ধুদের মুখগুলি চেনা ওসমানের। নাম-টাম অবশ্য ঠিকঠাক মনে পড়েনা। তাতে অবশ্য অসুবিধা নাই। সবাই তার ছোট ভাই,বন্ধুর মত।

আজ তিনি মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু আজ আমি তোমাদের সাথে খেলব।

–এই বয়সে আপনি খেলতে পারবেন?

–পারব না মানে, আলবৎ পারব, এই তো সেদিন আমি ইডেনে খেলা দেখে এলাম।

–খেলা দেখা আর নিজে খেলা এক নয় দাদাজান।

–এক নাকি দুই এখনই দেখাচ্ছি, আমার বোলিংয়ের সামনে কে ব্যাট করতে পারো

দেখি। ওয়াশিম আক্রামের মত ফাস্ট বল করব আমি।

হাতের তসবীহ গলায় ঝুলিয়ে বোলিং ক্রিজে দাঁড়ালেন ওসমান। উইকেট-কিপার ছেলেটি বলল, লুঙ্গি সামলান দাদাজান, লুঙ্গি পরে ক্রিকেট হয় না।

–হয় না হয়, এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি, লুঙ্গি পরে নামাজ হলে লুঙ্গি ক্রিকেট হবে না কেন! ব্যাটসম্যান, রেডি?

একটু পরে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরলেন ওসমান। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। কপালের একপাশ কেটে গেছে।বাচ্চা ছেলের মত তিনি বলছেন, মা,মাগো, ওরা আমাকে মারল।

নিজের নিজের কাজ ফেলে ছুটে এল জোহরা,কুলসুম ও নাদিরা। অপরাধীর মত মুখ করে ওসমানের সহ-খেলোয়াড়রাও পাশে দাঁড়িয়েছে।

জোহরা চোখ পাকিয়ে তার বড় ছেলেকে বলল, তোরা আব্বাকে মেরেছিস। ক্লাস ফাইভে পড়া তারিফ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, কেউ মারেনি, দাদাজান লুঙিতে ঝটাপটি লেগে মাটিতে পড়ে গেছে।

অন্যরা তাতে সায় দিল। ওসমানও প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর কান্না থেমে গেছে। তিনি বললেন, ওরা তো আমার সাথে খেলছিল, আমার মনে হয় তোমাদের শাশুড়ি আমাকে ধাক্কা মেরে পেছন থেকে ফেলে দিয়েছে।

বৌমারা পরস্পরের প্রতি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। জোহরা একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে এসে ওসমানকে তাতে বসাল। কুলসুম পানি আনল। নাদিরা আনল ফার্স্ট-এড বাক্স। তিন

জন মিলে প্রাথমিক চিকিৎসা করল। তারপর ধরাধরিকরে বৃদ্ধকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়।

তিন জনে পরামর্শ করল, ডাক্তার ডাকা দরকার।

ওসমানের সহ-খেলোয়াড়রা ছুটল প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের দিকে।

বিছানায় শুয়ে আছেন ওসমান। তাঁর চোখে কখনও ঘুমের ঘোর, কখনও স্মৃতির পিছুটান। ছেলেবেলায় জ্বরজ্বালা হলে মা তাঁর শিউরে বসে থাকতেন। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতেন। এখন তাঁর শিউরে বসে আছে মায়ের মত চেহারার এক নারী। সেও তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার পরনে অবশ্য মায়ের মত রঙিন শাড়ি নয়,শিউলি ফুলের মত সাদা কাপড়। স্নেহের পরশ যেন অবিকল এক।

ক্রিকেটার আজহারউদ্দিনের ছেলে যেদিন মারা যায়, সেদিন এই ছোট্ট গ্রামের এক অখ্যাত মানুষের ছোট ছেলেটিও মটোরবাইক দূর্ঘটনায় মারা গেছিল।

আজহারের ছেলে আয়াজের মত এই আয়াজও সেদিন নতুন বাইক কিনে আকাশে উড়তে চেয়েছিল। শেষমেষ বাইকটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। প্রচন্ড গতিতে ধাক্কা মেরেছিল একটা আমগাছে। উড়ে গেছিল তাঁর আত্মা হয়ত সরাসরি আজরাইলের ডানায়!ভেঙে গেছে নাদিরার হাতের চুড়ি। কাফন রঙের শাড়ি হয়ে গেছে নাদিরার ভবিষ্য-লিখন।

ডাক্তারের সাথে হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকল ওসমানের সহ খেলোয়াড়রা। জোহরা ও কুলসুমের ধমক খেয়ে তারা চুপচাপ ঘরের বাইরে দাঁড়াল। আমপারা পড়া মেয়ে গুলি অবশ্য বইপত্র গুটিয়ে যেন অপেক্ষা করছিল এই ধমকের। তারা ছুটে পালাল নিজের নিজের বাড়ির দিকে।

পালঙ্কের একপাশে ডাক্তারির ব্যাগ রেখে ওসমানের সামনে দাঁড়াল তরুণ ডাক্তার ওয়াশিম। সবেমাত্র আজই এসেছে সে হাসপাতালে। হাত-মুখ ধুতে-ধুতে সে কম্পাউন্ডারের কাছে হাসপাতালের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিল, এমন সময় হাজির কচিকাঁচার দলটি। এখনই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তারা।

ওয়াশিম তাদের যতই বোঝানোর চেষ্টা করে পুরনো ডাক্তারবাবু বদলী হয়ে চলে গেছেন। সে এখনই অনেক – অনেক দূর থেকে এসেছে। কাল জয়েন করবে। তারপর নেবে এলাকার মানুষের সেবার ভার। কে শোনে কার কথা। কচিকাঁচারা নাছোড়বান্দা। তাদের দাদাজান মরণাপন্ন সুতরাং যেতে হবে।

ঘরে ঢুকে রোগীকে দেখে তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া হয়নি ওয়াশিমের। কিন্তু তাঁর শিওরে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখে তার হৃদ-স্পন্দন বেড়ে গেল। সে কোন রকমে বলল,এই যে আমাকে একটু পানি দিতে বলুন না, আসলে আমি সকাল থেকে কিছু খাইনি।

নাদিরা এমন ভাবে বসে আছে যে ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। তাই জোহরা বলল, আপনি চিকিৎসা শুরু করুন, আমি পানি আনছি।

কুলসুমও তাকে অনুসরণ করল। তার আগে কচিকাঁচাদের ভিড়টিকে ধমক মারল,এই তোরা খেলগে যা, ভিড়ে তোদের দাদাজানের অসুখ বেড়ে যাবে। হৈ-হৈ করে খামারের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফিরে গেল কচিকাঁচারা। নতুন উদ্যমে শুরু করল পুরনো খেলা। তাদের ব্যাট-বলের দাপটে খামারের একপাশে ওসমানের শখের বাগান তছনছ হয়, কারো সেদিকে খেয়াল নেই।

ওসমান এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি ডাক্তারের হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেখে বললেন, তুমি কি ভাবছো ডাক্তার, এই বুড়োটা খুব অসুস্থ, ভুল, একেবারে ভুল, বিশ্বাস না হয় আমার সাথে পাঞ্জা লড়ে দেখো।

একি তোমার হাত কাঁপছে কেন? তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ওসমান। পালঙ্ক থেকে নেমে চেয়ারে বসাডাক্তারকে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। বললেন, মনে হচ্ছে আমার চেয়ে তুমিই বেশী অসুস্থ ।

ডাক্তারের হাতের সিরিঞ্জ কেড়ে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এটা তোমারই বেশী দরকার। ওয়াশিম তখন হতভম্ব হয়ে চিঁ-চিঁ করে বলে চলেছে, বিশ্বাস করুন, আজ সারাদিন আমি কিছু খাইনি,আজ সারাদিন আমার ট্রেনে বাসে কেটেছে।

ডাক্তারকে ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করেছেন ওসমান। নাদিরা এতক্ষণ শুধু চুপিসাড়ে বলছিল, ছি: আব্বা আপনি এ-কি করছেন। এখন সে ডাক্তারের, আমাকে বাঁচান,আর্তনাদ শুনে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না।

নাদিরা প্রথমে চেষ্টা করল ওসমানের হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নেওয়ার। কিন্তু বৃদ্ধ ওসমানের হাতে যেন একশো হাতির বল। ওদিকে আতঙ্কিত ডাক্তার তখনও কাতর স্বরে বলে চলেছে, কে আছো আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও, প্লিজ।

নাদিরার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। একটি মানুষ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হয়ত ওভাবেই আর্তনাদ করেছিল, নাদিরা কাছে ছিল না। আজ সেই আর্তনাদ বুঝি ধ্বণিত হচ্ছে এই অসহায় তরুণের মুখে। হিতাহিত ভুলে সে উপুড় হয়ে পড়ল ডাক্তারের উপর। ক্রমাগত বলে চলল,না, তোমাকে আমি মরতে দেব না। কিছুতেই মরতে দেব না!

নাস্তাপানির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল জোহরা। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তার হাত থেকে ট্রে খসে পড়ল মেঝেয়। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল চিনামাটির পেয়ালা, তস্তরী, গেলাস। সেই শব্দেও সম্বিত ফিরল না নাদিরার। সে ডাক্তারটিকে জড়িয়ে ধরে তখনও সে বলে চলেছে, না, তোমাকে আমি মরতে দেব না, কোনমতেই মরতে দেব না।

ভাঙা জিনিষপত্র কুড়ানোর কোন চেষ্টা করল না জোহরা। সে টেবিলে পড়ে থাকা মোবাইলটা নিয়ে নম্বার টিপল। তার স্বামী ওপ্রান্ত থেকে হ্যালো বলার আগেই সে বলল, এক্ষুণি একবার বাড়ি এসো, একটা দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

কুলসুমও বড় জাকে অনুকরণ করে স্বামীকে একই খবর দিল মোবাইলে। নাদিরা তখনও প্রলাপের মত বলে চলেছে কথা গুলি। তার মাথার ওড়না খসে গেছে, আলুথালু হয়ে গেছে বিশাল চুলের রাশি। শাড়ির আঁচল যেন ঝটপট করছে জবাই করা সাদা মুরগির মত।

সাইক্লোনের মত মটোর বাইকে ছুটে এল দুই ভাই। পুলিশের মত বুটের আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকল দুজনে। বড় ভাই চুলের মুঠি ধরে নাদিরাকে আছড়ে ফেলল মেঝেয়। মেজজন চুলের মুঠি ধরল ডাক্তারের। প্রাণভয়ে ভীত তরুণ ডাক্তারটি ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল। সে হাতজোড় করে বলছে, আমি কোন দোষ করিনি, আমাকে বাঁচতে দিন।

আহত বাঘিনীর মত মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে নাদিরা। সে ডাক্তারের ব্যাগ থেকে অপারেশনের ছুরি হাতে তুলে নিয়েছে। অশ্রুভরা কন্ঠে সে বলল, ছাড়ুন ওকে, নইলে আপনাকে আমি ছুরি মারব।

বৃদ্ধ ওসমানের হাত থেকে পড়ে গেছে সিরিঞ্জ। তিনি মেজছেলের গালে এক চড় মেরে বললেন, দূর হ হতভাগা, কে তোকে এখানে দাদাগিরি করতে ডেকেছে?

বড় ছেলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তাকেও একটা চড় কষালেন ওসমান। বললেন, পাগল হলেও এই সংসারের কর্তা এখনও আমি। যা কিছু বিচার করার আমিই করব।

প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবের পরে প্রকৃতি যেমন স্থির হয়ে যায় ঘরটির অবস্থাও এখন তাই। ওসমান বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুয়ালা ইল্লা বিল হিল আলিয়্যেল আজিম, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এই পৃথিবীর কিচ্ছু হয় না। আজ এখানে যা ঘটল তা পাড়াগাঁয়ে তো দূরের কথা,সিনেমাতেও হয় না। তার জন্য দায়ী আমি। আয়াজের মৃত্যুর পর থেকে আমার মাথা আর কাজ করে না। অথচ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। ডাক্তার, তোমার বাড়িতে আর কে আছে?

ডাক্তার কাঁপতে-কাঁপতে বলল, জ্বী হুজুর, দুনিয়ায় আমার মা ছাড়া আর কেউ নাই। তার স্বপ্ন পুরণ করতে কত কষ্ট করে ডাক্তার হলাম। কতদিন অপেক্ষা করার পর যদিওবা এই চাকরীটা জুটল, তাও ছাড়তে রাজী আছি, আপনি শুধু আমাকে প্রাণে মারবেন না।

–বেশ মারব না, তার বিনিময়ে তোমাকে আমার এই বিধবা মেয়েটির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। আজই নিকাহ করতে হবে ওকে।

–আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে, সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব আমি।

–না, গোলাম হতে হবে না, তুমি এ-বাড়ির জামাই হয়ে থাকবে।বলে দুই ছেলের

মুখের দিকে তাকালেন ওসমান। বললেন,আমার জমি-সম্পত্তি ব্যবসা সবই তো তোদের দিয়েছি বাপধনরা। কোনদিন কিছু চায়নি,আজ চায়ছি ওই দু:খী মেয়েটির সুস্থ জীবন, তাও কি তোরা দিবি না?

–আপনার কোন হুকুমটা আমরা তালিম করি না, আব্বা।

–আপনি যা বলবেন তাই হবে। দুই ছেলে যেন এক স্বরে বলে উঠল।

–বেশ তাহলে একজন গিয়ে মৌলভী ডেকে আন। কই গো বৌমারা, তোমরা এখন আমার হবু জামাইটিকে কিছু খেতে দাও। তারপর ওদের দুজনকে গোসল করিয়ে আনো।মগরবের পরেই ওদের নিকা দেব আমি। বলেই তিনি চোখ ফেরালেন নাদিরার দিকে। হাত থেকে ছুরি খসে পড়েছে মেয়ের। লাজুকলতার মত দাঁড়িয়ে আছে সে, যেমনটি তিনি প্রথমবার দেখেছিলেন।

কবিতা

কল্পলোকের জীবন-কাব্য

মৌনী রোম্মান ৷ *নিজেকে নিয়ে বলার মতোন কোন অবস্থানে এখনও পৌঁছাতে পারিনি, পড়াশোনা করছি । আমি মোটেও লেখক নই । সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক শুধু । লেখালেখির নিয়ম-নীতি সম্পর্কে একদম অজ্ঞ । কিশোর বয়সের প্রথম প্রহর থেকে ডায়রির সাথে সখ্যতা । সেই আমার অব-লেখনের সূচনা । গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই মনের মধ্যে অনেক কথাই অনুচ্চারিত থেকে যায় । সেগুলো প্রকাশের তাড়না থেকেই, শুধুমাত্র নিজের জন্য লেখি । এজন্যই আমার লেখাগুলোও বড্ড স্বার্থপর । অনেকটা সময় পর্যন্ত সব লেখা শুধু ডায়রিতেই আবদ্ধ ছিল । চলন্তিকায় যাত্রা শুরুর আগ পর্যন্ত, আমার লেখার একমাত্র পাঠক ছিলাম - আমি । হঠাত্ই অর্বাচীনের মত চলন্তিকায় একটা লেখা পোষ্ট করা, আর সবার ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণায় আমার চরম দুঃসাহসী হয়ে উঠা । তাই যে কোন দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো*

ছিল এক অরণ্য-রাজ্য শান্তি-শুভ্রতায় পরিপূর্ণ
হরিত হৃদের কোমল রাজা-রানী সকলের অর্হ,
ধীরে ধীরে রাজ্যপাট এতো দূর চলে যায়
রাজা-রানীর ছায়া পড়ে না চোখের তারায়,
রইল শুধুই এক রাজকন্যা আর রাজপুত্র
বঞ্চকের শঠতায় হল অমোচনীয় দুরত্ব,
আঁখিজলে ভাসে বিমূর্ত রাজা-রানী
সংসর্গহীন রিক্ত প্রাসাদের নন্দিনী,
কার পড়েছে এমন দায় -
রাজকন্যার জন্য অশ্রু ঝড়ায় !

ভাগ্য পরিক্রমায় কন্যা হল মায়াবী রাজ্যের রানী
রানীর দুই কুমার প্রকৃতির দ্বৈত মূর্তি,
নদীর মতোন শান্ত বয়, রাগলে দাঁড়ায় হিমালয়
এ যেন আর কিছু নয়, মায়া রাজার পরিচয়,
মায়া কুমারী প্রকৃতির শান
ষড়ঋতুর অনুভবে বাঁধা তার প্রাণ,
সে দ্বীপ রাজ্যে আছে স্নেহের খনি
মায়াকন্যা সুর গাঁথে – এই তো স্বপ্নপুরি ;

স্নেহে আর ভরে উঠে না রাজপুত্রের বুক
কবেই সে হয়ে গেছে ভালোবাসা থেকে দলছুট,
রানী তার বিড়াল তপস্বীনী
রাজ্য-সুখ খেলো যার শ্যেন দৃষ্টি,
সন্তানেরা তার মরুর বন্দী
ধূ-ধূ শুষ্কতা তাদের সত্তাজুরি,
গড়ে তোললো এক আপন গোর
লোক মুখে যার নাম হল প্রস্তর ।

কবিতা

মিতা ও আমার কাব্য

মোঃ ওবায়দুল ইসলাম ৷ *সহকারী ব্যবস্থাপক (বানিজ্যিক) , বেঙ্গল ইন্ডিগো লি:*

প্রেম ভালবাসা ? এর মধ্যে না যাওয়াই ভাল,
শুধু কেড়ে নেয় সুখ, জীবনের আলো।
আমি মিতাকে ভালবাসি, জীবনের চেয়ে বেশি।
সর্বদা ছায়া হয়ে আমার পিছু পিছু থাকে,
আমার শিরায় উপশিরায় শুধু তাকে ডাকে।
আমার অস্থি মজ্জায় মিতা মিশে আছে,
দেহ বিনা সব পড়ে আছে তার কাছে।
অথচ তাকে পাওয়া হল না,পাই শুধু বেদনা !
আমি দারিদ্র-মিতাও তার পিতামাতার
কাছে অসহায়
নারী মাত্রই অসহায়, আর কি পাওয়া হয় !
হয়নি পাওয়া ; অথচ ভাল বাসাবাসি
মরন আমার দরজায়, আর সে করে হাসাহাসি।

কবিতা

মৃত্যু বিলাস

এম, এ, কাশেম

নিরব ভালবাসার গুমোট চিৎকার
ঝল্‌সে উঠে যদি একবার
ওগো -একবার এই দেহে , এই রক্তে-
রক্তের অন্দরে উষ্ণ আবর্তে
তোমার সোহাগী পরশে
সুখদ শীৎকারে ;

শতবার মরবো ওগো -মরবো
দু'টি ডানার ঝাপটায় পরস্পরে
পূর্ণিমার তারা ভরা রাতে
আকাশ ছায়া ফেলে
টল-মল জল সরোবরে
জলের ভিতরে উজানে
সাতাঁর কেঠে কেঠে যেতে
আহা পাশা-পাশি পূর্ণিমা রাতে
জলের নরম শরীরে সাতাঁর কেঠে-কেঠে যেতে
তোমার হলুদ ঠোটে ঠোট পুরে
তোমার পুচ্ছের 'পরে পুচ্ছে
নৃত্য-রতা ময়ুর নাচের ঝংকার তোলে
আমার নাও চলে উজানে

তোমার নদীর ঢেউয়ের মিছিলে তালে-তালে
পালেতে বাতাস লেগে চলে উজানে
উজানে-জোয়ারে জলের শরীরে জল নাচে আহা
তরঙ্গের ঝড় উঠে তোমার নিতম্বে ,
জীবন-বৃক্ষের উষ্ণ আতা ফল দু'টো তোমার
দু-হাতের সোহাগী মুঠোয় ধরে সুনিপুন আদরে
তোমারই পৃথিবীতে থাকবো ঝুলে ওগো-
জোয়ারের জলে ছিপ ফেলে শুয়ে রবো
ভাটির নদীর পলি উর্বরা সোনালী চরে
হংস মৈথুন শেষে শ্রান্তির পরম উল্লাসের আয়েশে ;

মৃত্যু ?
আহা মৃত্যু !
আমৃত্যু বিলাস আমার ওগো -
মরতে একবার-শতবার-হাজার বার
তোমার বুকে মাথা পেতে
তোমারই বাহুডোরে
হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে
সুখ-স্বপ্নে- ঘুমে মৈথুনের আয়েশে।

কবিতা

ভোরের ডাক

আহমেদ রব্বানী ✉ *আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। সাদামাটা জীবনযাপন পছন্দ করি। নিজ কাজের প্রতি দায়বদ্ধ। লেখালেখি করি মনের তাড়না থেকে। ভালবাসি মা, মাটি ও মানুষকে। আমার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হোক কখনোই তা কামনা করি না। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থঃ জননী ও জন্মভূমি (ছড়াগ্রন্থ) প্রকাশিতব্য গ্রন্থঃ দুঃসময়ের মুখোমুখি (কাব্যগ্রন্থ), শুধু তোমার জন্য (কাব্যগ্রন্থ), ফেরা (কাব্যগ্রন্থ), স্বপ্নপুরাণ (উপন্যাস), কাগজের ফুল (উপন্যাস), বাংলাদেশ (উপন্যাস), প্রিয়বন্ধু (উপন্যাস), অভিযান (কিশোর উপন্যাস), গন্তব্য অচিনপুর (কিশোর উপন্যাস), খোকন যাবে চাঁদের দেশে (শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ), ফুলের হাসি শিশুর হাসি (শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ), চাঁদের পাহাড় (শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ)।*

ভোরের সওগাত নিয়ে
কে এলো? মুসাফির ওই
শিউলি ঝরা প্রাতে
সোনালী ভোরের আলোয়
রাঙাপথ ধরে
আমার আঙিনাতে!

স্বপনে আমি দেখেছি যারে
এলো সে আজ আমার দ্বারে!
উচাটন মন
তাই অনুক্ষণ
চেয়ে থাকে তারই আশার পথে!

আসে যদি তবে দেয় না সাড়া
বিরহে মন পাগলপারা
এ দুটি আঁখি
ও মন পাখি
সদাই যে তারই ছবিটি আঁকে!

ভোরের সওগাত নিয়ে
কে এলো? ওই মুসাফির-
শিউলি ঝরা প্রাতে
সোনালী ভোরের আলোয়
রাঙাপথ ধরে
আমার আঙিনাতে!

ধর্ম ও দর্শন

সালাত আদায়ের গুরুত্ব

আরিফুর রহমান ✉ *লেখালেখি আমার পেশা নয়। আমি শখের কারনে লিখি।*

সালাত শব্দটি আরবী। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এভাবে ব্যবহার হলেও এর ফারসি অর্থ নামাজ শব্দটির সাথেই আমরা বেশ পরিচিত। বাংলা ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ হলো দোয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি। 'সালাত' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে মহান প্রভূ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদাতের নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহর খুবই পছন্দের ইবাদত হলো সালাত অথবা নামাজ। এই ইবাদতের গুরুত্ব এতই বেশী যে, কেউ যদি বলে, ''আমি ঈমান এনেছি, ইসলাম কবুল করেছি" তবে তার সর্ব প্রথম দায়িত্ব হলো নামাজ আদায় করা, অর্থাৎ ঈমানের প্রথম শর্ত ও দাবী হলো নামাজ আদায়। নামাজ আদায় না করে কেউ যদি নিজেকে মুসলমান দাবী করে, তবে তা হবে পাগলামীর শামিল। রাসূল করীম (স:) অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ''যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো"। নবী করীম (স:) আরও বলেছেন, ''মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ" অর্থাৎ মুসলমান নামাজ আদায় করে আর কাফির নামাজ আদায় করে না। হযরত মুহাম্মদ (স:) আবার তাও বলেছেন যে, ''নামাজ হলো বেহেস্তের চাবি।"

নবী করীম (স:) বলেছেন যে, ''সাত বছর বয়সে নিজ সন্তান সন্ততিকে নামাজের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাজ আদায় না করলে তাদের প্রহার কর এবং পৃথক পৃথক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা কর"।

নামাজ আদায়ের গুরুত্ব কতো যে অধিক তা লিখে শেষ করা যাবে না। যাঁর হাতে আমাদের জীবন ও মরণ আমাদের অস্তিত্ব, যিনি বিশাল এই আকাশ ও জমীনের মালিক চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নত্র, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি সবকিছুর মালিক, যাঁর একটু ইশারায় সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে, সেই শক্তিধর মহান সত্বা তাঁর ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনে নামাজ কায়েমের হুকুম করেছেন বিরাশি বার। অথচ তাঁর মতো হতভাগা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকজন নেই। আমাদের নিজেদের জন্য খুবই কল্যাণকর বলেই করুনাময় প্রতিদিন পাঁচ বার নামাজ আদায় ফরজ করেছেন। নামাজ আদায়ের গুরুত্ব আল্লাহ পাক এতো বেশী দিয়েছেন যে, তিনি অন্যান্য ফরজ ইবাদত যেমন রোজা উপযুক্ত কারণে ক্বাযা অর্থাৎ পরবর্তিতে আদায়ের সুযোগ রেখেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়নি যার জন্য নামাজ শুধুমাত্র কাযা করা যাবে, একে বারে ছেড়ে দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বিশেষ েত্র নারীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরোপুরি মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু ক্বাযা আদায় করার কোন সুযোগ রাখেন নি।

গল্প

আগে পরে কিছু নেই

মোস্তাক আহমেদ ✉ *বই পড়তে ও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি । পেশায় ছাত্র শিক্ষক দুটোই। মাস্টার্স করছি এবং একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে আছি ৯-১০ মাস হল। সাহিত্যের কিছু বুঝি না। যা ভালো লাগে তাই পড়ি। অনেক অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে হয়। কত-শত মানুষ, কত হাসি, কত গান, কত দুঃখ! কিন্তু হায়, লেখক হিসেবে আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত।*

'তোমার নাম নীল?'

এই নিয়ে তিনবার তিনি এই প্রশ্ন করলেন। কোন একটা কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত এরকম একটা ভাব। তার ভিতরে যেন অনেক কষ্টে আমার নাম জিজ্ঞেস করার সময় বের করছেন।

'জী স্যার। আকাশের রঙে নাম। বাংলায় নীল, ইংরেজিতে 'ব্লু'। আরবীতে কি জানি না স্যার।' মেজাজটা একটু খারাপ হলেও দাঁত কেলিয়ে হাসি।

'ভাল নাম কি?'

'ভাল নাম স্যার, অবনীল।'

'অবনীল কি ধরনের নাম?'

'খুব সুন্দর নাম স্যার। নীলের সাথে তৎসম উপসর্গ 'অব' যোগে অবনীল। অব উপসর্গ অল্প বোঝাতে ব্যবহার হয়। সে হিসেবে অবনীল পছন্দ না হলে আপনি আমাকে হালকা নীল ও ডাকতে পারেন। কিছু মনে করব না।'

বাংলা ব্যাকরণে আমার জ্ঞান দেখে ওনাকে বিশেষ খুশি মনে হল না।

'আমি বলতে চাইছি, মোহাম্মদ, আহমেদ কিছু নাই?'

'না স্যার। আগে পরে কিছু নাই। আমার বাবা নাম রাখছিলেন। উনি জীবন নিয়ে নানা দার্শনিক ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। আমার মনে হয় নামের বাকিটা রাখতে উনি ভুলে গেছিলেন। স্কুল কলেজে আমার নামই হয়ে গেছিল 'অবনীল আগে পরে কিছু নাই'। নতুন কোন স্যার-ম্যাডাম রোল কল করলেই জিজ্ঞেস করতেন, শুধু অবনীল? আগে পরে কিছু নাই? সে হিসেবে স্যার আমার বন্ধুদের নামকরণ সার্থক।'

আমার বকবকানিতে বেশ বিরক্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে। হয়ত রেগেও গেছেন। তবে ব্যবহারে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে না। এই ধরনের অতি ভদ্রলোকগুলো সহজে রাগ প্রকাশ করেন না।

এদের রাগিয়ে মজা। চড়-থাপ্পড়ের আশঙ্কা কম। অবশ্য রেনুর দিক থেকে একটা ভয় থেকে যায়।

ভদ্রলোক রেনুর বাবা, শিল্পপতি আখতার হোসাইন চৌধুরী। রেনু আমার প্রেমিকা। সেই হিসেবে ভদ্রলোকের সাথে আমার জটিল একটা সম্পর্ক। রেনুই আজকে আমাদের মীটিং এর আয়োজক। তার মতে আমার তার বাবার সাথে দেখা করে ভালবাসার দাবি জানানো উচিত। সেই দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। অবশ্য কথাবার্তা যেদিকে যাচ্ছে তাতে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না।

'তুমি রেনুর বন্ধু?'
'জী, স্যার।'
'এত স্যার স্যার বলছ কেন? আমি তো তোমার স্যার না!'
'স্যার আপনাকে দেখেই একটা ভক্তি ভাব আসছে। সেই ভক্তি ভাব থেকেই স্যার বলছি।'
'যাই হোক আর স্যার বলবে না।'
'ঠিক আছে স্যার।'
এই বার মনে হল ভদ্রলোক একটু খেপছেন।
'কি করা হয়?'
রেনুর বাবা ভাববাচ্যে চলে এসেছেন। তাহলে ইনি সেইসব ব্যক্তিদের একজন যারা রেগে গেলে ভাববাচ্যে কথা বলা শুরু করেন।
'এখনও কিছু না। বেকার। একটু লেখালেখির চেষ্টা করি, কিন্তু কেউ ছাপাতে চায় না।'
'ছাপাতে চায় না কেন?' প্রশ্নের ভঙ্গীতে এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমার বস্তাপচা লেখা না ছাপানোরই তো কথা।
'প্রকাশকরা নতুনদের লেখা ছাপাতে চান না। তাতে তাদের ব্যবসা চলে না। অবশ্য ঠিকই করে। আমি প্রকাশক হলেও তাই করতাম। নতুন লেখকদের তাড়ানোর জন্য বিদেশী কুকুর পুষতাম।'
'প্রকাশকরা লেখক তাড়ানোর জন্য কুকুর পোষেন নাকী?' ভদ্রলোকের চোখে কৌতুক। একটু সহজ হয়েছেন মনে হচ্ছে।
'না এখনও না। আপাতত দারোয়ান দিয়েই কাজ চলছে। তবে আমার ধারণা অচিরেই কুকুর পোষা শুরু করবেন। আমরা নতুন লেখকেরা তখন দৌড়ানোর প্র্যাকটিস করে নিয়ে প্রকশকদের সাথে দেখা করতে যাবো।'
রেনুর বাবা শব্দ করে হেসে ফেললেন। বোধহয় উনি কল্পনায় আমাকে হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি পরা অবস্থায় কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাতে দেখতে পাচ্ছেন। আমার ভবিষ্যৎ দুরাবস্থার কথা ভেবে আমিও একটু হাসি।
'তো, রেনুকে বিয়ে করলে খাওয়াবে কি?'
বিপদ সংকেত। ভদ্রতা শেষ। এবার ডাইরেক্ট অ্যাকশান।
'জী, পরিকল্পনা আছে বিয়ের পর আপনার কোম্পানিতে জয়েন করব। সেই বেতনেই আশা করি আমাদের দুজনের চলে যাবে।' বিনীত ভঙ্গীতে বলি।
'তোমার লজ্জা করল না এরকম বলতে?' রেনুর বাবার মুখ রাগে থমথমে।
'স্যার, হবু শ্বশুরের কাছে বলতে আর লজ্জা কী?' আমি আরো বিনীত ভাবে বলি।
'তোমার মতো স্কাউন্ড্রেল কে রেনু কিভাবে পছন্দ করল? আশ্চর্য!'
'সেটা বোধহয় রেনুই ভালো বলতে পারবে। ওকে একটা ফোন দিয়ে জেনে নিলে মনে হয় ভালো হবে।'
'কিছু জানাজানির দরকার নেই। Now you get lost from here.' ভদ্রলোকের ফর্সা মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে।

আমি আর ঘাঁটালাম না। কিঞ্চিৎ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছি। এই সুন্দর বিকেলটায় সিকিউরিটি গার্ডের চড়-থাপ্পড় খাওয়ার কোন মানে হয় না। রেনুর বাবাকে লম্বা একটা সালাম জানিয়ে ওনার কথামত ওনার অফিস থেকে হারিয়ে গেলাম।

রেনুর বাবার বিশাল অফিস বিল্ডিং এর সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাই। এখন কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে থাকি। আপাতত কয়েকদিন রেনুর সাথে দেখা করা যাবে না। রেনুর জন্য একটু কষ্ট হয়। মেয়েটা বুঝতে পারে না যে ও যেটা চাইছে সেটা সম্ভব নয়। কোন সুস্থ মানুষ রেনুর সাথে আমার মতো একটা ভ্যাগাবন্ডের বিয়েতে রাজী হবে না। তর্কের খাতিরে নাহয় ধরলাম যে, আমি যদি ভদ্রভাবে রেনুর বাবার সাথে কথা বলতাম তাহলে হয়ত উনি বিয়েতে রাজী হতেন এবং হয়তোবা বিয়ের পর আমাকে তাঁর কোম্পানিতে চাকরী দিতেন (যেটা রেনুর ধারণা)। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

মনটা একটু তিতা তিতা লাগে। আমি হাঁটা শুরু করি। দেখি, শফিকের ওখানে যাই। বিকেলটা খুব সুন্দর। রেনুর সাথে কিছু সময় থাকতে পারলে এটা আমার জীবনের একটা চমৎকার বিকেল হতে পারত।

কবিতা

গনতন্ত্র তুমি কার?

মনির আহমদ ✉ *ষষ্ট শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় লেখালেখির আবির্ভাব, সপ্তম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মেজো ভাইয়ের সহযোগীতায় 'কিশোর দল ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। একসময় কলেজের কাঁচা ঘাস পারানো,ও ক্যান্টিনে আড্ডা দেয়ার সৌভাগ্য হলেও প্রবাস জীবন সব কেড়ে নিয়েছে। বহুবছর ধরে কবিতা লিখলেও কবিতার 'ক' বুঝা আজো সম্ভব হয়নি। শুনেছি মানুষ জীবন থেকে নাকি কবি হয়, সত্যিই কিনা আমি জানি না। তবে এখন আমি জীবনকে নিয়েই কবিতা লিখতে পছন্দ করি। স্বদেশের বুক থেকে ছিটকে পড়েছি চার বছর হলো । জানিনা কবে ফিরবো, প্রবাসের কারাগার যে আর ভাল লাগেনা।*

গনতন্ত্র তুমি কার?
তুমি কি সন্তানের জন্য নিখুত ভবিষ্যতের ছক আঁকা
আশাহত কোন বাবার?
তুমি কি ছেলে হারা কোন বৃদ্ধ মায়ের?
তুমি কি পিতাহীন কোন বীরাঙ্গনার কোলে
লালিত হওয়া সন্তানের?
নাকি অনাহারী'র বুকে মুখে পাহারাদারের নিষিদ্ধ রাইফেল?
গনতন্ত্র, হে গনতন্ত্র তুমি কার?

তুমি কি বছর বছর ধরে মাটিকে আকড়ে ধরে
বেচে থাকা কোন কৃষকের?
তুমি কি স্বপ্ন ভাঙ্গা কোন মুক্তিযোদ্ধার?
তুমি কি যাত্রীর আশায় প্রহর গোনা
কোন অভাগী রিকশাওয়ালার?
নাকি নেতার পকেটে ক্ষনিকে ক্ষনিকে
বদল হওয়া প্রচারিত স্ক্রিপ?

তুমি কি বটের ছায়ায় কবির কবিতায় উকি দেয়া কল্পনা?
তুমি কি সাংবাদিকের রক্তাক্ত রিপোর্ট?
তুমি কি জনতার রুদ্ধকন্ঠ, বুকের বুলেট,
তুমি কি হিংস্রের থাবা,
নানা অজুহাতে চেয়ার দখলের সরযন্ত্র,গনতন্ত্র,
তুমি কি সত্যিই গনতন্ত্র?

তুমি কি মন্ত্রীর দাপটে বিচুর্ণ হওয়া কোন মেধাবী কলম?
তুমি কি কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের হাসি, উল্লাস?
তুমি কি কামরুল হাসানের পতাকা, ২৬শে মার্চ,
১৬ই ডিসেম্বর, বায়ান্ন, একাত্তুর?
নাকি জয়নুল আবেদিনের ছবি, দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ।
তুমি কি মুয়াজ্জিনের মিষ্টি মধুর আযান ধ্বনি?
সংখ্যালঘুর অধিকার?
নাকি নজরুল সুকান্তের কবিতা মিথ্যে, মিথ্যে প্রলাপ?
তুমি কি জীবন, নাকি মৃত্যু,তুমি কার?
তুমি কি আমার?
তুমি কি আমার স্বাধীনতা,
হিমালয়, মহাসাগর, মহাকাশ সমান স্বাধীনতা?
তবে কেন তুমি ক্ষনিক হাসো, ক্ষনিক কাঁদো,
আবার ক্ষনিক যুদ্ধ করো?
তবে কেন তুমি রক্ত হয়ে আমার বুকে ঝড়ো?
গনতন্ত্র, তুমিতো আজ পোকায় খাওয়া
কোন পুড়নো বইয়ের রঙিন মলাট।

প্রবন্ধ

ন্যায্যাধিকার বঞ্চিতা

জায়েদ বিন জাকির

আমাদের দেশে মেয়েদেরকে অধিকার বঞ্চিত করে রাখার ইতিহাস কবে থেকে সেই সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। অনেক যুগ পার হয়ে গেলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেকতোখানি পরিবর্তন এলো? আমাদের দেশে মেয়েরা কি পাচ্ছে তাদের ন্যায্যঅধিকারগুলো? মেয়েদের কে বঞ্চিত করার কতো কৌশল আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত।কতোভাবে আমরা তাদেরকে ঠকিয়ে যাচ্ছি। তা না হয় হলোই । তাতে আমাদের কি? তাই না? আমাদের গাবাঁচিয়ে চলতে পারলেই হল। কার না কার কি সমস্যা তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবোই বা কেন? আজ তো আমরা অনেক প্রগতিশীল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কারকি অধিকার এলো গেলো তা নিয়ে ভাবার সময় কই আমাদের? অনেক দুঃখ ভরা কথা রয়েগেছে এই আক্ষেপের পিছনে।

কিছুদিন আগে জানতে পেরেছিলাম আমাদের দেশের কিছু প্রগতিশীল নারী ইসলামধর্মের উত্তরাধিকার বিধানের পেছনে বৈষম্য খুঁজে পেয়েছেন আর তার পিছনেআন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছেন। আন্দোলনের প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি শুধু এইটুকুই বলতেচাই যে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীই শুধু নয় বরং প্রলয়ঙ্করীও বটে। ইসলামী শরিয়তেরবিধান অনুযায়ী পিতার সম্পত্তিতে কোনো মেয়ে পাবে তার ভাই এর অর্ধেক। ব্যাস!শুরু হয়ে গেল নারীবাদীদের জোর গলায় চিৎকার। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে চিলেরপেছনে ছোটা যেমন মূর্খতা তেমনি শরিয়তের জ্ঞান না নিয়ে ওটা নিয়ে কথা বলতেযাওয়া তার চাইতে বেশী মূর্খতা। উত্তরাধিকার বিধানের শুধু একটা দিক দেখেইতারা বলে দিলেন ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে। কেমন হাস্যকর কথা! অথচতাদের কি জানা আছে, পুরুষরা সম্পত্তি পায় শুধু মাত্র বাবার কাছ থেকে, আরসেখানে একজন মেয়ে পায়, বাবা, স্বামী, ভাই, ছেলে ইত্যাদি বিভিন্ন জনের

কাছথেকে? ছেলে শুধু মাত্র বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি পাওয়ার পরেও সেখান থেকেআবার বোনকে তার ন্যায্য অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। ইসলাম তাহলে কি নারীর প্রতিবৈষম্য করলো নাকি নারীকে অধিকার বেশী দিল? এইবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি, আপনাদের জানা আছে কি, হিন্দু ধর্মে একজন নারীকে উত্তরাধিকার দেয়া হয় কি না? আশা করি উত্তরটা দয়া করে আপনারাই খুঁজে নিবেন।

আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। বলা যেতে পারেআমাদের সমাজ সুকৌশলে তাদের কে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সব রকম উপায় খুঁজেনিয়েছে। কতো জন বাবা আমাদের সমাজে তাদের মেয়েদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়েছে? কয়টা ভাই তাদের বোনকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়েছে? ক'জন স্বামী তার স্ত্রীকেতার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে? মোহরানার টাকাই যেখানে স্বামী প্রবররা দেন নাসেখানে সম্পত্তির চিন্তা করা তো আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। গ্রামাঞ্চল, শহরসবদিকেই দেখুন। কি সুন্দর করে মেয়েকে সম্পত্তি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে দেয়াহচ্ছে। অথচ আমরাই নিজেদের ধার্মিক বলে জাহির করছি। ইসলাম ধর্মে অন্যেরঅধিকার আত্মসাৎ করাকে চিরতরে নিষিদ্ধ তথা হারাম করেছে এবং হারাম ভক্ষণেরভয়াবহতা বর্ণনাও করেছে। বহুল প্রচলিত একটি পবিত্র হাদীসে মহানবী হযরতমুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেন, 'হারাম দ্বারা প্রতিপালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশকরবে না'। ইবনে মাজাহ শরীফের আর এক হাদীসে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লহ (সাঃ) বলেন, 'যে তার ওয়ারিসকে উত্তরাধিকার থেকেবঞ্চিত করলো, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ওয়ারিস থেকে বঞ্চিতকরবেন'। বুখারী শরীফের অপর এক হাদীসে হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রাঃ) থেকেবর্ণিত, রসুলুল্লহ (সাঃ) বলেন, 'কেউ যদি অন্যায় ভাবে কারো এক বিঘৎ জমিআত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন ওই জমি বরাবর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকে দেয়াহবে'। মোহরানা সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসথেকে জানা যায়, রসুলুল্লহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে মোহরানারবিনিময়ে বিয়ে করল কিন্তু তার ইচ্ছা যে সে তা পরিশোধ করবে না; সেব্যভিচারী'।

উপরোক্ত হাদীসের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করলে আমাদের রক্তের বিশুদ্ধতাসম্পর্কে ধারণা খুব সহজেই করে নিতে পারি। নামাজ কবুল হবার প্রথম শর্তই হল, শরীর পাক হতে হবে। অজু গোসল করে কিভাবে আমার শরীর পাক হতে পারে যদি নাআমাদের গ্রহন করা অন্ন, আমাদের অর্থ অন্যের হক্ব তথা অধিকার থেকে মুক্ত নাহয়? কিভাবে আমাদের নামাজ কবুল হতে পারে, যদি আমরা আমাদের মা, বোন, স্ত্রী'র প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেই? ভেবে দেখার সময় এসে গেছে।আমার পিতা যদি আমার ফুফু অর্থাৎ তার বোনকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন তাহলেকি তিনি আমাকে হারাম সম্পদ দ্বারা প্রতিপালন করেন নি? আমার পিতা যদি আমারমা'কে তার ন্যায্য মোহরানা পরিশোধ না করেন, তাহলে কি তিনি আমাকে ব্যভিচারকরে জন্ম দেননি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কোথায়? আর কেই বা এই প্রশ্নের উত্তরখুঁজতে যায়?

অনেক বিবাহিত পুরুষের ধারণা বাসর রাতে বৌয়ের কাছ থেকে মোহরানা মাফকরায়ে নিবে। এই বিধান আমাদের শরিয়তে কোথায় আছে বলতে পারেন? নাকি কোথাওমোহরানা মাফ হয়ে যাবে এমন কিছু বলা আছে? পবিত্র কোরান শরীফের সূরা নিসা এর ৪নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলা আছে, স্ত্রী'র মোহরানা দিয়ে দেবার পরে যদি সেস্বেচ্ছায় তা থেকে কিছু দেয় তবে তা গ্রহন করা বৈধ।

আমি আয়াতটির তর্জমা উল্লেখ করছি। "আর স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করনিঃস্বার্থভাবে; কিন্তু যদি এর কোন অংশ তারা তোমাদের দিতে খুশি হয় তবে তাগ্রহন কর সানন্দে, তৃপ্তির সাথে"। জোর করে স্ত্রীর কাছ থেকে তথাকথিত মাফচেয়ে নেয়া কি তার উপরে জুলুম করা নয়?

আমাদের ভেবে দেখার সময় এসে গেছে। এইভাবে আর কতোদিন চলবে? কতোদিন এইভাবেআমাদের সমাজের মেয়েদের আমরা বঞ্চিত আর নিষ্পেষিত করে রাখবো? যতোদিন পর্যন্তআমাদের সমাজে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততোদিন পর্যন্তআমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সম্ভব নয়।

কবিতা

ঈশ্বরের ছবি

আলমগীর কবির ₪ *যখন কলেজে পড়তাম তখন থেকেই লেখালেখির খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আত্ম বিশ্বাসের অভাবে হয়ে উঠেনি। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ছোট গল্প এবং হুমায়ুন আহম্মেদ, সুনীল গঙ্গোপধ্যায়, মানিক বন্দোপধ্যায় সহ বেশ কিছু লেখাকের উপন্যাস পড়তে খুব ভাল লাগে। আগে কবিতা পড়তে ভাল লাগত না তবে এখন ভাল লাগে।*

তুমি কখনও ভদ্রপল্লীর বৈঠকখানায় বসে বিস্তর পূণ্যের পসরা সাজাওনি।
আবার কখনও ইতর পল্লীর ছিদ্র ছাউনিতে অভিসপ্ত বৃষ্টির ফোটা বিকীর্ণ করনি।

তোমার অবস্থান সহ-অবস্থান,
তুমি বৈঠক-খানায়ও নেই,
তুমি ছিদ্র ছাউনিতেও নেই।

তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টা হিসাবে,
তুমি সৃষ্টির স্রষ্টা, তুমি স্রষ্টা নও।

সকল অস্বস্তিতে তোমার অস্তিত্ব,
তোমার অস্তিত্ব অস্বস্তির নয়।

তোমার অস্তিত্ব নামপদে নয়,
তোমার অস্তিত্ব বিশেষণে।

কেউ তোমাকে ঈশ্বর রূপে,
কেউ তোমাকে ব্রহ্মা রূপে,
কেউ তোমাকে বিধি রূপে সৃষ্টি করেছে।

তুমি মুসলিম সৃষ্টি করনি,
তুমি হিন্দু সৃষ্টি করনি,
তৃমি খ্রিস্টান সৃষ্টি করনি।

সকলে তোমাকে,
তার মত করে,
তোমাকে সৃষ্টি করেছে।

তুমি কারওর নও,
সকলেই তোমার।

তুমি নিরাকার নও,
সব আকারই তোমার আকার।

তোমার কোন আসন নেই,
তোমার কোন বসন নেই।

সকল বসনই তোমার আসন
সকল আসনই তোমার বসন।

সকল নাশে তোমার বিনাশ,
সকল সৃষ্টিতে তোমার সৃষ্টি।

তুমি অসুখ সৃষ্টি করনি,
তৃমি নরক সৃষ্টি করনি।

সুখ তোমার সৃষ্টি,
স্বর্গ তোমার সৃষ্টি,

তুমি সকল গুণের,
তুমি সকল সুখের।

তুমি সকল আশার,
তুমি সকল ভালবাসার।

শিক্ষামুলক গল্প

একটি অসাধারন গল্প!

শাম্মী শিল্পী তুলতুল

একদিন এক যুবক একজন আলেমের কাছে এসে বললঃ "হুযুর, আমি একজন তরুণ যুবক । কিন্তু সমস্যা হল, আমার মাঝে মাঝে প্রবল খায়েশ কাজ করে । আমি যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করি, তখন আমি মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে পারি না । আমি এখন কি করতে পারি ?"

তখন ঐ আলেম কিছুক্ষন চিন্তা করলেন । চিন্তা করার পর তাকে একটা দুধ ভর্তি গ্লাস দিলেন । গ্লাস পুরোটায় দুধে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল ।
অতঃপর ঐ আলেম তাকে বললেনঃ "আমি তোমাকে বাজারের একটি ঠিকানা দিচ্ছি, তুমি এই দুধটুকু সোজা সেখানে পৌছিয়ে দিয়ে আসবে । ঐ আলেম তাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, গ্লাস থেকে এক

ফোঁটা দুধও যাতে না পরে । অতঃপর ঐ আলেম, উনার এক ছাত্রকে ঐ যুবকের সহযোগী করে আদেশ দিলেনঃ "তুমি এই যুবকের সাথে বাজারে যাও এবং সে যদি যাওয়ার সময় এই গ্লাস থেকে এক ফোঁটা দুধও ফেলে দেয়, তাহলে তুমি তাকে চরমভাবে পিটাতে থাকবে ।

ঐ যুবকটি সহজেই দুধটুকু বাজারে পৌছিয়ে দিল এবং এই সংবাদ হুযুরকে জানানোর জন্য দৌড়ে ছুটে আসল ।

হুযুর জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি যাওয়ার সময় কয়টি মেয়ের চেহারা দেখেছ?"

যুবকটি সবিস্ময়ে বললঃ "হুযুর, আমি তো বুঝতেই পারি নি আমার চারপাশে কি চলছিল । আমি তো এই ভয়েই তটস্থ ছিলাম যে, আমি যদি দুধ ফেলে দিই তবে রাস্তায় সমবেত সকল মানুষের সামনে আমাকে মারা হবে ।

হুযুর হাসলেন এবং বললেনঃ "মুমিনরা ঠিক এভাবেই আল্লাহকে ভয় করে । এবং মুমিনরা সবসময় চিন্তা করে, যদি সে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ঐ দুধের ন্যায় ছিটকে ফেলে তবে তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামত দিবসে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সামনে তাকে অপমানিত করবেন । এভাবে সর্বদাই বিচার দিবসের চিন্তা, মুমিনদের গুনাহ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে ।"

বই আলোচনা

ফেরদৌসীর শাহনামা ও হিন্দুস্থান

তানভীর আহমেদ সিডনী

প্রায় হাজার বছর ধরে শাহনামা আমাদের বুকে ঠাঁই নিয়ে আছে। বিশেষত বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সোহরাব-রুস্তমের কাহিনী পঠিত হয়। গল্পাকারে উপস্থাপনের নজিরও দেখা যায়। ইরানের জাতীয় মহাকাব্য শাহনামা। শাহনামার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক রয়েছে কাহিনীসূত্রে। এই কাব্য নিয়ে কিছু কথা লেখা যেতে পারে।

শাহনামার লেখক ফেরদৌসী যার পুরো নাম হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসী। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জš§ তাঁর, শাহনামা লেখা শেষ হওয়ার দশ বছর তার মানে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। প্রায় ৩০ বছর সময় নিয়ে তিনি এই মহাকাব্য রচনা করেন। প্রায় ষাট হাজার শ্লোক রয়েছে এই মহাকাব্যে। ইরানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে আনা হয়েছে এই মহাকাব্যে। প্রচুর শাহ অথবা শাসক রয়েছে এই মহাকাব্যে। যারা এসেছেন আবার চলে গিয়েছেন কিন্তু তারা বৃহত্তর পার্সিয়ান সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে এনেছেন। শাহনামাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; সেগুলি হলো, পৌরানিক, বীরোচিত এবং ঐতিহাসিক পর্ব।

ফেরদৌসী বিষয়ে তুর্কমেনেস্তানের একাদশ শতকের কবি আনভারী লিখেছেন, " তিনি আমাদের ঈশ্বর আর আমরা তাঁর দাস।" শাহনামায় যে অসাধারণ প্রকৃতির বর্ণনা মিলে তা অসাধারণ। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ। পারস্যের উপত্যকায় হরিণেরা ঘুরে বেড়ায়। সম্রাটেরা যুদ্ধ শেষে শিকারে যায়। তবে নারী বিষয়ে ফেরদৌসী সচেতন ছিলেন। যাকে বর্তমান কালের বিচারে নিশ্চিতভাবে বলা চলে 'জেন্ডার কনসাস'। তার রাজকন্যারা পবিত্র, কোনো পাপ তাদের মাঝে নেই। এমনকি কখনো কখনো রাজমহিষীরা সম্রাটদের রাষ্ট্রপরিচালনা ও যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দেয়। শাহনামা পাঠ থেকে বোঝা যায় হিন্দুস্থানের সঙ্গে ইরানের শত্র"তা ছিল না। হিন্দুস্থানের শাসকরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা শুধু জ্ঞানই নয় রাজ্য হারানো শাহজাদারাও ঠাঁই নিয়েছেন হিন্দুস্থানে।

'শাহনামা'র যে মিথটি দীর্ঘকাল প্রচলিত তা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক আবার লেখকের গর্বে প্রাণিত হবার স্মারক। শাহনামা রচিত হওয়ার ১০ বছর পর সুলতান মাহমুদ গজনীর সম্মুখে তার উজির যুদ্ধজয়ের আনন্দে এই কাব্যের একটি শ্লোক পাঠ করেছিলেন। সুলতান শ্লোক শুনে মোহিত হয়ে কবির নাম জানতে চান। তখন উজির তাকে জানান যে, রাজরোষে পতিত হয়ে কবি অভাবী জীবন-যাপন করছেন। উল্লেখ্য যে শাহনামা লেখার সময় সুলতান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এটি লেখা শেষ হলে ফেরদৌসীকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। কিন্তু এই মহাকাব্য লেখা শেষ হলে সুলতান তাকে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাইলে তিনি প্রত্যাখান করেন। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ফেরদৌসীর জন্য ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়ে দেন। ততক্ষণে পরপারে চলে গেছেন মহাকবি ফেরদৌসী। তার কন্যা প্রত্যাখান করেন এই উপহার।

কবিতা

বর্ষা জাগায় স্মৃতি

সাখাওয়াৎ আলম চৌধুরী

আষাঢ়ে আজ ভিজে প্রকৃতি ঝিরঝির
অবিরাম বৃষ্টিতে,
বসে বাতায়নে চেয়ে আছি আমি
অপলক মধুর দৃষ্টিতে।
কত অপরূপ সুধা দিয়েছেন বিধাতা
তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে,
আজ প্রকৃতি দুলছে নব উচ্ছ্বাসে
উদ্যোমে নব কৃষ্টিতে।

অঝোরে ঝরছে বারিধারা আজ
প্রকৃতিতে জমছে মেলা,
বসে বসে আজ স্মৃতিচারণে সাঙ
হবে মোর বেলা,
বর্ষার দিনের হাজারো স্মৃতি
এলোমেলো করে খেলা,
সেই স্মৃতি গুলো প্রেয়সীর সাথে
হয়েছিল যখন চলা।

নব যৌবনের মধুর প্রারম্ভে চলছিল
জীবন একা,
হঠাৎ আমার সাদাকালো জীবনে
আবির্ভূত এক সখা।
উত্তেজনার চরম শিখড়ে হলো তার
সাথে দেখা,
নব উদ্যোমতায় চললো জীবন প্রেমের
মধুতে মাখা।

হঠাৎ প্রেমের আলোড়নে হাটছি আমি
স্বপ্নের পথে,
আকাশে আমি বাঁধিয়া বাড়ি রয়েছি
যেন তাহার সাথে।
অরণ্যে আমার বিশাল রাজ্যে মনদুলছে
পাখির সুরেতে,
নিঝুম রাত্রি আমার কাটে তারার জোৎস্নায়
জোনাক আলোতে।

সবই আজ স্মৃতির কুটিরে নিয়েছে
তারা নির্জনে ঠাঁই,
সেই প্রেয়সীর অগ্নির তুষে আমার হৃদয়
হয়েছে ছাই।
সব হারিয়ে আমি এখন দুঃখ জ্বালার
ফানুস উড়াই,
আমার গহীনের রক্তক্ষরণে কষ্টের জল
মিশে গঙ্গায়।

বর্ষা এলেই মনে পড়ে যায় সেই যে সব
সুখ স্মৃতি,
বেদনায় বিষে বিষাক্ত নীলে আজ সুখ
দিয়েছে মোরে ইতি।
এই ভূবনে বর্ষা আসে বর্ষা যায় চলে
তাহার নিজের গতি
বর্ষা এসে এই জগতে জাগিয়ে দেয়
আমার স্মৃতি।

কবিতা

জ্যামিতিক ভালোবাসা

মোকসেদুল ইসলাম ৷ *ব্লগে আছি বৈশাখী ঝড় নামের অন্তরালে। উত্তরাঞ্চলের এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় আমার জন্ম। ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে বড় হয়েছি। কিন্তু সত্য প্রকাশে একপা পিছুহটি নি। বাঁকা জিনিস কে সোজা করার চেষ্টা করছি নিরন্তর। ক্ষুব্ধ হই তখন যখন কেউ আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। প্রশংসা অপেক্ষা সমালোচনাই আমার ভালো লাগে। লেখার প্রতি পাগলামীটা ছোটবেলা থেকেই। ঢাকায় এসে জীবন-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াতে মাঝখানে কিছু দিন বিরতি। জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতেই বিএসএস এবং এমএসএস টা শেষ করেছি। যখন কিছু মনে হয় তখনই লিখতে বসি। খুব বড় মাপের একজন লেখক হওয়ার ইচ্ছা মনে পুষে রাখছি সবসময়। আমার কাছে সত্য চির সুন্দর। যদি কেউ সত্য বন্ধ করার জন্য মুখ বন্ধ করে দেয় তাহলে সত্যটা হাতের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে অনিচ্ছায়। অন্যায়, অবিচার আর মিথ্যার বিরুদ্ধে বৈশাখী ঝড়ের মতোই আমার তান্ডব চলে অবিরত।*

নদীর এমন নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া দেখে ভেব না সে খুব সুখে আছে
কথা বলতে পারে না বলেই সে বোবা কান্নায় ভেসে যায় আজীবন
যদিও ক্ষোভের কারণে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আচরণে মেতে ওঠে
দু'কুল ছাপিয়ে নোনা জলে ভাসিয়ে নিতে চায় তার সমস্ত জৈবিক চেতনা।

আমার কবিতার খাতায় দেখ কি নিদারুণ কষ্টের বলিরেখার ভাঁজ
অল্প বয়সেরও বুড়োদের মতো কুঁজো হয়ে যাওয়া কবিতার জীবনে আজ তুমি যেন অভিশাপ
তুমি কি শুনতে পাচ্ছো আমার কবিতার বুক ছিঁড়ে বের হওয়া দীর্ঘশ্বাস
প্রতিটি পাতায় পাতায় দুঃখ নদীর কষ্টের ঢেউ কি চোখে পড়ে তোমার?

আমার যৌক্তিক ভালোবাসাকে তুমি জ্যামিতিক জটিল জালে আবদ্ধ করে রেখেছো বলেই
সরলরেখায় চলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিন্দু ছুঁতে পারি না আমি
ফিরে আসি তোমার সমকোণী ত্রিভূজি প্রেমের চতুর্ভজ মোহনীয় জালে
পিথাগোরাসের সূত্রও যখন তোমার কাছে আজ নস্যি।

স্মৃতিচারণ

যৌথ

দীপঙ্কর বেরা ✉ *বাংলা ভাষাকে আমি খুব ভালোবাসি। আসুন সবাই বাংলা খুব পড়ি আর লিখি শিখি।*

আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা পুকুর ছিল। খুব বড় দীঘির মত না হলেও বড়ই ছিল। তাতে আমাদের সেই পাড়ায় প্রায় পনের ষোলজন পরিবার ছিল। প্রত্যেকের তাতে অধিকার ছিল। বৈশাখের শেষের দিকে অল্প জলে ছোট ছোট মাছ ছাড়া হত। তাছাড়া অনেক মাছ থাকত। যে কোন অনুষ্ঠান সেখান থেকে মাছ নিয়ে কাজ করত। আর এমনি ধরেও খাওয়া হত।

এই এত সব কাজে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকত। তা কেউ মানত কেউ মানত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু একটা রাস্তায় পৌঁছান যেত। আমাদের ভাগ ছিল সেখানে তিন চার শতাংশ। এই যৌথ জীবনযাত্রায় গ্রামে আমাদের পাড়ার বেশ নাম ছিল। এই যৌথ ভাবনার রেস ছিল ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে রাস্তা। যে কেউ যার তার বাড়ি যখন তখন যেতে পারত।

বেশির ভাগ বাড়ির দরজা খোলা অথবা যাতে কুকুর বিড়াল না ঢুকতে পারে তার জন্য দড়ি বা শেকল পেঁচিয়ে রাখা থাকত। আমাদের তো কোন তালাচাবি ছিল না। আমরা কোন আত্মীয় বাড়ি গেলে পাশের কাকা বা জ্যেঠুদের বলে গেলেই হবে। চুরি হত। তবে তা একটু বড়লোকদের বাড়ি। তাও অবশ্য প্রায়ই গ্রামের লোক ধরে ফেলত। পুলিশ পর্যন্ত গেলেও শেষ সেই চোর দু চার বছরের মধ্যে চুরি না করার কবুল করে গ্রামেই বাস করত।

পাড়াতে কোন আনন্দ অনুষ্ঠান করতে চাইলে সবাইকে ডেকে খাওয়াতেই হবে। তা যদি না পার প্রতি ফ্যামিলির একজন অন্তত খাওয়াতেই হবে।

সেই যৌথ চিত্র আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আর গ্রামেও লাগছে শহরের ঢেউ।

ছড়া

বর্ষা বন্দনা

মিলন বনিক ✉ *একজন চাকরিজীবি। অবসরে লেখালেখি। সামাজিক দায়বদ্ধতাও আছে অনেকটা। তারই মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনার যোগফল এই প্রচেষ্টা। ভ্রমন, বই পড়া, গান শোনা প্রিয় শখগুলোর অন্যতম। আপনাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা সবই মন্তব্য হিসাবে পেতে ভালো লাগে। মন্তব্য পেলে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো অনেক বেশী।*

আনন্দের ঐ হাট বসেছে
ঘরে বসে কাজ তো নাই,
টিনের চালে ঝুম ঝুমিয়ে
বৃষ্টি সোনা ডাকছে আয়।

টাপুর টুপুর নোলক নুপুর
কেউ তো কারও নয়কো পর,
মা যে বলে, যাস্নে সোনা
সর্দি, কাশি হবে জ্বর।

উঠোন জুড়ে কাদা পানি
হাত বাড়িয়ে ডাকছে ঐ,
ডোরেমন আর কার্টুন দেখে
আসল স্বাদটা পাচ্ছি কই।

চার দেয়ালের মধ্যে কেবল
কাটছে সারা বেলাটা,
প্রকৃতির ঐ সোনার আলোয়
কাটতো যদি সময়টা।

প্রবন্ধ

বিজয় দেখেছি, বিজয়ের স্বাদ আজও পাইনি

আলমগীর হোসেন আবীর *বিবিএ, এমবিএ-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত উপন্যাস -হৃদয় ছুঁয়ে যায়*

বিজয়ের ৪২ বছর। আমরা আবারও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি বহুদলীয় টেকসই গণতান্ত্রিক ক্ষুধা, দারিদ্র ও দূর্নীতি মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। এক একটি বছর যায়। চোখে হতাশা দেখি। আবারও নতুন করে স্বপ্ন দেখি। ৪২টি বছর এভাবে আমরা স্বপ্ন দেখে আসছি। বুকে লালন করে আসছি স্বাধীনতার চেতনা। বার বার শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আমরা প্রতারিত হচ্ছি। বেকার সমস্যা দূরীভূত করা, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চত করা ও দূর্নীতি মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গিকার নিয়ে সরকার গঠন করে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্নীতি ও লুন্ঠনের মাধ্যমে দেশকে দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। একইভাবে বিরোধী দলগুলো সরকারের দূর্নীতি ও অনিয়মের শান্তিপূরর্ণ প্রতিবাদ ও গঠনমূলক সমালোচনার পথ পরিহার করে আন্দোলন ও গণতন্ত্রের নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ধ্বংসযজ্ঞর মাধ্যমে দেশকে ধবংসস্তুপে পরিণত করছে। একটি পক্ষ মুখে শুধু নিজেদের স্বাধীনতার স্বপক্ষের বলে দাবী করে জাতিকে বিভক্ত করছে। অথচ তারাই ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে স্বাধীনতার মূল চেতনা থেকে। স্বাধীনতা কোন একক দল বা গোষ্ঠীর কৃতিত্ব নয়। বাংলার প্রত্যেকটি মানুষে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অবদান রয়েছে স্বাধীনতায়। স্বাধীনতার মহানায়ক যেমন ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, তেমনি অসামান্য অবদান রয়েছে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দিন আহম্মেদ, জেনারেল আতাউল গণি ওসমানি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মেজর জিয়াউর রহমান সহ প্রত্যেকটি মানুষের।

প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায় অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। অথচ অনেকে মুক্তিযুদ্ধ না করে, কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেও মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র যোগাড় করে সরকারি ভাতা পাচ্ছে, তাদের সন্তানরা সরকারী চাকরিতে কোটার সুবিধা পাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারা দেশের টানে যুদ্ধ করেছিল, সরকারী সুযোগ- সুবিধা পাওয়ার জন্য নয়। তবুও তাদের পরিবারের আর্থিক সহায়তা ও নিরাপত্ত দায়িত্ব সরকারের কাছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ আশা করে। তবে অবস্থা সম্পান্ন মুক্তিযোদ্ধার পরিবার সরকারি আর্থিক সহয়তা পাওয়ার প্রয়োজন সাধারণ মানুষ মনে করে না। তেমনি প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, নাতি-নাতনীদের কোটায় চাকরি সুবিধা দেওয়াটা শুধু বৈষম্যই সৃষ্টি করে।

আজ সোনার বাংলায় সোনার সন্তানদের যথেষ্ট অভাব। সত্য কথা বলার বুদ্ধিজীবীর অভাব। স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস ও বিজয় দিবসে বিশেষ পোশাক, ব্যাজ পড়ে, শহীদ মিনারে, জাতীয় স্মৃতিসৌধে তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে, টেলিভিশন চ্যানেলে কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার, রাজ পথে সভাসমাবেশ করার মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনা অর্জিত হয় না। স্বাধীনতার মূল চেতনা অর্জন করতে হলে এসবের পাশাপাশি জাতিকে আজ বদলে যাও, বদলে দাও স্লোগানে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে একত্রিত হতে হবে। দূর্নীতি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শপথ নিয়ে সামনে এগোতে হবে। তবেই আমাদের সর্বোচ্চ মানব পতাকার রেকর্ড বিশ্ববাসীর কাছে মর্যাদা পাবে। আমরা বিশ্ব দরবারে সত্যিকারে মাথা উচু করে গর্ব করতে পারব আমাদের সোনার বাংলা নিয়ে।

গল্প

এতটুকু অভিমান

আজিম

ঠিক গন্ডগ্রাম না হলেও শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। বাড়ীর দু'পাশের একপাশ দিয়ে একটি বড় রাস্তা এক উপজেলায় এবং আরেকপাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। বাকী দু'দিক খোলা, যেখানে শস্য বোনা হয় বিভিন্ন রকমের। কেউ কেউ সবজিও বুনেন। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে যখন সরষে গাছের হলুদ রংয়ে ছেয়ে যায় প্রান্তরটি। বড়ই মধুর লাগে তখন। বাড়ীর পাশেই ছিল একটা পুকুর। ছেলেবেলায় বান্ধবীদের নিয়ে নেচে নেচে এই প্রান্তরে এবং পুকুরেই বিচরণ করতাম দিনের অনেকটা সময়। মায়ের মারের কথা যখন মনে পড়ত, তখনই শুধু ক্ষান্ত হতাম।

না, ছাত্রী মোটেই ভাল ছিলামনা আমি, বান্ধবীরাও নয়। একসাথে আমরা স্কুলে যেতাম এবং কিছুটা লোকদেখানো পড়াশুনাও করতাম মায়ের মার এড়ানোর জন্য। এতেই হয়ে যেত, ফেল করিনি কোনদিনই।

বাড়িতেই থাকত বড়বোন, এক স্কুলের শিক্ষিকা, বছর বছর জন্ম দিত সন্তানের আর পালতে হোত আমাকেই। বড়ভাই রাজশাহীতে উচ্চশিক্ষায় রত। খুব ছোটবেলায় অভাগা আমি হারাই প্রানপ্রিয় বাবাকে, যার কিছু স্মৃতি আজও কাঁদায় আমাকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন জানি কান্না বেরিয়ে যেত তাঁর মৃত্যুরও অনেক বছর পর পর্যন্ত।

গ্রামের মতো শহর অথবা শহরের মতো গ্রাম, যেটাই বলি না কেন, স্বপ্ন কিন্তু দেখতাম অনেক উঁচু আমি। আমি স্বপ্ন দেখতাম একজন ভাল মানুষের সাথে নাটকীয়ভাবে আমার সম্পর্ক হবে।

ছেলেটা আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু হাসান। ছুটিতে ভাইয়া যখন বাড়ী আসতো, অনেক গল্প করতো তার। একটু না-কি পাগলাটে ধরনের। একদিনের গল্প এরকম – ইলিশ মাছ রান্না করেছিল দুপুরে হাসান। রান্নাতো নয়, বেশী করে পানি দিয়ে ঝোল করা পানসে রান্না। কিছুটা রেখে দিয়েছিল রাতে খাবে বলে। কি একটা উপলক্ষে যেন ওরা সেদিন বিকেলে শহরে যায়, ভাইয়াও গিয়েছিল। এসে ভাইয়া হাসানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ঝোলের কিছুটা খেয়ে ফেলে। হাসান সেটা জানতে পেরে ছুরি নিয়ে তেড়েছিল ভাইয়াকে।

মাস্তান না-কি হতে চেয়েছিল হাসান কলেজে। তাই ইচ্ছে দিয়েই কাউকে কাউকে মেরে বসত ও, আবার কাউকে মিছেই মারার ভান করত, মারার জন্য চিৎকার করত, ফাল পাড়তো। এভাবেই কলেজে মাস্তান হিসেবে একটা ভাবমূর্তি তৈরী হয়ে উঠেছিল তার। আবার ডাইনিংযে যেদিন খাসীর মাংসের ব্যবস্থা থাকত, সেদিন হাসানের জন্য চর্বির বাটি রাখতে হোত অর্থাৎ ওটা না রাখার মতো বুকের পাটা সংশ্লিষ্টদের থাকতোনা।

কলেজে ভাইয়া জাসদ ছাত্রলীগ করত আর হাসান বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী। চতুর্থ বর্ষে এসে ভাইয়া নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠে। আর হাসান কলেজে ছাত্রমৈত্রীর সুচনা করে বলে সে আহ্বায়ক। রাজশাহীতে তখন বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর প্রভাব বেশী থাকায় এই কলেজে ছাত্রলীগ-জাসদ ছাত্রলীগ বনাম বিএনপির ছাত্রদলের মধ্যকার বিবাদ কখনও সংঘটিত হলে অথবা বিবাদের উপক্রম হলে হাসানের কাছে রিকোয়েস্ট আসত শহর থেকে মৈত্রীর ছেলেদের এনে প্রতিপক্ষকে একটু শায়েস্তা করার অথবা ভয়-ভীতি দেখানোর। শহরের নেতারাও জানতে চাইত, এরকম করলে তাদের রাজনীতির প্রসার কিছুটা হলেও হবে কি-না ? হোক না হোক, হাঁ-সূচক জবাব দিত হাসান।

গল্প শুনতে শুনতেই কখন যেন ভালবেসে ফেলি আমি হাসানকে প্রচন্ডভাবেই। ভাইয়ার কাছে গল্পগুলি শুনে ওকে নায়কই মনে হতো আমার। একটা সময় মনে হতো, হাসান আর আমার জগত ছাড়া অন্য আর কোন জগত থাকতে পারে নাকি ! পরম করুনাময় খোলা তা'লার নিকট প্রার্থনা করতাম ওকে যেন পাই। মুচকি হেসেছিলেন বোধহয় তিনি তখন।

ভাইয়ার পাশ করার পর তার চাকরীর সুবাদে ঢাকায় চলে আসি আমরা। হাসান চলে যায় এক উপজেলায় চাকরী নিয়ে। ঢাকাতেই কাংখিত দেখা হয় আমাদের যখন একদিন সে আসে তার চাকরীগত কোন একটা কাজে ঢাকায়। না, আমাকে ভালবাসার কোন চিহ্নই নেই তার চলনে-বলনে। ছোটবোনের মতোই কথাবার্তা। হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। মনে হলো দেখা না হলেই ভাল হতো।

একতরফা প্রেম কতদিনই বা থাকে আর ! আমারও কেটে যেতে সময় লাগলনা। ইতিমধ্যে হাতছানি না এড়াতে পেরে একজনের সাথে জড়িয়ে পড়ি। সজিব নামের ছেলেটাকে দেখে সজিবই লাগত, মনে হতো অনেক পোড়খাওয়া ছেলে ও, দুনিয়াদারি সম্পর্কে অনেক জ্ঞান-গরিমা রাখে ছেলেটা। কলেজে যাওয়ার পথে প্রতিদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত ওকে। বুঝে গিয়েছিলাম তা শুধুমাত্র আমারই জন্য। আমিও দেখতাম তাকিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সম্পর্ক হওয়ার পর কেন জানি ছেলেটা আমাকে ওর সাথে পালিয়ে যেতে বলত। কিছু বুঝতে পারতামনা পারিবারিকভাবে কেন ও এগোতে চায়না। আমারও নাটকীয়ভাবে বিয়ে করার সাধ, কেমন করে যেন বুঝে গেছিল ও সেটা। সম্পর্ক শুরুর মাত্র ছয়মাসের মধ্যে কাউকে কিছু না বলে একদিন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাই সজিবের হাত ধরে আমি।

হাসানের সাথে আবার আমার দেখা দীর্ঘ একুশ বছর পর। ভাইয়াও আমেরিকায় দীর্ঘদিন, কাজেই হাসান চ্যাপ্টার আমার কাছে ক্লোজই হয়ে

গেছিল। এলোমেলোভাবে হাটছিলো হাসান রাস্তা দিয়ে সেদিন। দেখতে পেয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছি সোজা বাসায়।

আগের ভঙ্গিটার রেশ তখনও আছে ওর মধ্যে, প্রশ্ন করে সংসার কেমন চলছে তোমার ?

আমি তো সংসার করিনা। আর এসব শুনে আপনি কী করবেন হাসান ভাই।

কোন প্রশ্ন না করে কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে হাসান।

তাকানোর ভঙ্গিতে রাগ হলো আমার। কিন্তু উত্তর দিতে হবে, তাই দেরী না করে বলি, সজিবের হাত ধরে ঘর ছাড়ার পর দেখি ওর কিছুই নেই, মানে ভগ্ন সংসার ওদের। বাবা তার মাকে ত্যাগ করে, মা-ও আরেকটা বিয়ে করে, সজিবেরও শিক্ষার দৌড় মাত্র ইন্টার। ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ার কাছ থেকে যৌতুক এনে দেয়ার জন্য চাপ দিত, মারধর করত। অবশেষে একদিন আধাচেতন অবস্থায় নিজেকে আমি নিষিদ্ধ পল্লীতে আবিষ্কার করি আর দীর্ঘ দশটা বছর সেখানেই কাটাতে বাধ্য হই।

অবাক করা এক আবেশের মধ্য দিয়ে শুনে যায় কথাগুলো হাসান। বলে, আর এখন ?

আমার বড়বোন শুধু জানত আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা। একদিন মাস্তান নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, হাতে ধরিয়ে দেয় ভাইয়ার দেওয়া এক কোটি টাকা। আরপর তো দেখতেই পাচ্ছেন এই পূনবার্সন কেন্দ্র খুলে বসেছি, এখানে আমার সাবেক সহযাত্রীদের পূনর্বাসন করি আমি সাধ্যমতো।

কথায় কথা এগিয়ে চলে। হাসানের বউ সরকারী বড় কর্মকর্তা, বছর দুই ওদের মুখ দেখাদেখি, কথাবার্তা সব বন্দ্ব। ওর দেমাকমতো চলতে বাধ্য করত ও হাসানকে। না চলাতে এই অবস্থা ওদের।

চলমান সংলাপেই বুঝতে পারি হাসানও প্রচন্ডভাবে ভালবাসত আমাকে। আমাকে বলতে ওর সঙ্কোচ হতো, তবে বলতো। কিন্তু সেই সময়ের আগেই আমি অধৈর্য হয়ে ঘটনা ঘটিয়ে ফেলি, যে ঘটনায় একা কেউ নই, আমরা দু'জনই আজ অন্যমানুষ, দু'জনই আজ ছিটকে পড়েছি আমরা জীবনের মূল স্রোতধারা থেকে।

রাত গভীর হয়, আমাদের কথা ফুরায়না। একসময় প্রস্তাব আসে এক হয়ে যাওয়ার আমাদের। সরাসরিই না করে দেই। হাসান ভাইয়ের উপর আমার প্রচন্ড অভিমান রয়েছিল যে তখনও আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাওয়ার জন্য।

আমার প্রানের হাসান ভাই গত হয়েছেন চার বছর হয়। আজকের মতো প্রতিবছর তার মৃত্যুদিবসে এবং হাঁপিয়ে ওঠার দিনগুলিতেও ঢাকা থেকে আমি চলে আসি এই শহরে, বসে থাকি সারাদিন তার কবরের সামনে। আশপাশেই নাস্তা করি, ভাতটাত খাই, আবার আসি আর চেয়ে থাকি হাসান ভাইয়ের কবরের দিকে। মনে হয় হাসান ভাইয়ের অনেক কাছে আছি আমি। একরাশ প্রশান্তি নিয়ে রাতের বাসে ফিরি আবার ঢাকায়।

যতদিন বেঁচে আছি, এটাই যে আমার সবচেয়ে জরুরী কাজ ততদিন।

ফিচার

হিমালয়ের তুষারমানব : রহস্যময় ইয়েতি

ওবায়দুল গনি চন্দন

রহস্যময় তুষারমানব 'ইয়েতি' সম্পর্কে আপনি কি জানেন? আসুন তার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেই! ইয়েতি নামটা এসেছে তিব্বতি ভাষা থেকে, যার বাংলা অর্থ 'পাথুরে ভাল্লুক'। হিমালয়ের মানুষরা আগে বল, ইয়েতিরা নাকি সারাক্ষণ বিশাল একটা পাথর নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, আত্মরক্ষা নয়তো শিকার করার জন্য। আর শিস দেয়ার মতো এক রকম শব্দ করতো। আর ওই পাথর নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যই হয়তো ওদের নাম দিয়েছিল পাথুরে ভল্লুক বা ইয়েতি। ইয়েতিদের একেকটা পায়ের ছাপ লম্বায় ৩৩ সেন্টিমিটার। ধারণা করা হয় তিব্বত, নেপাল ও ভুটানের হিমালয়গুলোতে এদের বসবাস। হিমালয়ের দুর্গম তুষারাবৃত উচ্চ প্রদেশের এক ধরনের মানবাকৃতি প্রাণী ইয়েতি বা তুষার মানব। নানাভাবে এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা এখনো এদের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় করতে পারেননি। তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তুষার মানবরা এখনো একটি রহস্যাবৃত প্রশ্ন হয়ে আছে। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত তিব্বত, নেপাল ও ভুটান রাজ্যে সরকারি বা তুষারমানবের অস্তিত্ব স্বীকৃত। নেপালে তুষারমানব মেতি বা ইয়েতি নামে পরিচিত। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে যারা পাড়ি দিয়েছে তারা হিমালয়ের উপত্যকা অঞ্চলের পর্বতবাসীর মুখে ইয়েতির অনেক অদ্ভুত গল্প শুনেছে। এমনকি শেরপাদের সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত আছে ইয়েতি দেখলে মৃত্যু অনিবার্য। জানা গেছে দানবাকৃতি ইয়েতিরা নাকি প্রায়ই উচ্চ অঞ্চল থেকে উপত্যকার জনবসতিতে নেমে এসে হানা দেয় এবং গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়। এজন্য পর্বতবাসীদের কাছে ইয়েতি এক জীবন্ত আতঙ্ক স্বরূপ। আসুন এইবার জেনে নেই ইয়েতি সম্পর্কে যেসব কথা বেশি প্রচলিত।

১। সমতলের মানুষের কাছে ইয়েতির বিশ্বাসযোগ্য খবর প্রথম পৌঁছায় ১৮৩২ সালে। নেপালের প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বিএইচ হডসন হিমালয় অঞ্চলের অজ্ঞাত এক প্রাণীর বর্ণনা দিলেন যে এটি নাকি মানুষের মতো সোজা হয়ে হাঁটে, সারা শরীর লম্বা চুলে ঢাকা এবং কোনো লেজ নেই। মি. হডসনের বিবরণ তখন খুব একটা সারা ফেলতে পারেনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে ইয়েতি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

২। ১৯৫৪ সালে এক লোক তো ইয়েতির গায়ের লোমই নিয়ে চলে আসলো। আর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন কি, ওটা কোনো ভল্লুকেরও লোম তো নয়ই, অন্য কোনো পরিচিত প্রাণীর লোমও নয়!

৩। ১৯৫৩ সাল। স্যার এডমন্ড হিলারি আর শেরপা তেনজিং নোরগে জয় করলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট এভারেস্ট'। আর তার পর অকপটে স্বীকার করে নিলেন, পথে তারা ইয়া বড়ো বড়ো অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখেছেন। আর এই পায়ের ছাপগুলো কিন্তু প্রমাণ হিসেবে নিতান্ত ফেলনা নয়। এই পায়ের ছাপগুলো নিয়ে ভালো রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে। আর তা করে দেখে গেছে, এগুলো কোনো বানানো পায়ের ছাপও নয়, কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর পায়ের ছাপও নয়। অন্য কোনো প্রাণীরই পায়ের ছাপ এতো বড়ো হতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা হয় একেকটা পায়ের ছাপ লম্বায় ৩৩ সেমি।

৪। ১৮৩২ সালে হজসন নামে এক ভদ্রলোক নেপালের হিমালয় ঘুরে এসে লেখেন, তার গাইডরা নাকি এক বিশালাকার ঘন লোমে পুরো শরীর ঢাকা এক অদ্ভ–ত দু'পেয়ে জন্তু দেখেছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল হিমালয় অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত ইয়েতির কোনো মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়নি। ইয়েতিদের সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রমাণ পাওয়া গেলেও এদের প্রকৃত পরিচয় এখনো অজ্ঞাত রয়েছে।

ইয়েতি কি সত্যি বিদ্যমান? নাকি শুধুই প্রাচীন লোকগাথার অংশ? এই প্রশ্নের উত্তর কারো জানা নেই।

কবিতা

কবিতার অপর নাম-বার্তা

জাফর পাঠান

ওহে কবিতা-তুমি কি শুধুই প্রেম ভালোবাসার কথিকা
নাকি মানুষের মনোরঞ্জনের শুধুই একখন্ড পুস্তিকা ?
তুমি কি নিসর্গের প্রেম প্রকাশের হাতিয়ার
নাকি নারী যৌবনের সৌন্দর্য প্রকাশের রূপকার?
অকবিদের কূরুচীপূর্ণ নগ্ন কবিতা কি তুমি!
নাকি প্রমিত-প্রাঞ্জল আকুতির উর্বর ভূমি!

তুমি কি সুখ-দুখ, শান্তি-অশান্তি প্রকাশের একখন্ড পাতা
নাকি মানুষের টুকরো টুকরো চিন্তার, একখন্ড ছিঁড়া খাতা।
বলো হে কবিতা, তোমার কবিতায় কি বহন করো তুমি
শুধুই কি চমকপ্রদ কথামালা, আর ছন্দ রসের রিমিঝিমি,
নাকি রসমাখা বর্ণমালায়, টিপ্পনী কাটা দুষ্টামি।

আমি যদি বলি, তুমি শান্তির পায়রা-অনুগ্রাহক
এই ধরনীর তুমি শান্তির বার্তা বাহক,
আমি কি ভাবতে পারিনা, তুমি তাদের জন্য বার্তা বাহক
যারা সাম্রাজ্যবাদী শোষক-খাদক, আর স্বৈরাচারী শাসক।

যদি বলি তুমি- অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির রক্ষক
যত বর্বর অমানুষ-পীড়ণকারীদের ভক্ষক,
যদি বলি- তুমি কবিতা নও- তুমি পত্রবাহক
তুমি সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বের জন্য শান্তির বার্তা বাহক
যদি বলি তুমি নিপীড়ক-খুনি-শোষকদের হন্তারক!
আমার কি ভুল হবে তাতে, হে অনুধ্যানের কারক।

হে কবিতা বলো-তুমিই বলো, আমি কি মিথ্যা বলেছি ?
নাকি তোমার প্রকৃত স্বরূপ, অবনীতে উন্মোচন করেছি।

কবিদের সঞ্চিত, প্রাজ্ঞ, প্রতিজ্ঞ অন্তকোণের বার্তা
বয়ে নিয়ে আস তুমি মানুষের জন্য, হে কবিতা,
তুমি জাত-পাত বুঝোনা, ধর্ম বিভেদ বুঝোনা
ভৌগলিক সীমান্তেরও কোন ধার তুমি ধারোনা
হে কবিতা, তুমি শুধু কবির বার্তা বাহক ব্যঞ্জনা।

যদি বলি তুমি- কবির পবিত্র আত্মার আবেগ-চেতনা
তোমার ভিতর কোন অন্যায্য দলমত থাকিতে পারেনা,
তোমার বার্তায় বিভেদের বাণী থাকিবে, আমি বিশ্বাস করিনা
আমার কাছে তুমি -
শুধুই শান্তি-সাম্য-প্রেমের বার্তা বাহক বৈ কিছুনা,
হে কবিতা, এছাড়া অন্য কিছু আমি মানিনা-মানিনা-মানিনা,
আমি মানতে পারিনা।

গল্প

মরীচিকার টানে দহন-কাল

হামিদ ✉ *ভবের এই খেলাঘরে খেলে সব পুতুল খেলা/ জানি না এমন খেলা ভাঙে কখন কে জানে..... খেলা ভাঙার অপেক্ষায় এই আমি এক অদক্ষ খেলোয়ার ...*

ইসমত আরাকে দেখে চিনতে পারছিলাম না। তিন বছরে একী হাল হয়েছে শরীরের! তিন বছর আগে যখন সে কাজের উদ্দেশ্যে লেবাননে যায় তখনও বেশ রূপবতী এবং স্বাস্থবতী মেয়ে ছিল সে। অথচ এখন তার অবস্থা এমন হয়েছে যে চেনা-ই যায়না। চেহারা দেখে আমিও তো প্রথমে চিনতে পারি নি। বিমান বন্দরে একটা ট্রলি ঠেলে ঠেলে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমি ভাবলাম কে না কে! আমি এক দিকে সরে গিয়ে তার যাবার রাস্তা করে দিলাম। তারপর সে যখন ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল এবং কাঁদতে শুরু করল তখন কান্নার শব্দ শুনে আমি ভাল করে তাকাই তার দিকে এবং চিনতে পারি যে এতো আমাদেরই ইসমত আরা।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হয় মেয়েটি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ঢাকায় দু'টি পোষাক কারখানায় চাকরী করত। দু'জনেই ছিল এসএসসি পাশ । তাই তুলনামূলক ভাল কাজই তারা করতো পোষাক কারখানায়। আশুলিয়ায় স্বামীটির কারখানার ভয়াবহ আগুন তার স্বামীটিকে কেড়ে নিয়ে তাকে বানায় অকাল বিধবা। আর তার পাঁচ আর তিন বছর বয়সের ছেলে দু'টিকে বানায় অকালে পিতৃহারা।

প্রেমের বিয়ে ছিল তাদের। প্রেমের টানে পালিয়ে ঢাকায় এসে বিয়ে করেছিল। স্বামীকে হারানোর পর ইসমত আরার আর শহরে কাজে মন বসেনি। ফিরে আসে গ্রামে। গ্রামে এসে স্বামীর ভিটায় উঠেছিল। তার শ্বশুর শাশুরি বেঁচে নেই। তার এক দেবর আর এক ননদ আছে। ইসমত আরা স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার এবং বিজিএমইএ'র কাছ থেকে মোট দুই লাখ টাকা পেয়েছে। সেই টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছে ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য। ভাবছে নিজে টুকটাক সেলাইয়ের কাজ করে ছেলেদের নিয়ে বেঁচে থাকবে। ছেলেদের লেখাপড়া শিখাবে।

কিন্তু তার দেবর আর ননদ ঝামেলা শুরু করে দিল। তারা বলছে- 'ইসমত আরা পরের মেয়ে। যেকেনো সময় বিয়ে বসে চলে যাবে আরেক বেটার ঘরে।' তাই তাদের কথা হল তারা-ই বাচ্চা দু'টির প্রকৃত অভিভাবক। আর সেই সুবাদে তাদের দাবী হল ভাইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের জিম্মায় দিতে হবে। তারা ভাইয়ের ছেলেদের দেখেশুনে রাখবে। মানুষ করবে।

ইসমত আরা ভাল করেই চিনে তার দেবর আর ননদকে। তাদের চোখ পড়েছে ঐ দুইলাখ টাকার ওপর। সে দুই সন্তানকে নিয়ে চলে আসে বাবার ভিটায়। বৃদ্ধা মা আছে তার আর আছে ভাই ও ভাবী। ভাই-ভাবী দুজনই তাকে বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করল। এমনকি ভাই নিজের টাকায় তাকে একটা সেলাই মেশিনও কিনে দিল।

এরই মধ্য এক সময় বড় ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেয় ইসমত আরা। আর নিজে ঘরে থেকেই সেলাইয়ের কাজ করে আয় রোজগার যা হচ্ছিল তাতে দিন চলে যাচ্ছিল একরকমে। ইসমত আরার চোখে মুখে একটাই কেবল স্বপ্ন খেলা করে, তার ছেলে দু'টোকে লেখাপড়া শিখাবে। অনেক বড় হবে তারা। তাদের বাবার স্বপ্নগুলো পূরণ করবে একদিন।

ভালই চলছিল ইসমত আরার জীবন যতদিন না আদম ব্যাবসার দালাল শরীফ মিয়ার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় :

'গার্মেন্ট ভিসা। পঁচিশ হাজার টাকা বেতন তার উপর বোনাস তো আছেই। পাঁচটা মাত্র ভিসা পাইছি। প্যাসেঞ্জার যাইতে চায় কম হলেও পাঁচ পাঁচে পঁচিশ জন। দুই লাখ চাইলও রাজী। কিন্তু আমি শরিফ মিয়া টাকার গোলাম না। মানুষের উপকার করতে পারলে আমি যে সুখ পাই সেই সুখ টাকায় পাই না। তাই আপনার উপকার করতে চাই। ছেলে দুইটার ভবিষ্যৎ তো আপনাকেই চিন্তা করতে হবে। ঘরে বসে মেশিন চালিয়ে পারবেন ছেলেদের উচ্চ শিক্ষিত করতে? দেখেন চিন্তা করে। আপনি গেলে আমি দেড় লাখেই ছাইড়া দিমু ভিসা। আমার লাভের দরকার নাই' – এভাবে ইসমাত আরাকে নানা কথা বোঝায় শরিফ মিয়া।

ইসমত তখন আমার কাছে এসেছিল পরামর্শের জন্য। সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে বলল-' আজিম ভাই আপনি শিক্ষিত মানুষ। কলেজে পড়ান। আপনি ভাল বুঝবেন। কী করি বলেন তো?'

আমি না করেছিলাম তাকে। আমার না শোনে হঠাৎই তার চোখমুখ কেমন কঠিন হয়ে গেল। বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বলতে লাগল,

'আজিম ভাই আমার কথা ভেবে ভেবে কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। আমি কোনো দিনই আপনার হব না। আপনি আমার চাচাত ভাই। আমি আপনাকে ভাইয়ের মতই দেখি। তাছাড়া আমি তো আপনার যোগ্যও নই। আপনি আপনার উযুক্ত কাউকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। চাচির মনে কতো কষ্ট আপনার জন্য।'

একটানা কথাগুলো বলে দ্রুত ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় সে। আমি তার ভালর জন্যই কথাগুলো বলেছিলাম। কিন্তু সে বুঝল না। কোন মরীচিকার মোহে সে এখন অন্ধ। কারও কথাই সে এখন শুনবে না। আমার কেবলই জীবনানন্দ দাশের মরীচিকার পিছে কবিতাটি মনে পড়তে লাগল তখন:

"ধূম্র তপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূর মরীচিকাতটে ছলনাময়ার তীরে
ছুটে যায় দুটি আঁখি!
-কত দূর হায় বাকি!
উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে
পথে পথে তার বাধা জমে যায়-তবু সে আসে না ফিরে!"

শেষ পর্যন্ত দুই লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের এক লাখ ক্যাশ করে আর বাকী পঞ্চাশ হাজার ধার দেনা করে পাড়ি জমায় স্বপ্নের লেবাননে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে স্বপ্নভঙ্গ হল। পোষাক কারখানার পরিবর্তে দেখা গেল বাসা-বাড়ির চাকরানীর কাজ করতে হবে তাকে তা-ও বলতে গেলে পেটে ভাতে। ফেরার কোনো পথ নেই। কারণ গৃহ কর্তা টাকার বিনিময়ে তাকে সংগ্রহ করেছে। তাই তাকে বাধ্য করল চাকরানীর কাজ করতে এমনকি যৌন নির্যাতন পর্যন্ত চলত অহরহ।

এক সময় ইসমত আরার পরিবার- মা,ভাই-ভাবী জানল বিষয়টি। কিন্তু মানসম্মানের ভয়ে কাউকে বলল না কিছু। কোনো একদিন দুঃসময় শেষ হবে সেই আশায় দিন গুণতে থাকল অসহায় এই পরিবারটি।

লেবাননের সেই গৃহকর্তার অগোচরে পরিবারের দয়ালু কেউ কেউ লুকিয়ে তাকে দেশে ফোন করতে দিত। তো একদিন সেই ফোন করার সময় ইসমতের মনে হল আমার কথা। আমাকে ফোন দিয়ে জানাল সব। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, 'আজিম ভাই আমাকে এখান থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।'

শুরু করলাম দৌড়ঝাঁপ। আমার এক ক্লাশমেটের বাবা ফরেন মিনিষ্ট্রিতে যুগ্মসচিব। ধরলাম তাঁকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক স্যার বিখ্যাত এক মানবাধিকার সংগঠনের সাথে জড়িত। তার অতি প্রিয় ছাত্র আমি। ধরলাম স্যারকে।

এই কদিন নানা জায়গায় ঘুরে আর ইন্টারনেট ঘেটে আমি বেশ কিছু তথ্য পেলাম। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিকের দেশ লেবান। যেখানে কর্মরত প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশি নারীদের ৬০ হাজারই গৃহপরিচারিকা। বাংলাদেশি ও নেপালি নারীকর্মীদের উপর অতি সাম্প্রতিক বিশেষ জরিপ অনুযায়ী, ৮২ শতাংশ নারীকর্মীকে তাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। প্রতিদিন ১৬ থেকে ২০ ঘন্টা কাজ করে থাকেন ৬২ শতাংশ নারী। এক মাস বা বেশি সময়ের জন্য বেতন আটকে রাখা হয় ৫৪ শতাংশ নারী শ্রমিকের। কখনও একা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না ৯০ শতাংশকে। আর সাপ্তাহিক ছুটির অধিকার থেকে বঞ্চিত ৯১ শতাংশ নারী।

জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে কাজ করতে বাধ্য করা হয় ৫০ শতাংশ নারী শ্রমিককে। রান্নাঘরে ঘুমান ১৯ শতাংশ, ব্যালকনিতে ৭ শতাংশ, বাথরুমের কাছেও ঘুমাতে বাধ্য করা হয় অনেককে। ভালো খাবার খেতে দেওয়া হয় না ৩২ শতাংশকে। মারাত্মক যৌন নিগ্রহের শিকার শতকরা ১০ শতাংশ নারী। বাংলাদেশি নারীকর্মীদের উপর অব্যাহত যৌন নির্যাতনের ব্যাপকতা বিশেষভাবে হাইলাইটেড হয়েছে উক্ত জরিপে।

একটি অনলাইন পত্রিকায় দেখলাম এমন একটি রিপোর্ট :

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এমন একজন ব্যক্তি লেবাননে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে আছেন যার স্ত্রীর নিজেরই গৃহকর্মী নির্যাতনের মতো অপকর্মের ইতিহাস রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় লেবানন প্রবাসী দুই লাখ বাংলাদেশি নারীদের সুখ-দুঃখ দেখভালের দায়িত্বে আজ সেই

রাষ্ট্রদূতের। গৃহপরিচারিকার স্বার্থ রক্ষায় যিনি নিজের ঘরেই ছিলেন উদাসীন, তিনি কী করে আজ লেবাননে হাজার হাজার স্বদেশী নারীদের কান্না থামাবেন?’

যাই হোক অবশেষে ইসমত আরাসহ মোট সতের জন মেয়েকে লেবানন থেকে উদ্ধার করে আনা হয় স্যারের সেই মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায়। পররারাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যাই হোক বিমান বন্দরে যখন ইসমত আরাকে চিনতে পারলাম এগিয়ে গেলাম তার কাছে। স্বান্তনা দিতে চেষ্টা করলাম। আমি যতই তাকে থামাতে চেষ্টা করি ততই বেশি সে কাঁদে। আমি গ্রাম থেকে একটা মাইক্রো ভাড়া করেই বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম। কোনো রকমে তাকে বিমান বন্দর থেকে বের করে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল প্রশস্ত রাস্তা ধরে। ড্রাইভার দেখি আমার প্রিয় একটি গান প্লে করল:

“কি আশায় বাঁধি খেলাঘর
বেদনার বালুচরে
নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে
নিশি দিন খেলা করে।।

হায় গো হৃদয় তবুও তোমার
আশা কেন যায় না
যতটুকু যায় কিছু তার পায় না
কিছু তার পায় না
কে জানে কেন যে আমার আকাশ
মেঘে মেঘে শুধু ভরে।।”

শিশুতোষ গল্প

শেয়াল পন্ডিতের পাণ্ডিত্য

নীলকন্ঠ জয় *আমার কাছে জীবণ একটা ভাঙ্গা কুঁড়েঘর। যেখানে রোদবৃষ্টি খেলা করে আপন খেয়ালে। লেখালেখি আমার দ্বারা হবে কিনা জানি না। তবে পড়ার জন্য এবং মত প্রকাশের নেশায় নিবন্ধন করা। জন্ম অতি সাধারণ এক ঘরে। তাই জীবণটা আটপৌড়ে। ফার্মেসীতে অনার্স শেষ করেছি। মাস্টার্স চলছে।*

শেয়াল মামা পন্ডিত বলিয়াই স্বীকৃত। বনে জঙ্গলে মাথা উঁচু করিয়াই চলেন তিনি। কিন্তু ফাঁদে পড়িয়া সদ্য খোয়া যাওয়া লেজটি নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন তিনি। বহুপূর্বে তাহার পরদাদারও একই অবস্থা হইয়াছিলো। সে যাত্রায় বনের প্রাণীরা শেয়াল জাতির পান্ডিত্যে একটা কলঙ্কের দাগ আঁকিয়া দিয়াছিলো। তাহার পরদাদা প্রাণীকুলে ব্যাপক ক্ষোভ এবং সমালোচনার মুখে পড়িয়াছিলেন বনের আর সকলের লেজ কাটিবার ফন্দী আটিয়া ধরা পড়িয়া।

দুই প্রজন্ম পর একই পরিস্থিতির সম্মুখিন যে তাহাকেও হইতে হইবে ইহা কি ভুলেও তিনি কখনো ভাবিয়াছিলেন? অদৃষ্ট এমনই নির্মম। মান-সম্মান যাহা ছিলো তাহার সমস্তটাই ম্লান হইয়া যাইতেছে লেজ খোয়ানোর লজ্জায়। লেজ ছাড়া প্রাণী ! হা ঈশ্বর রক্ষা করো!! বুদ্ধিমানকে বুদ্ধি দাও!!! মানীর মান রক্ষা করো !!!!

সমগ্র দিন পূর্ব বনে কাটাইয়া ঘোর অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া ডেরায় ফিরিতেছিলেন পন্ডিত মহাশয়। বিশেষ নজর রাখিতেছিলেন চতুর্দিকে যাহাতে কেহ তাহাকে এই দুরাবস্থায় দেখিতে না পায়। ডেরায় ফিরিয়া প্লান করিয়া কিছু একটা বাহির করিতে হইবে। কিন্তু যেথায় ব্যাঘ্রের ভয় সেথায় নাকি প্রহর কাটিয়া যায়। বলা নেই কওয়া নেই রাজা মহাশয়ের খাস পেয়াদা সামনে আসিয়া হাজির হইলো।

- আরে পন্ডিত মহাশয় এতো রাতে কোথা হইতে?
- ইয়ে পেয়াদা সাহেব , গিয়াছিলাম রাহুর দশা কাটাইতে।
- কাটিয়াছে?
- সবই ঈশ্বরের কৃপা। আসি তবে।

ভাগ্যিস অন্ধকারে পেয়াদা বেটা তাহার লেজের দিকে নজর দিতে পারেন নাই। ‘যাক বাবা এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলাম’ মনে মনে একথা বলিয়া ডেরায় ফিরিলেন পন্ডিত শেয়াল।

সমগ্র রাত্রি নিদ্রাহীন কাটিলো তাহার। শেষ প্রহরে এক মহাবুদ্ধি মাথায় চাপিলো তাহার। ডেরার মুখে সূর্য উদিত হইবার পূর্বেই ঝোপঝাড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন। নিজপুত্র ফটিককে দিয়া বনের রাজা বাঘ মামাকে বিশেষ সংবাদ পাঠাইলেন। হন্তদন্ত হইয়া বাঘ মামা ডেরার মুখে আসিয়া হাক ছাড়িলেন।

- কিহে পন্ডিত তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে?
- আমার অসুখে দুশ্চিন্তা নহে রাজা মহাশয়। গিয়াছিলাম দূর দেশে হস্ত দেখাইতে। রাহুর দশা হইতে মুক্ত হইতে। ফিরিলাম দুঃখের সংবাদ বহন করিয়া। এ দুঃখ আমার একার নহে প্রিয় রাজা মহাশয়, এই দুঃখ সমগ্র রাজ্যের।
- বিচলিত হইয়া পড়িতেছি, খুলিয়া বলো।
- যখন রাজ্যের ভাগ্য গননা করিতে বলিলাম জ্যোতিষকে, তখন তিনি এমনই এক দুঃখের সংবাদ দিলেন যাহাতে সমগ্র রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই রাজা মহাশয়।
- ভনিতা ছাড়িয়া আসল কথাটা বলিয়া ফেলো পন্ডিত, আমাকে দুঃশ্চিতায় ফেলো না।

- জ্যোতিষ রাজ্যের ভাগ্য গননা করিয়া বলিলেন তোমাদের রাজার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে শনির অমঙ্গল প্রভাবে। দ্রুত ব্যাবস্থা না লইতে পারিলে মহা সর্বনাশ হইবে তাহার।
- কি সে ব্যবস্থা খুলিয়া বলো।
- জ্যোতিষ মহাশয় বলিলেন এই রাজ্যের সব থেকে পন্ডিত ব্যক্তির এক পক্ষ কাল সূর্যের মুখ দেখা নিষিদ্ধ, তাহার সহিত...
- তাহার সহিত কি? খুলিয়া বলো জলদি।
- ইহা বলিতে আমার ভয় করিতেছে প্রিয় রাজা মহাশয়।যদি নির্ভয় দেন...
- তুমি নির্ভয়ে বলিয়া ফেলো।
- জ্যোতিষ বলিলেন পন্ডিত ব্যক্তির এবং তাহার সহিত আরো কয়েকজন শক্তিমান ব্যক্তির লেজ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে শনির কু প্রভাব কাটিয়া যায়। আমি গতরাত্রেই নিজ হস্তে মহান রাজার শান্তির নিমিত্তে এবং রাজ্যের মঙ্গলার্থে নিজের অতিপ্রিয় লেজটি কাটিয়া ফেলিয়াছি।

বলিয়া মায়াকান্না জুড়িয়া দিলো চতুর শেয়াল পন্ডিত। আর একথা শুনিয়া রাজা মহাশয় হুংকার ছাড়িয়া পেয়াদাকে ডাকিলেন।

- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতি মন্ত্রী, উপমন্ত্রী সবাইকে ডাকা হউক এখুনি। এই রাজ্যের ক্ষমতাধর এই সকল ব্যক্তিবর্গের লেজ কর্তন করিবার আশু নির্দেশ দেওয়া হইলো। তাহার সহিত এই সকল মহান ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননার ব্যবস্থাও করা হউক।
- যথা আজ্ঞা।

সন্ধ্যার পূর্বেই একে একে প্রধানমন্ত্রী, পাঁচজন মন্ত্রী, দুই জন প্রতিমন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রীর লেজ কর্তন সম্পন্ন হইলো। নৈশভোজের আয়োজন করিয়া শিয়াল পন্ডিতকে রাজ্যের এবং রাজার সর্বত্তম বন্ধুর মর্যাদা দেওয়া হইলো। সকল কর্তিত লেজগুলোকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাহিত করা হইলো।

এভাবেই চতুর শেয়াল পন্ডিত পরদাদার কলঙ্কের দাগ মুছিয়া নতুন ইতিহাস রচনা করিলেন। ইহার জন্যই বলা হইয়া থাকে ‘শেয়াল পন্ডিতের মেধার কাছে জঙ্গলের সব মেধাই চীরকাল পরাজিত হয়।’

কবিতা

ঝুম বৃষ্টি

শাহানারা রশিদ ঝর্ণা

তোমার জন্য মেঘলা আকাশ রূপো রঙের বৃষ্টি
মন উতলা কাব্য কথা-যায় যতোদূর দৃষ্টি
দেয়াল জুড়ে রঙিন ছবি সৃষ্টি স্বাধীন সুর যে
ছন্দে দোলে অন্য ভূবন নয় সে তো নয় দূর যে।
অন্ধকারে আয়না বিলাস দুঃসময়ের দ্বন্দ্ব
আচ্ছন্নতায় চিরটা কাল হৃদয় কপাট বন্ধ
লাবন্যহীন বর্তমান লুকিয়ে রাখা কিচ্ছা
সান্ধ্য-পূজার আয়োজনে ভুল ভরা সদিচ্ছা।
বিবর্তনের শেকল ভাঙা নোনা জলের কান্না
তৃষ্ণা ভরা হিম সাগরের মুক্তো হীরে পান্না
ঘাসের ডগায় বৃষ্টি ফোঁটা নৌকো নদীর ছন্দ
স্বপ্ন পেলেও যায় না ছোঁয়া কষ্ট নিরানন্দ
তোমায় ভেবে ফুটবে ফুটুক ঝুম বৃষ্টির ফুলটি
মন দেউলে বাজবে সানাই সেই ভাবনা ভুলকি?
অভিমানী মেঘ বারতায় কোন বিরহে দুলবো
হয়তো তোমার জন্য আজ-ই মন দরোজা খুলবো!

কবিতা

ঝরাফুলের মতো

শাহ্ আলম বাদশা ✍ *কবি, ছড়াকার, গীতিকার বিশেষত; শিশুসাহিত্যিক। বর্তমানে তথ্য কমিশনের বুলেটিন "নিউজ লেটার" সম্পাদক। এ পর্যন্ত ৫টি প্রবন্ধ সংকলন, ১টি গল্প সংকলন, ১টি কিশোর উপন্যাস "ফুলের চোখে পানি', শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ-- দুরন্তাই ধুত্তোরী ছাই, ইষ্টিপাখি মিষ্টিপাখি, ষড়ঋতুর দেশে, লিত্তামণির চিন্তা, কিশোর কবিতার বই—ফুলবনে হই-চই, ফুল-পাখি নদী, শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ—কালো মুরগি, বেওয়ারিশ লাশ এবং ৪টি অডিও ক্যাসেট (ভোরের পাখিরা/১৯৮৯, শিহরণ-১৩২ এবং ''প্যারোডি'') প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রজীবন অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন রেডিও বাংলাদেশ রংপুর কর্তৃক ''উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার'' হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ১৯৮৬ সালে সিলেট ছড়া পরিষদ কর্তৃক ছড়ায় অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে সাংবাদিকতাছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা যেমন; লালমনিরহাট থেকে ত্রৈমাসিক চলমান, ত্রৈমাসিক ব্যতিক্রম, ত্রৈমাসিক দারুচিনি, ত্রৈমাসিক কিশোরকন্ঠ, ত্রৈমাসিক প্রজাপতিসহ (অধুনালুপ্ত) বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক এবং লালমনিরহাটের প্রথম প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জানাজানি'র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্য সম্পাদক। বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সদস্য এবং এলএলবি'র ছাত্র; প্রধান তথ্য কমিশনারের (প্রতিমন্ত্রী) পিআরও হিসেবে তথ্য কমিশনে কর্মরত*

বারান্দাতে শুয়েছিলো ছোট্টশিশু মায়ের সাথে
উদোম গায়ে উপোসপেটে জমকালো এই নিঝুমরাতে!
হাড়-কঙ্কাল মায়ের পেটে একটুওতো ভাত ছিলোনা
দ্বারেদ্বারে ঘুরলো এবং চাইলো কতো, কেউ দিলোনা?

তাই শিশুটির ছটপটানি, জ্বলছিলো পেট ক্ষুধার চোটে
আধমরা মা'র পায়নিকো দুধ হাজার চুষেও একটু মোটে।
মায়ের চোখে জল ছলছল ঝরছিলো তাই বানের বেগে–
ঠিক তখুনি দরজা খোলে ডান্ডাহাতে মনিব রেগে?
নিশুতরাতে তার যে সুখের ঘুমভাঙ্গালো হতচ্ছারী
আচমকা তাই লাঠির ঘায়ে শোধ নিলো সে সত্যি তারি।

অবুঝ শিশুর দোষ কী ছিলো, ফিনকি দিয়ে ফাটলো মাথা-
হায়রে কপাল ''ভাগ'' তবুও কটমটিয়ে বললো যা-তা;
দুঃখিনী মা'র গায়েও সেকী লাগলো বিষম, পার ছিলোনা
জ্ঞান হারালো সাথে সাথেই হুঁশ যে মোটে আর ছিলোনা।
মরলো কিনা দেখলো না সে, বীরের বেশেই ঢুকলো ঘরে
ভয় পেয়োনা, খুব সহজেই গরীব কি আর যায়গো মরে?

বাপ মরেছে নেই বাড়িঘর, তাই দুঃখী ওই শিশুর মায়ে
বারান্দাতে রাত কাটিয়ে কাজ করে খায় পেটের দায়ে।
শিক্ষা এবং চিকিৎসা নেই ঠিক যে ঝরাফুলের মতো–
এমনি করেই ধুকে ধুকে মা ও শিশু মরছে কতো।

এই শিশুটা তুমিই হলে, কেমন হতো চিন্তা করো
দুঃখিনীটা তোমার যদি মাতাই হতো কিংবা ধরো–
এমন ছবি তোমার মনে উথাল-পাথাল দেয়কি হানা
'আমরা মানুষ সৃষ্টিসেরা' এই কথা কি যায়রে মানা!!

কবিতা

কেন এমন কর

মো: মালেক জোমাদ্দার ␣ *পিছনে ছুটিনা,যা প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তা যা দেন তাতেই খুশি। সাদামাটা জীবন আমি উপভোগ করি। অবসরে গান শুনি,টিভি দেখি। মাঝে মধ্যে,গল্প,কবিতা ও কলাম লেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস চালাই,তবে ছাত্র জীবনে স্কুল-কলেজ সাহিত্য সাময়িকীতে নিয়মিত লিখতাম। প্রকৃতির গাছপালা,পশুপাখি,নদ-নদীর প্রানীকূল আমাকে খুব টানে ।দেশ,মা, এবং দেশের প্রতিটি ধূলি কনাই আমার কাছে প্রিয় ।*

ভুলই যদি বুঝবে তাকে
প্রশংসা কেন করবে ?
মিছে মিছে কাছে টানার
ভাবটা কেন ধরবে ?
মনের কথা বুঝবে না যার
তাকে কেন খুঁজবে ?

ঘৃণা যদি করবে তাকে
ভালোবাসার অভিনয় কেন করবে ?
অট্টো হাসি হাসবে যখন তোমার ইচ্ছে করবে
মুচকি হাসির মায়া জালে তাকে কেন ফেলবে ?
নীলাকাশরে তারা হবে তুমি শুধু জ্বলবে
সেই ভুবনের আধার তলে তাকে কেন ফেলবে ?

কবিতা

খুঁজে ফেরা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

এই এক একাদশী চাঁদের প্রায় অন্ধকার আলোতে
রোজই খোঁজে ফিরি তোমার নরম গতর,
যেমন মৃত সাগরে ছিপ ফেলে বসে থাকে জেলে
আমিও তেমনি
এক আকাশ বুক মেলে রাখি,
তোমার আঙুলের লাঙলে যদি প্রাণ ফিরে পায়
আমার উষর ভুমি
যদি দু চোখে নামে বাঁধ ভাঙা শ্রাবণের প্রস্রবণ!
ঝিঝি ডাকা রাত বয়ে যায়
অন্ধকারও এক সময় ঘুমায়
শুধু

আমি কাঠের পুতুলের মত চেয়ে থাকি
তোমার অপেক্ষায়!
পাথর বুক
নির্ঘুম ক্লান্তিহীন চোখ
শত কামনার, শত বাসনার চেরাপুঞ্জি!
অতঃপর
এক পাতক সময়ে জেগে উঠে বিষণ্ণ ভোর
জেগে উঠে একাকীত্বের কারাগার,
নির্লিপ্ত প্রহর
নিজেকে মনে হয় কোনো এক সুতো কাটা ঘুড়ি
এক বন্ধ্যা জংগল!!

ছড়া

বৃষ্টি নিয়ে অকাব্য.....

এই মেঘ এই রোদ্দুরঃ *আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। জব করি বাংলাদেশ ব্যাংকে। নেটে আগমন ২০১০ সালে। তখন থেকেই বিশ্ব ঘুরে বেড়াই। যেন মনে হয় বিশ্ব আমার হাতের মুঠোয়। আমার ভিতরে এত শব্দের ভান্ডারও নেই সহজ সরল ভাষায় দৈনন্দিন ঘটনা বা নিজের অনুভূতি অথবা কল্পনার জাল বুনে লিখে ফেলি যা তা। যা হয়ে যায় অকবিতা। তবুও আপনাদের ভাল লাগলে আমার কাছে এটা অনেক বড় পাওয়া। আমি মানুষ ভালবাসি। মানুষকে দেখে যাই। তাদের অনুভূতিগুলো বুঝতে চেষ্টা করি। সব কিছুতেই সুন্দর খুঁজি। ভয়ংকরে সুন্দর খুঁজি। পেয়েও যাই। আমি বৃষ্টি ভালবাসি.....প্রকৃতি ভালবাসি, গান শুনতে ভালবাসি..... ছবি তুলতে ভালবাসি..... ক্যামেরা অলটাইম সাথেই থাকে। ক্লিকাই ক্লিকাই ক্লিকাইয়া যাই যা দেখি বা যা সুন্দর লাগে আমার চোখে। কবিতা শুনতে দারুন লাগে.....নদীর পাড়, সমুদ্রের ঢেউ (যদিও সমুদ্র দেখিনি), সবুজ.....প্রকৃতি, আমাকে অনেক টানে,,,,,,,,,আমি সব কিছুতেই সুন্দর খুজি.....পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি। লিখি.....লিখতেই থাকি লিখতেই থাকি কিন্তু কোন আগামাথা নাই.....সহজ শব্দে সব এলোমেলো লেখা.....*

১।
বৃষ্টি ঝরছে দিনটি ধরে
হিম হিম হাওয়া
চুপটি করে ঘরে বসে
চিড়ে ভাজা খাওয়া।

২।
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল
সবুজ পাতায়
ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে
চোখের পাতায়।

৩।
ভিজতে ভারি মজা
আহ!গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে
মন প্রাণ জুড়ায় যেন
বৃষ্টির অপরূপ সৃষ্টিতে।

৪।
বৃষ্টি এলেই দেখি সবে
মাথা ঢাকে ছাতায়
একটুখানি রহমতের ফোঁটা
পড়তে দাওনা মাথায়!

৫।
মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল
তির্যক আলোর সূর্য
হঠাৎ করে ঝরে, ঝরোঝর
রোদ বৃষ্টির মৌথর্য।

৬।
সবেগে বর্ষিত হলো
এক পশলা বৃষ্টি
সবুজ হলো আরো সবুজ
চোখের মেললো তুষ্টি।

৭।
বৃষ্টি বুঝি ভয় পাও
মাথায় তাই ছাতা
ভিজলে একটু হয় কি
পাবে নাকি ব্যথা।

৮।
কান্না যেনো শুনতে পাই
বৃষ্টি ঝরছিল যখন
আমার কান্না উড়িয়ে নিয়ে
বৃষ্টি ঝরছিল তখন।

৯।
রাতের বৃষ্টি নিয়ে আসে
চোখে বেঘোর ঘুম
হিম দেশের স্বপ্ন রাজা
চোখে বসায় চুম।

১০।
বৃষ্টি নিয়ে রচিত হয়
কাব্য শত হাজার
বৃষ্টির পরশে শিহরণ
মম হৃদ মাঝার।

১১।
আঁধার কালো আকাশ
ঝরায় বৃষ্টি ঝমঝম
এমন দিনে ঘরের কোনে
পরিবেশটা থমথম।

১২।
আষাঢ় মাসে থই থই পানি
মাঠের পর মাঠ জুড়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ের ঘর্ষনে যেনো
ঝাঁক ঝাঁক বক উড়ে।

১৩।
ভারি বর্ষনে পড়ে যায়
মাছ ধরার ধুম
রাত বিরাতে মাছ ধরে
হারাম হয় ঘুম।

১৪।
বৃষ্টির দিনে খেতে মজা
ইলিশ খিচুড়ি
আরো ভাল সিঙ্গারা আর
মচমচে ডাল পুরি।

১৫।
বৃষ্টি আমার ভালবাসা
ভেজায় মন প্রাণ
বৃষ্টির পরে ভাল লাগে
ভেজা মাটির ঘ্রাণ।

জীবনের গল্প

অপেক্ষা

এ টি এম মোস্তফা কামাল

ঘড়ি পরিষ্কার করার মতো অদ্ভুত পেশায় তার আসার কথা ছিলো না। বাপদাদা ছিলেন কৃষক। বাপ সুদের ওপর টাকা ধার নিয়েছিলেন এক আগরওয়ালার কাছ থেকে। সুদ জমে এতো বেশী হলো যে শেষ পর্যন্ত সব জমি আর বাড়ির বেশীরভাগ বেচতে হলো প্রায় পানির দামে। বিপদে পড়া মানুষের জমি কেউ ন্যায্য দাম দিয়ে কিনতে চায় না। সেই শোকে বাবা মারা গেলেন অল্প দিনের মধ্যেই। মা ভাইবোন মিলে আট জনের সংসারের ভার তার কাঁধে। আর কিছু না পেয়ে গ্রামের এক জনের বুদ্ধিতে এই বিচিত্র কাজে নিরুপায় হয়ে নেমেছে সে।

এই সব কথা ভাবছিলো রহিম উদ্দিন তার সাইকেলে বসে। সাইকেলটার সাথে বিশেষ কায়দায় ঘড়ি সাফ করার যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে। শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়কে ঘড়ি সাফ করার কাজ করে সে। সকাল থেকে ১০/১২টি ঘড়ি সাফ করেছে। ঘড়ি প্রতি নেয় দু'টাকা।

কাজ না থাকলে রহিম বসে বসে মানুষ দেখে। সবাই কী ব্যস্ত হয়ে ছোটে। কারো নজর নেই কোন দিকে। কতো কাজ যেন সবার। শুধু তারই বুঝি কাজ নেই। সে ধৈর্য ধরে কাস্টমারের জন্য অপেক্ষা করে। যখনই সে মানুষের দিকে তাকায় তখন আপনা আপনিই প্রথমে চোখ যায় বাঁ হাতের কবজিতে। কতো বিচিত্র ঘড়ি শোভা পায় সেখানে। আগে মেয়েরা ঘড়ি পরতো ডান হাতে। আজকাল তারাও বাঁ হাতে ঘড়ি পরতে শুরু করেছে।

রহিমের বেশীরভাগ কাস্টমার যুবক। খুব সেজেগুজে আসে। এসেই খুব তাড়তাড়ি ঘড়ি সাফ করতে বলে। মুখে ফুটে থাকে অস্থির ভাব। বোঝাই যায় বিশেষ কারো কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে। তাই খুব দ্রুত ঘড়ি সাফ করা শিখে নিয়েছে রহিম। কিছু কাস্টমার আছে ফুলবাবু গোছের। তারা সেই তাড়নায় আসে ঘড়ি সাফ করাতে। তাদের তাড়া থাকেনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাফ করিয়ে নেয় ঘড়ির সর্বাঙ্গ।

৩৪ বছর বয়স রহিমের। ভাঙাচোরা চেহারা। এখনো বিয়ে করেনি। অথচ গ্রামে তার সমবয়সীরা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো কয়েকবার। রহিম সাহস করেনি।

আজ দুপুরের পর থেকে একজন কাস্টমারও আসেনি। বিকেল গড়িয়ে গেলো। কতো মানুষ যাচ্ছে। সে মানুষ দেখতে থাকে। হঠাৎ চোখ আটকে গেলো অদ্ভুত সুন্দর এক কবজিতে। গোলগাল, তুলতুলে, গৌরবর্ণ ! সোনালী রঙের ঘড়িটি সেখানে চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। হাত ছেড়ে মুখে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলো সে। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী ! কিন্তু সে অপরূপা ওর দিকে না তাকিয়ে আপন মনে চলে গেলো। ঘোরলাগা চোখে অপলক চেয়ে রইলো রহিম..........................!

রস রচনা

পল্টুর বিজ্ঞান চর্চা।

শওকত আলী বেনু ◙ *লেখালেখি করি। সংবাদিকতা ছেড়েছি আড়াই যুগ আগে। তারপর সরকারী চাকর! চলে যায় এক যুগ। টের পাইনি কী ভাবে কেটেছে। ভালই কাটছিল। দেশ বিদেশও অনেক ঘুরাফেরা হলো। জুটল একটি বৃত্তি। উচ্চ শিক্ষার আশায় দেশের বাইরে। শেষে আর বাড়ি ফিরা হয়নি। সেই থেকেই লন্ডন শহরে। সরকারের চাকর হওয়াতে লেখালেখির ছেদ ঘটে অনেক আগেই। বাইরে চলে আসায় ছন্দ পতন আরো বৃদ্বি পায়। ঝুমুরের নৃত্য তালে ডঙ্কা বাজলেও ময়ূর পেখম ধরেনি। বরফের দেশে সবই জমাট বেঁধে মস্ত আস্তরণ পরে। বছর খানেক হলো আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে কচি কাঁচা ঘাসেরা লুকোচুরি খেলছে। মাঝে মধ্যে ফিরে যেতে চাই পিছনের সময় গুলোতে। আর হয়ে উঠে না। লেখালেখির মধ্যে রাজনৈতিক লেখাই বেশি। ছড়া, কবিতা এক সময় হতো। সম্প্রতি প্রিয় ডট কম/বেঙ্গলিনিউস২৪ ডট কম/ আমাদেরসময় ডট কম সহ আরো কয়েকটি অনলাইন নিউস পোর্টালে লেখালেখি হয়। অনেক ভ্রমন করেছি। ভালো লাগে সং মানুষের সংস্পর্শ। কবিতা পড়তে। খারাপ লাগে কারো কুটচাল। যেমনটা থাকে ষ্টার জলসার বাংলা সিরিয়ালে। লেখাপড়া সংবাদিকতায়। সাথে আছে মুদ্রণ ও প্রকাশনায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন।*

এই রবিন,বাসুদেবের গল্প পড়েছিস? পল্টু, রবিনকে প্রশ্ন করেই মিটিমিটি হাঁসতে থাকে।

-বাসুদেব কে? রবিন ঝটপট জবাব দেয়।

-আরে ওই যে, ব্লগে লেখা লেখি করে। মুক্তচিন্তায়ও লেখে।

-তো, হয়েছে কি? কিসের গল্প?

-বেচারা গল্প লিখতে গিয়ে নিউটনকে চ্যালেঞ্জ করেছে। নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নাকি ভুল আছে। গল্পের নামটা কি জানিস? নিউটনের ভুল।

-কোন নিউটন? সেও কি ব্লগে লেখে?

-আরে নাহ। তুই দেখি আরেক আহাম্মক। বিজ্ঞানী নিউটনের কথা বলছি। প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। যে ব্যাটা গতির সূত্র এবং সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র এই দুটির আবিষ্কারক।

-তো। এখানে তোর সমস্যা কোথায়?রবিন এবার নড়েচড়ে বসে।

- আরে না না, আমার কোনো সমস্যা হয়নি। এবং নেইও। গল্পটা পড়ে বুঝলাম মহাবিশ্বে কোন বস্তুই নাকি স্থির নয়। নিউটনের আবিষ্কারের উপর মাতব্বরি!দেব সাহেবের সাহস তো কম নয়। তবে গল্পটা মনে হয় গল্পকার শেষ করেনি। সিরিজ লিখবে কিনা জানিনা। তাই বিষয়টা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

-যদি বুঝতেই না পারিস তাহলে এত পোদ্দারি করছিস ক্যান? আঁতলামোর আর জায়গা পাওনা শালা। রবিন এবার ক্ষ্যেপে যায় পল্টুর উপর।

পল্টু ছোট্ট বেলা থেকেই বিজ্ঞান মনস্ক। সব কিছুই যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝতে চায়। এবং সকল রহস্যের শেষটা দেখে নেয়। পল্টু নিউটনের গতির তিনটি সূত্র হাইস্কুলে থাকতেই স্পষ্ট করে শিখে নিয়েছে। এর পর থেকে তাঁকে আর এই নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি। সূত্র তিনটি এখনো পল্টু মুখস্ত বলতে পারে। একবার এই সূত্রগুলো মুখস্ত বলতে না পাড়ায় বিজ্ঞান শিক্ষক তোফাজ্জল স্যার কী পিটুনিটাই দিয়েছিল তা মনে পড়লে

আজো পল্টু চমকে উঠে। সেই থেকেই সূত্রগুলো তাঁর কাছে পান্তাভাত। যে কাউকে সহজেই শিখিয়ে দিতে পারঙ্গম।

'বাহির হইতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে'- বাসুদেবের গল্পের এই লাইনটা পল্টুর কাছে বেশ ইন্টারেষ্টিং মনে হয়েছে। পল্টুর যত সব খেঁচখেঁচানি ওই লাইনটার বিষয়বস্তু নিয়ে। স্থির বস্তুর উপর বল প্রয়োগ না করিলে ওই বস্তুটির অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা এই রহস্যের আদিঅন্ত উতঘাটন করা তাঁর নিকট এখন বেশি জরুরী। এই রহস্যের কুলকিনারা করতে পারলেই ঐতিহাসিক রানা প্লাজা ধসে পড়ার কারণটি নিয়ে বিশ্ব জোড়া যে হৈচৈ হয়েছিল এবং তত্কালীন মন্ত্রীর যে ইমেজ পাঙ্কচার হয়েছিল তাঁর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টির পজেটিভ সুরাহা করা যাবে।

-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে ওই রানা প্লাজার ধসের সম্পর্ক কি? রবিন পল্টুর কাছে আগ্রহ সহকারে জানতে চায়।

-আছে, আলবৎ আছে। পল্টু জবাব দেয়। মন্ত্রী মহোদয়ের 'নাড়াচাড়া' তত্বটি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্রের সম্ভাব্য প্রভাব বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমি পল্টু এইটা প্রমান করেই ছাড়বো। নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটির সাথে 'নাড়াচাড়া' তত্বের একটা যোগসূত্র আছে।

-রবিন তোর কী স্মরণ আছে সাবেক মন্ত্রীর 'নাড়াচাড়া' তত্বের সেই আলোচিত কাহিনী? পল্টু রবিন কে প্রশ্ন করে।

-ঠিক মনে পড়ছেনা। নাড়াচাড়া তত্ব আবার কোনটি? ব্যাপারটা খুলে বলতো?

-ক্যান ভুলে গেলি নাকি? শালা কবি তোর দেখি কিচ্ছুই মনে থাকেনা। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর বলেছিল না, বিএনপির হরতাল সমর্থকরা স্তম্ভ ধরে নাড়াচাড়া করায় সাভারের রানা প্লাজার ওই ভবনটি ধসে পড়েছে। মন্ত্রী তো এই বিষয়ে বিবিসিকে এক সাক্ষাতকারেও বিষয়টি পরিষ্কার করেছিল। আর এই নিয়ে তো কত হৈচৈ পড়েছিল। শুধু দেশে নয় বিশ্বজোড়া হৈচৈ। খোদ নাসাও নাকি মহা চিন্তায় পড়েছিল এই বিশাল আবিষ্কারের কারণে!

- ঠিক বলেছিস পল্টু। আমার পুরোটাই এখন মনে পড়ছে। যদ্দুর মনে পড়ছে, তিনি একজন ডক্টরেট। আমাদের নদীমাতৃক দেশের একজন খাল খনন বিশেষজ্ঞ। ছিলেন অভিজ্ঞ আলমা। বিদেশেও অনেক ভ্রমন-ট্রমন করেছেন। জনতার মঞ্চ বানিয়ে সরকারও কুপোকাত করেছেন। খাল খননে ডক্টরেট হলেও তিনিই ছিলেন বিশ্ব কাপানো ওই 'নাড়াচাড়া' তত্বের জনক। গোটা বিশ্বের মানুষ তার আবিষ্কৃত তত্ব নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈচৈ করেছেন। মজাও লুটেছেন। ফেইসবুক সহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোয় তত্বটির নানারকম বিশ্লেষণও হয়েছে।

-তোর তো দেখি সব কিছুই মনে আছে। এতক্ষণ ত্যাড়া ব্যাড়া কতা কইলি ক্যান?

-থাকবেনা ক্যান? হগল কবিরাই আল্লভুলা?

বিজ্ঞানী নিউটনের প্রথম সূত্রটি পল্টুর মুখস্ত। এই সূত্রটির মর্ম কথা হলো বাহ্যিক কোন বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকে এবং গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকে।

পল্টু নিজের টানা অর্ধেক সিগারেট রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে নিউটনের গতির তিনটি সূত্র তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে। ভাবুক রবিনের এতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকলেও পল্টুর বকবকানি প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়। সহ্য না করে উপায়ও নেই। পাছে কিনা সিগারেটটি হাতছাড়া হয়ে যায়। পল্টুর সাথে আড্ডা দিতে পারলে দিনে অন্তত কয়েক বার যাযাবর রবিনের ভাগ্যে ওই পাওনাটা জুটে।

পল্টু সিগারেট টানতে টানতে নিউটনের গতিসূত্রের নিখুত ব্যাখ্যায় চলে যায়। গতির তিনটি বিখ্যাত সূত্র হল প্রকৃতির তিনটি নিয়ম, যা চিরায়ত বলবিদ্যার ভিত্তি স্বরূপ। এই নিয়ম গুলো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং তার দরুন সৃষ্ট গতির মধ্যে সম্পর্ক বর্ননা করে।

-আরে বাপু থাম থাম। ওই সব কঠিন তত্ব আমার ভোঁতা মাথায় ঢুকবে না। ভাবুক রবিন পল্টুকে জোর করে থামাতে চেষ্টা করে।

কে শুনে কার কথা! পল্টু নিউটনের গতির প্রথম সূত্রটি একটানে মুখস্ত বলে ফেলে। প্রথম সূত্রটি হলো 'স্থির বস্তু আজীবন স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু আজীবন সমগতিতে গতিশীল থাকতে চায় যতক্ষণ না তার উপর কোন বহিঃস্থ নেট শক্তি প্রয়োগ করা হয়'।

পল্টুর এই জাতীয় আঁতেলগিরি রবিনের কখোনই পছন্দ নয়। যদিও সে সর্বদাই লজিক্যাল কথা বলে। তবে বেশি বেশি জটিল বাক্য বলতে থাকলে রবিনের মাথায় কিছুই ঢুকতে চায় না। বিজ্ঞানের কঠিন তত্ব বর্ণনা করলেও পল্টুর এবারের গদগদানি যে যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা এই প্রথমবার অনায়াসে রবিনের মাথার মধ্যগিলুতে কিছুটা হলেও জায়গা করে নিয়েছে।

-পল্টু, এবার তুই একটু দম নে দোস্ত। আমার মাথায় আর এইসব কঠিন তত্ব-ফত্ব কিছুই ঢুকছেনা। আমাকে তুই দুই চারটা কবিতা লেখার সুযোগ দে। হাত জোর করে সময় চায় রবিন।

-ঠিক আছে। কিন্তু নাড়াচাড়া তত্বের ওই হাস্যরস কী রহস্যেই থেকে যাবে? এর তো একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও তোর এই পল্টুর দোস্তের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেনা কেউ।

-তাহলে কী বলবি একটু জলদি বল। বিরক্ত সুরে রবিন চিল্লানি দেয়।

-বলছি, শোন। সাবেক এই বিজ্ঞ আমলা ও রাজনীতিকের বক্তব্যকে অনেকেই হেয় করেছে। অনেকেই বিষয়টিকে হাস্যকর ও রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেও আমি তা মনে করিনা।

-তাহলে তুই কী মনে করিস?

-আমি মনে করি নিউটনের গতিসূত্রের সম্ভাব্য প্রভাব বলয় থেকে 'নাড়াচাড়া তত্ব 'কে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সাবেক ওই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্ভাব্য কারণ হিসাবে নাড়াচাড়া তত্ব আবিষ্কার করেছেন কেন? কেন তিনি বিশাল একটি দালান ধসে পরার জন্যে কতিপয় হরতাল সমর্থক কর্মী বাহিনীকে দায়ী করলেন? এখানেই রয়েছে নিউটনের গতিসুত্রের সাথে তাঁর আবিষ্কৃত নাড়াচাড়া তত্বের সরাসরি যোগসূত্র। বিজ্ঞানের প্রতি চরম অনীহা থাকায় বিষয়টিকে তখন কেউ অনুধাবন করতে পারেনি।

-তা কিভাবে? রবিন প্রশ্ন করে।

-এখানেই তো ওস্তাদের মাইর। আমি পল্টু পোদ্দার। আমার সাথে টেক্কা দিবে কুন শালায়? বিশাল এই দালানটিকে মাননীয় ডক্টরেট স্থির বস্তু হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। নিউটনের সূত্রমতে বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তুর উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। রানা প্লাজা নামক এই দালানটি একটি বিশাল স্থির বস্তু। সুতারং একটি স্থির বস্তুর উপর হরতাল সমর্থনকারীরা কোনো রকম বল প্রয়োগ না করলে 'রানা প্লাজা' নামক এই বিশাল স্থির বস্তুটি ধসে পড়বে কেন? এই সোজা-সাপ্টা কথাটা বুঝতে অসুবিধা কোথায়? এবার একটু তাত্বিক বিশ্লেষন করছি। স্যার আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্রের বল যে দিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে থাকে। হরতালকারীরা যে দিক থেকে বল প্রয়োগ করেছে প্রয়োগকৃত বলের বিপরীত দিকে

ভবনটি তাই কিছুটা হেলে গিয়ে ধসে পড়েছে। ভবনটি বিপরীত দিকে ধসে না গেলে যারা বল প্রয়োগ করে ধাক্কা দিয়েছে তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করত। তার খবরও সংবাদপত্রে বের হতো। হরতালকারীদের মৃত্যুবরণের খবর কিন্তু সংবাদপত্রে আজো ছাপা হয়নি। তাই ধরে নেয়া হচ্ছে ভবনটিতে নিউটনের গতিসূত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাহির হইতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে। রানা প্লাজার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা হলো কতিপয় হরতাল সমর্থক কর্মী বাহিনী স্থির বস্তুটির উপর বল প্রয়োগ করেছিল তাই ভবনটি ধসে গিয়েছিল।

-তা হলে তো ওই ডক্টরেট সাহেব কোনো আহাম্মকি কথাবার্তা বলেন নি। কবি রবিন সহজেই মেনে নেই পল্টুর যুক্তিযুক্ত কথা।
-একদম যথার্থ বলেছিস। ওই ডক্টরেট সাহেবের 'নাড়াচাড়া' তত্বটি বিখ্যাত আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্রের সম্ভাব্য প্রভাব বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

আমি পল্টু। পল্টু পোদ্দার। আমি চলি গাছের পাতায় পাতায়। বিজ্ঞান নিয়ে আমার সাথে পোদ্দারি?

কবিতা

যাত্রায় বিপত্তি

এস এম আব্দুর রহমান

সে দিন আমি অফিস যাচ্ছি
সায়েদা বাদের বাসে
ক্ষণিক বাদে মহিলা এক
বসলো আমার পাশে।
একা নয় সে কোলে বাচ্চা
বয়স ছয় কি সাতে,
মায়ের কোলে বসে আছে
মুরগী একখান হাতে।
সামনের সীটে তাদের দলের
মহিলা বসা তিন
ক্ষণিক বাদে বমির শব্দে
মোর গা করে ঘিন ঘিন।
হেল্পার বলে বমির স্বভাব
পলিথিন নেই কেণ?
আমিও তায় নানা উপদেশ
দিচ্ছি ঘন ঘন।
পাশের বাচ্চা মাথা নুইয়ে
ঘুমে মায়ের কোলে
ওয়াক শব্দে বাম হঠাৎ
আমার গায়ে ডালে।
বিপত্তি দেখে বাচ্চার মা
হয়ে যায় হতবাক
এই বিপাকে আমিও তখন
হয়ে গেছি নির্বাক।
অনুতপ্ত মা কাপড় মোর
মুছে আচলে তার
বমির গন্ধে নাড়ি যেন
বাইরে আসছে আমার।
সেই ভাবেই অফিসে ঢুকে
বাথ রোমেতে যত
ঢালি পানি ধুতে বমি
গন্ধ বাড়ে তত।
ভাবি মনে দেহের গন্ধ
হবে না কভু লীন
যদিনা কভু যায় মুছে
আত্মার সেই ঘিন ঘিন।।

কবিতা

ভাঙ্গা গ্লাসে

সাঈদ চৌধুরী ✉ *দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যেতে চাই।*

যখন সন্ধার আধার নামে
বিষন্নতা ভরা এক বিকেলের পরে
একা একা বসে থেকে
রেল লাইনটার পাশে
এপাশ থেকে ওপাশে
সবুজ সাকোর স্পষ্ট জলচ্ছবিতে
জীবনের আঁকাবাঁকা স্বপ্নগুলো
হয়ত চূর্ন নতুবা নতুন সৃষ্টিতে
এক আকাশ আশায় বুক বাধেঁ...
এইতো সান্ধ প্রদীপ আলো জাললো বলে
কোন রঙিন রাত
অথবা ধুসর অন্ধকারে
হারিয়ে যাওয়া কালের গভীরে
অভাবিত ভাবনাগুলো
কোঁকড়া চুলে আস্তানা করে
জীবনের এই ছন্দপতনে
ঘোর অমানিশার দদুল্যতায়
আবার সে প্রিয়ার মুখ ফিরে আসে
কোন আধোয়া, অস্পষ্ট, পড়ে থাকা
আয়নার ভাঙ্গা গ্লাসে।

পর্যটন

সোনাকাটা সমুদ্র সৈকত - অভাবনীয় সৌন্দর্যের হাতছানি !

বঙ্গোপসাগরের নোনা পানির ঢেউ সাদা ফেনা তুলে আছড়ে পড়ছে তীরে। সকালের সূর্যরশ্মি ঢেউয়ের ফেনায় পড়ে ঝকমক করছে। পাখির দল উড়ে যাচ্ছে এদিক সেদিক। বড় বড় ট্রলার নিয়ে জেলেরা ছুটছে গভীর সাগরের দিকে। এমন মন ভোলানো অনেক দৃশ্য চোখে পড়বে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে জেগে ওঠা সোনাকাটা বনে।

বরগুনার আমতলী উপজেলার তালতলী থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরে ফকিরহাট বাজার। বাজারের পাশেই গহিন বন। ছোট্ট একটি খাল মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বনটিকে। ভূখণ্ডটি স্থানীয়দের কাছে 'ফাতরার বন' হিসেবে পরিচিত। তবে বন বিভাগের খাতায় এটি 'টেংরাগিরি' সংরক্ষিত বনাঞ্চল। আয়তন ৯,৯৭৫.০৭ একর। নবগঠিত সোনাকাটা ইউনিয়নের অন্তর্গত এ দ্বীপটি এখন 'সোনাকাটা বন' হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

বনের পূর্বে কুয়াকাটা, পশ্চিমে সুন্দরবন আর হরিণবাড়িয়া, উত্তরে বিশাল রাখাইন পল্লী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ বন থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুটিই উপভোগ করা যায়। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হওয়া এ বনে আছে নানা জাতের গাছপালা। আছে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির বিচরণ। ফাতরার বনে ইকোপার্ক তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পর্যটকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ছোট একটি ডাকবাংলো। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে ট্রলারে সোনাকাটা যেতে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগে।

সোনাকাটা বনের মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট খাল। ট্রলার নিয়ে এই খালে ভ্রমণ আর চরের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করার মজাই আলাদা। সোনাকাটার আশপাশে আরো বেশ কয়েকটি ভ্রমণ স্পট রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে গইয়ামতলা ও আশারচর উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র ভ্রমণ, গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর অবারিত সুযোগ রয়েছে সেখানে।

অসংখ্য বানর, শূকর, বনমোরগ, মদনটাক, কাঠবিড়ালি, মেছোবাঘ, লাল কাঁকড়া, বকসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি আর সাপের অবাধ বিচরণ রয়েছে সোনাকাটা বনে। সেখানে ছোট-বড় ১২টি কিল্লা ও সাতটি মিঠা পানির পুকুর রয়েছে।

সোনাকাটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে পর্যটকদের চলাচলের জন্য দুই কিলোমিটারের বেশি সিসি রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া হরিণ ও বাঘের বেষ্টনী এবং কুমির প্রজননকেন্দ্রসহ বন্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ।

পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাবলী

আশার চর

সোনাকাটার পাশেই আশার চরের অবস্থান। অসংখ্য মৎস্যজীবীর বসবাস এই চরে। আবার শীতের মৌসুমে পর্যটকরাও সেখানে যান। দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত, গভীর অরণ্য, বিশাল শুঁটকিপল্লী রয়েছে আশার চরে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যাওয়া মানুষ শুঁটকি উৎপাদনের জন্য চরটিতে ঘর বাঁধে। বছরে সাত থেকে আট মাস থাকে শুঁটকি উৎপাদনের ব্যস্ততা।

তালতলী রাখাইন পল্লী

আশার চরের কাছেই রয়েছে তালতলীর বিশাল রাখাইনপল্লী। বঙ্গোপসাগরের তীরে এ পল্লীতে কুপিবাতি জ্বালিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাঁতে কাপড় বোনার কাজ। তাঁতশিল্প ছাড়াও রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দিরও অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হতে পারে।

যেভাবে যেতে হবে

ঢাকা হতে সড়ক ও নৌ উভয় পথেই বরগুনা যাওয়া যায়। ঢাকার গাবতলী ও সায়েদাবাদ থেকে বিভিন্ন পরিবহন সকাল এবং রাতে উভয় সময় ছেড়ে যায়। দ্রুতি পরিবহন(০১১৯৬০৯৫০৩৩) সকাল সাড়ে ৮টায় এবং একই সময় রাতে বরগুনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়, সাকুরা পরিবহন(০১১৯০৬৫৮৭৭২, ০১৭২৫০৬০০৩৩) গাবতলী থেকে সকাল এবং রাত পৌনে ৯টায় এবং সায়েদাবাদ বাসস্টান্ড থেকে সকাল ও রাত সাড়ে ৮টায় ছেড়ে যায় এছাড়াও আবদুল্লাহ পরিবহনসহ(০১৭১০৬২৫৮০৯)বেশ কয়েকটি পরিবহন ঢাকা-বরগুনা রুটে চলাচল করে। আপনি চাইলে নদী পথেও বরগুনা যেতে পারেন। একদিন পর পর 'এম ভি বন্ধন-৭'(০১৮২১১৬৫৮৭৫) নামে একটি লঞ্চ ঢাকার সদরঘাট নদীবন্দর থেকে বরগুনা যায়। লঞ্চই আরামদায়ক বাহন।

বরগুনা হতে তালতলীর দুরত্ব মাত্র ১৭ কিমি. গাড়ী কিংবা নৌকা করে যাওয়া যায় তালতলী। অতপর পদব্রজে কিংবা নৌকায় করে সোনাকাটা বনে যেতে হয়।

কোথায় থাকবেন

আমতলী উপজেলায় ভাল মানের তেমন কোন হোটেল নেই। থাকতে হবে বরগুনা শহরে। বরগুনায় রাত্রিযাপন ব্যবস্থা খুবই ভাল। অনেকগুলি রেস্ট হাউস আছে এছাড়া আছে কয়েকটি আবাসিক হোটেল।

রেস্ট হাউস জেলা পরিষদ ডাকবাংলো(০৪৪৮-৬২৪১০)
খামারবাড়ী রেস্ট হাউস(০৪৪৮-৬২৪৬৯)
পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউস(০৪৪৮-৬২৫৫১)
রেস্ট হাউস এল.জি.ই.ডি রেস্ট হাউস (০৪৪৮-৬২৫৪২)
সিইআরপি রেস্ট হাউস (০৪৪৮-৬২৫৫১)।
এছাড়া বরগুনায় আছে একাধিক আবাসিক হোটেল
হোটেল তাজবিন(০৪৪৮-৬২৫০৩)
বরগুনা রেস্ট হাউস(০১৭১৮৫৮৮৮৫৬)
হোটেল আলম(০৪৪৮-৬২২৩৪)
হোটেল বসুন্ধরা(০৭১২৬৪৫৩০০৭)
হোটেল মৌমিতা(০৪৪৮-৬২৮৪২)
হোটেল ফাল্গুনী (০৪৪৮-৬২৭৩৩)।

তবে সোনাকাটা থেকে কুয়াকাটার দুরত্ব মাত্র ৩০ মিনিটের। সুতরাং ইচ্ছে করলে কুয়াকাটাও থাকতে পারেন। কুয়াকাটা থাকাই সবচেয়ে উত্তম। তাতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতটাও দেখা হয়ে যাবে।

কবিতা

প্যারাডক্স

শ্যাম পুলক ৷ *আসলে আমার সব চেয়ে বড় সমস্যা হল আমি যখন যা করি তাই করি অন্য কিছু পারি না। যখন কবিতা লেখি তখন শুধু কবিতা। আর কিছু পারি না। রাত দিন বসে বসে কবিতা। আবার যখন তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করি তখন আর আবার কবিতা নেই।*

জীবনকে দিয়েছি পালিয়ে যেতে, মৃত্যুকে দেখিয়েছি সেই পথ
এক, দুইয়ের মাঝে দুইকেই ধরেছি পেয়েছি পুষ্পরথ।

জলকে দেখিয়েছি আগুনের ভয়, আগুনে ঢেলেছি ফের জল
যে চোখে দেখেছি অশ্রুমালা সে চোখেই দেখেছি কাজল।

হাসিকে বলেছি কেন এতো হাসো, কান্নাকে বলেছি কেঁদো না।
যে ভাবনারা তোমারে ভাবায় তা নিয়ে কভু ভেবো না।

স্বপ্নকে দিয়েছি তাড়ানোর ভয়, জীবনকে দেখিয়েছি স্বপ্নের আশা
তা দেখেই করেছি চিৎকার যা দেখে হারায়েছি ভাষা।

হারানোর ভয়ে বেসেছি ভালো, পাওয়ার ভয়ে ছেড়ে গেছি দূরে
সে হৃদয়ে বিশাল সমুদ্র তারেই আটকে রেখেছি কুঁড়ে ঘরে।

ঈশ্বরকে তাড়িয়েছি ধর্মের নামে, ধর্মকে ঈশ্বর মানি না বলে
যে হৃদয়ে গেঁথেছি প্রকৃতির রুপ সে হৃদয় পূর্ণ অনলে।

প্রগতির পথে ঢলেছে সভ্যতা, ইতিহাসে রেখেছে হৃদয়-প্রান
যে পথে পেয়েছি প্রেম ভুরিভুরি সে পথেই অভিমান।

রুপকে বলেছি দূরে দূরে থাকো, হৃদয়কে বলেছি ভাগো তার পিছু
যে জায়গায় খুড়ে পেয়েছি তৃষ্ণার জল তাই মাটি হতে নিচু।

আদি হতে আমি ছিলাম অরন্যে, আজ অরন্য হতে ভাগি লজ্জায়
যে প্রেমিকা ছেড়ে চলে গেল পাই না তার কিই অন্যায়!

মৃত্যুকে বলি যাও যত দূরে পারো, জীবনকে বলি করে যাও অভিনয়
একদিন এসে মৃত্যুপুরী হতে আজ সেই মৃত্যুকেই করি ভয়।

প্রেমরে তাই বলি তুমি দূরে থাকো, যতো পারো শুধু আমারেই ডাকো
আমি সেই নদীই হেঁটে পাড় হবো যেখানে নেই কোন সাঁকো।

গল্প

ক্ষুদ্রাকার তেলাপোকা ও পন্ডিতমশাইয়ের পাটিগনিত

নিঃশব্দ নাগরিক

জগতে অতিকায় হস্তি লোপ পায়, ক্ষুদ্রাকার তেলাপোকা ঠিকই থাকে। পন্ডিতমশাই'রাও কালে কালে ক্ষুদ্রাকার তেলাপোকা হয়ে টিকে থাকে এবং সহজ পাটিগনিতকে দু'চোখের জল দিয়ে গুলিয়ে ফেলে। অমানুষ হওয়ার সবক'টা ধাপ পেরিয়ে পন্ডিতমশাইরা কালে কালে আমাদের জ্ঞান দীক্ষা দিয়ে যান। আমরাও অমূল্য শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে দন্ড নিয়ে খগড়হস্তে নেমে পড়ি। বিদ্যার উপযুক্ত দাম মেটাতে বিদেশ থেকে আনা পিপার স্প্রে দিয়ে অমূল্য শিক্ষকদের বরন করি। তারপর প্রিয় ব্যক্তিত্বের জায়গায় কোন এক শিক্ষকের নাম বসিয়ে ভাব আবেগী দু'চার পৃষ্ঠা লিখে পুরষ্কার উঁচিয়ে ধরে শিক্ষকের শ্রাদ্ধ সারি।

আজকাল মাঝে মাঝে নিজেকে অমানুষ মনে হয়। বাবা গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে। বাবার মৃত্যুর পর বাবার চাকুরীকালীন অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে গিয়ে উনার বেতনের ব্যাংক বিবরনী দেখে আমি আমার মনুষ্যত্ব নিয়ে টানাটানিতে পড়ে গেছি। যে ভদ্রলোক ঈদ বোনাস হিসেবে দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা (সর্বশেষ) পেত আমি তার কাছ থেকে স্বভাব গোঁড়ামি দিয়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছি। অথচ আমাদের পরিবারের সদস্য পাঁচজন। আমার এরপরেও মানুষ হওয়ার কোন অধিকার থাকে কিনা না জানি না।

বেসরকালী স্কুল শিক্ষকদের সর্বশেষ বেতন সাকুল্যে ১১০০০ টাকার মতো (কিছু কম)। ঘর ভাড়া কথা জানতে চেয়ে লজ্জা দিবেন না। চিকিৎসা ভাতায় মহামান্য ডাক্তারবর্গের একবারের ভিজিট দিতে গিয়েও এই সমাজ লজ্জায় কাচুমাচুতে পড়ে যাবেন। অতটা লজ্জা না দিয়ে আমরা বরং অন্য একটি সংবাদ জানি। কিছুদিন আগে কোন এক সংবাদে দেখেছিলাম এদেশে বর্তমানে প্রায় চল্লিশটি বিদেশী কুকুর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। যাদের পেছনে গড়ে মাসিক ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা। এখন আপনি যদি চারপেয়ে কুকুর আর পাঁচ সদস্যের শিক্ষক পরিবারের পারিবারিক মাসিক আয় ব্যয়ের সহজ পাটিগনিত টানতে যান সে আপনার বিষয়। আমি অন্যদিক থেকে ঘুরে আসি।

আমাদের মহামান্য শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্হাকে একেবারে হাওয়ার গতিতে এগিয়ে নিচ্ছেন। আর কিছুদিন থাকলে তিনি শতভাগ বিজয়ের কেতন উড়াবেন। পরবর্তী যেকোন শিক্ষামন্ত্রীর জন্য এমন দূর্ভেদ্য এক সীমারেখা টেনে যাচ্ছেন যে ভবিষৎতে উনাকে ডিঙ্গাতে হলে ১০১% পাস দেখাতে হবে। সোয়া এক লক্ষ মেধাবীর কলকাকলিতে উনি যখন মুচে তা দিচ্ছেন তখন একদিকে ডাবল এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় গন্ডায় গন্ডায় ফেল মারিতেছেন অন্যদিকে চারিদিকে আকাশপাতাল বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়) গজিয়ে উঠিতেছে। ওদিকে যেসব শিক্ষকের বোকামীর স্পর্ধা একটু বেশী তারা দু'চার জনকে ফেল করিয়ে নিজের বেতন ভাতার উপর কারফিউ ডেকেছেন। হলমার্ক দুর্নীতি আমাদের গতরে হুল ফুঁটালেও জাতির এমন অন্তঃসারশূন্য পাসফেল রেকর্ড আমাদের জাগ্রত করে না। বরং আনন্দের অতি আতিশায্যে আমরা লম্ফঝম্ফ মারি। কিন্তু জাতির কোন ক্ষতটা সারবার নয় এই সহজ উপলব্ধিটা আমাদের অনুপস্হিত।

বেশ কিছুদিন আগে কিছু শিক্ষক চাকুরী স্হায়ীকরনের দাবীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে একখানা স্মারকলিপি দিবেন। শাহবাগ পর্যন্ত যেতেই এদেশের সর্বক্ষমতাময় পুলিশ সম্প্রদায় এইসকল শিক্ষকদের পিপার স্প্রে দিয়ে বরন করে নেয়। সাথে লাঠি গুঁতার কথা নাই বললাম।

একদিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জিডিপি, মাথাপিছু আয় ফুলে ফেঁপে উঠছে অন্যদিকে পন্ডিত মশাইরা পাটিগনিতকে কঠিন করে তুলছে। এমন বেমক্কা পন্ডিত মশাইদের উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে জাতির অবনমন কিছুতেই আটকানো যাবে না। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করে শেষ করছি।

গল্প

সই,কেমনে ধরিব হিয়া

রাজিব সরকার

সমুদ্র রুপার পাশে বসে আছে।রুপার এলোমেলো চুল।হালকা বাতাসে উড়ছে।রুপা মৃদু হেসে বলল-এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে,তুমি যদি বল তোমাকে আজ বিয়ে করতে হবে,তাই করব।
-সত্যিতো?
-একদম সত্যি।
-তাহলে বল।
-সই,কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমরি আঙিনা দিয়া।বলতে হবে কার রচনা?
সমুদ্র একগাল হেসে বলল-ও এটা কোন ব্যাপার হল?এটা টুয়ের বাচ্চাও পাড়বে।
-তাহলে বলে ফেল।
-আরে এটা বলার কি আছে?এটা কে না পারে?
-বলে ফেল।
সমুদ্র খুব আস্থা সহকারে বলল-কবিগুরু।
-এই জন্যইতো বলি তোমার নলেজ টুয়ের বাচ্চার নিচে।
-হয়নি,তাহলে নজরুল শিউর।
-বাহ,তোমার মুখে তো উত্তর রেডিই থাকে।
-এটাও হল না?
-না।
-ভাবলাম বিয়েটা বুঝি আজই হয়ে গেল।
-তাহলে আর কি দিবাস্বপ্ন দেখতে থাক?উত্তর তো আর দিতে পারলে না।।
-এটা কেমন কথা,একটা উত্তরের জন্য বিয়ে আটকে যাবে।এটা ঠিক হচ্ছে না।
-এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঠিকঠাক মত হয় না।

মিনিট বিশেক পর ।সমুদ্র রুপার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে খুব বড় বড় করে হাতের দিকে তাকাল।রুপা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল-এটা হচ্ছেটা কি?হাত ছাড়?
এই বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।
-জান,তুমি কত বড় ভাগ্যবান মেয়ে?তাড়াতাড়ি হাত দাও,দেরি সইছে না।তোমার ভাগ্যে যা আছে গড় গড় করে বলে দিব।
এই বলে সমুদ্র রুপার হাত তার হাতের উপর রাখল।আবার বড় বড় করে তাকাল।মিনিট পাচেক হয়ে গেল,অথচ সমুদ্র সেই একই কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।রুপা কিছুটা রেগে বলল-এই বান্দরামি ছাড়বে?
সমুদ্র হু হু করে হেসে উঠল।
-বুঝেছি তোমার পাগলাগারদে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।
-আরে দেখ না তোমার হাতে কি মজার কথা লেখা আছে?তোমার মাথায় সমস্যা আছে।সেজন্যই তো সবসময় আমার সাথে এমন কর।
-কি, এমন কথা লেখা আছে?
-বিশ্বাস না হলে নিজে দেখ।
-দেখ এসব আজেবাজে কথা বলবে না।
-আচ্ছা বলব না।তবে একটা ভাল কথা বলি।
-বল।
-তোমার একটি ছেলে হবে।ছেলেটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে।
-সত্যি সত্যি তোমার মাথা গেছে।তোমার সাথে থাকতে থাকতে সত্যি সত্যি কোনদিন পাগল হয়ে যাব।
সমুদ্র হেসে বলল-ভালই হবে।পাগল আর পাগলী মিলে সংসার সাজাব।
রুপা তার হাত দুটি দিয়ে সমুদ্রের গাল ধরে বলল-উহ,কেন যে আমার মরণ হয় না?
-হবে কেমন করে,তাহলে আমাকে কে দেখবে?
-তুমি জাহান্নামে যাও।আমি গেলাম।
এই বলে রুপা উঠল।
-রুপা একটু বস,একটা ভাল খবর আছে।
-বলে ফেল।
-চল বিয়ে করি।
-এটা কোন কথা হল?তোমার ভাল খবরটি কি বল?
-এটায় ভাল খবর।
-তোমাকে একটা ভাল বুদ্ধি দেয়,তাড়াতাড়ি কোন সাইকিক দেখাও।অসহ্য।
এই বলে রুপা হাটতে শুরু করে।
-সই,কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমরি আঙিনা দিয়া।
রুপা ফিরে তাকায়।
-দ্বিজ চণ্ডীদাস।
এই বলে উঠে গিয়ে রুপার সামনে দাঁড়ায়।চোখে চোখ রেখে বলল-এবার?
-কি?
-তাহলে আজ আমার বিয়ে।
রুপা সমুদ্রের হাত ধরে বলল-চল।
-কোথায়?
-বিয়ে করতে।
-খেপেছ নাকি?আমিতো মজা করছিলাম।
রুপা ধরে সমুদ্রকে একেবারে কাজী অফিসের সামনে নিয়ে এল।কিন্তু বেটা কাজীকে দেখা যাচ্ছে না।কাজী কখন আসে কে জানে?সমুদ্রের খুব খুব অস্থির লাগছে।

গল্প

আমার কোনো দোষ নাই

সুমাইয়া বরকতউল্লাহ ✉ *ছাত্রী। লেখালেখি করা আমার ভীষণ পছন্দ। আমি ছড়া, গল্প লিখি। পত্রিকায় নিয়মিত লিখি। ব্লগ আমার কাছে একটা বিশাল লাইব্রেরির মতো। অনেক কিছুই শেখা যায় এখান থেকে। ব্লগ পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আমি পড়ালেখার ফাঁকে ব্লগ পড়ি আর মাঝেমধ্যে লিখি। আমি আশা করি যারা ব্লগে লিখেন তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো। আমার প্রকাশিত বইঃ ১টি। নামঃ "ছোট আপুর বিয়ে।" সাহিত্যকাল প্রকাশনী থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত। শিশু অধিকার রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ (প্রিন্ট মিডিয়া) ৪ বার জাতিসংঘ-ইউনিসেফ-এর মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ডসহ আরো কিছু পুরস্কার পেয়েছি। প্রাপ্ত পুরস্কার ১. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' ২০১৩ (১ম পুরস্কার) ২. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০০৮ (২য় পুরস্কার) ৩. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০০৯ (২য় পুরস্কার) ৪. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০১০ (২য় পুরস্কার) ৫. 'ডানো ভাইটা-কিডস' মাসিক সাতরং'-ব্র্যাকগল্পলেখা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার (২০০৯) ৬. ঐতিহ্য গোল্লাছুট প্রথম আলো গল্প লেখা প্রতিযোগিতা ২০০৭-এ অন্যতম সেরা গল্পকার পুরস্কার। ৭. প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে আয়োজিত লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৭) অন্যতম সেরা লেখক পুরস্কার ৮. প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে আয়োজিত লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৮) অন্যতম সেরা লেখক পুরস্কার ৯. 'চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি-বগুড়া' এর গল্পলেখা প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার (২০০৯) ১০. প্রথম আলোর 'বদলের বয়ান'-এ লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৯) ২য় পুরস্কার ১১. আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব ২০১০-এ গল্পলেখা পর্বে 'অন্যতম সেরা গল্পকার' পুরস্কার। ১২. কথাসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার ২০১১ ঢাকা। ২য় পুরস্কার। ১৩. ঐতিহ্য গোল্লাছুট গল্পলেখা প্রতিযোগিতা-২০১২ অন্যতম সেরা গল্পকার পুরস্কার*

'আমি তোমাকে কী করেছি যে, তুমি আমাকে খামছি দিলে। আবার মুখ টিপে হাসছো, শরম করে না তোমার? তুমি আমার সঙ্গে কখখনো এমন করবে না বলে দিলাম। আমি খুব কষ্ট পাই।'

'-ইশ্, এমন করবো না আবার! এখন কষ্ট পাও কেনো? তুমি যে সেদিন আমাকে একটা বকা দিয়েছিলে মনে নেই? বকা দেওয়ার সময় তোমার শরম কোথায় ছিল, গাছের পাতায়? আমি একটু দুষ্টুমি করলাম, এতেই বলছো, 'কষ্টপাই'। তুমি যে আমাকে দেখলে মুখটা চোখা করে বকা দেও, ভেঙচাও, তখন? তোমার বকা বুঝি খুব মিষ্টি লাগে মধুর মতোন! সেদিনের বকা দেওয়ার কথা মনে নেই তোমার?'

-ঢের মনে আছে। আমি এমনি এমনি তোমাকে বকা দিইনি, তুমি আমাকে শুধু শুধু চিমটি কেটেছিলে তাই ছোট্ট একটা বকা দিয়েছিলাম। তোমাদের বাড়ি এসেছি বলে বেশি ফেরাই দেখাও, নাহ্? তুমি যখন আমাদের বাড়ি যাবে তখন আমিও তোমাকে এমনে এমনে দেব, মনে রেখো।'

-ইশ্সে রে, কী করবা তুমি? থুতু দিবা? ভয় দেখাবা? পানি ছিটিয়ে দিবা? খামছি দিবা? পারলে দিও। আমি এতো বোকা না, আমার অনেক বুদ্ধি আছে। আমি কখনও একা একা তোমাদের বাড়ি যাবো না, দাদির সাথে যাবো। আমাকে কিছু করলে, আমি সাথে সাথে বলে দেবো দাদিকে। তখন দাদি তোমাকে যে কী করবে জানো তুমি?'

'-এহ্, কী করবে আমাকে? খেয়ে ফেলবে? তোমার দাদি আমাকে তোমার চেয়ে বেশি আদর করেন। তিনি আমাকে কিচ্ছু করবেন না। দাদিই তো বলেছেন, 'আমি যে খুব লক্ষ্মী একটা মেয়ে। আর তুমি যে একটা দস্যি', এটা তো সবাই জানে, তুমি জানো না?'

'-হ জানি, জানি। তবে যে আমাকে ভয় দেখায়-খামছি মারে, দাদি তাকে কখনো আদর করেন না, কান মলে দেন। দাদির কানমলা! হেহ্, এক ডলাতেই চোখ থেকে রস বেরিয়ে আসবে। ডলা খেয়ে যখন গাধার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদবে, তখন আমি কোমর দুলিয়ে নাচবো আর টেটেঙ-টেটেঙ-টেঙ-টেঙ করে গান গাইব, বুঝছ এবার?'

'-তুমি কিন্তু আমার সাথে বেশি দুষ্টুমি করছ। আমি এখনই দাদির কাছে গিয়ে বিচার দেব। আমার সঙ্গে বেশি শয়তানি করলে দাদি তোমার কান ছিঁড়ে ফেলবে, হু।'

'-আচ্ছা, তাহলে এখন আমি তোমার মুখে এক লোটকা থুতু মারবো আর একটা খামচি দেবো, দেখি দাদি আমাকে কী করে, হেহ্?'

দুষ্টু ছেলের মুখে এমন কথা শুনে মেয়েটি রাগে কান্না জুড়ে দিল। মেয়েটির কান্না শুনে বড়রা ছুটে এসে 'কী হয়েছে, কে মেরেছে' বলতেই ছেলেটি ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার কোনো দোষ নাই।'

বিবিধ

পদ্ম পূর্ণিমা

মরুভূমির জলদস্যু

চাঁদের ৯১টি প্রতিশব্দ আমি লিখেছিলাম। শুনলে অবাক হবেন যে পূর্ণিমাকেও বাংলায় অনেকগুলি নামে ডাকা হয়, যেমন –
পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণেন্দু, পূর্ণমাসী, ইন্দুমতী, ফুল্লেন্দু, পৌর্ণমাসী ইত্যাদি।
পূর্ণিমার যেমন অনেকগুলি নাম আছে, তেমনি প্রতিটি পূর্ণিমার আবার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন প্রতিটি পূর্ণিমাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে।

ইংরেজি জুন মাসের পূর্ণিমার আমাদের আঞ্চলিক নাম "জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা"। যতদূর জানি হিন্দু ও বৌদ্ধরা এই পূর্ণিমা পালন করে। হিন্দু মতে জগন্নাথদেব জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন। সেই উপলক্ষে একটা স্নানের ঘটনা ঘটেছিলো বলে তারপর থেকে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার দিনে পুণ্যস্নান পালন করা হয়। আবার এটাও প্রচলিত আছে যে, জগন্নাথদেব আদিম অবস্থায় বৌদ্ধ দেবতা ছিলেন, তাই বৌদ্ধরাও এই পূর্ণিমা পালন করে। এবছর ২০১৪ইং সালের জুন মাসের পূর্ণিমা হবে ১৩ তারিখে, সেদিন বাংলা সালের তারিখটা হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩০ তারিখ।

হিন্দু সূর্য পঞ্জিকা মতে এই দিনটি হিন্দুদের কাছে পবিত্র, শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব স্নানযাত্রা ছাড়াও এই দিনে ওরা পূর্ণিমা উপবাস পালন করে। অন্যদিকে এই বছর আরবি শাবান মাসের ১৫ তারিখ পরেছে ঐ একই দিনে, অর্থাৎ এশিয়ান মুসলিমদের পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শবেবরাতের রাত ১৩ই জুন পূর্ণিমার রাতেই। এই দিন রাত জেগে এবাদত করার করা হয়।

আর সেই সাথে নানান ধরনের রুটি হালুয়া বিলানোর একটা রেওয়াজও রয়েছে।

জুন মাসের পূর্ণিমার ইংরেজি নাম "Flower Moon" বা "পুষ্প পূর্ণিমা", যদিও ন্যাটিভ অ্যামেরিকানরা মে মাসের পূর্ণিমাকে বলে "Flower Moon", আর জুন মাসের পূর্ণিমাকে বলে "Strawberry Moon", কারণ এই সময়ই ওদের স্ট্রব্যারী ফল পাকে।

জৈষ্ঠী পূর্ণিমার মধ্যযুগীয় ইংরেজি নাম ছিল "Dyan Moon" বা "Dyad Moon"। Dyan বা Dyad শব্দের অর্থ হচ্ছে "pair" বা জোড়া। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়ে পৃথিবীর উপর সূর্য ও চাঁদের প্রভাব প্রায় সমান থাকে। আবার এটা দিয়ে জীবন কালের শিঙ্গ, শিখর বা চূড়া ও বুঝায় । ২১শে জুনে দিন তার সর্বচ্চো চূড়ায় থাকে, ফলে বলা যায় রাত ছোট হওয়ার শিখরে থাকে, এর জন্যই হয়তো এই নাম দেয়া হয়ে ছিল।

অন্য দিকে চাইনিজরা জুনের মুনকে বলে "Lotus Moon" বা "পদ্ম পূর্ণিমা"। এই সময় চীনে খুব পদ্ম ফুল ফোটে কিনা আমার জানা নাই।

জুনের পূর্ণ চন্দের আর গোটা কয়েক নাম রয়েছে, যেমন- Rose Moon, Green Corn Moon, Windy Moon, Moon When June Berries Are Ripe, Moon of Horses, Planting Moon, , Hot Moon ইত্যাদি।